শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত ও উপদেশ।)

ব্যাখ্যাকার,

শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

ফাল্গুন, ১৩৩২ সন

উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

All rights reserved.

মূল্য ২॥০ টাকা

প্রকাশক—

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রন

উদ্বোধন কার্যাল

১নং মু[illegible] র্জ্জি লেন, ব[illegible] জার,

কলিকাতা

লাইব্রেরী

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬৪।২৫

পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "অখণ্ড ঃ .ন্দ যেন চিনির পাহাড় সদৃশ, ক্ষুদ্র পিপীলিকাশ্রেণীর ক্ষুদ্রজীবকুল উহার সমগ্র উদরসাৎ করিতে প্রচণ্ড ক্ষুধায় হইলেও সামান্য কণামাত্র পাইয়াই পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতেছে শুকদেবাদি বিশেষ জ্ঞানী ভক্তেরা ঐ শ্রেণীর মধ্যগত কিঞ্চি -পিপীলিকাদিগের ন্যায় ঐ পর্ব্বত হইতে অপেক্ষাকৃত বড় এক শর্করা মাত্র লইয়াই তৃপ্ত ও শান্ত হইতেছেন!" অনন্ত মহিমা ৃথিবীর দেবমানব-দিগের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। ধারণ মানব তাঁহা-দিগের সহিত পরিচিত হইতে যাইয়া তাঁহা দের অলোকসামান্য চরিত্রের দুই একটী গুণমাত্রেই নিবদ্ধদৃষ্টি ও ুগ্ধ হইয়া আত্মদান করিয়া বসে। বিশেষ অধিকারিগণ উহার মধ্যে আরও কয়েকটী গুণের অধিক সমাবেশ দেখিয়া সমাবস্থা প্রাপ্ত হন, ইহাই মাত্র প্রভেদ। ঐ জন্য সাধারণ মানব শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি প্রত্যেক দেবমানব চরিত্রের আলোচনা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া করিয়াও তাহার ইতি করিতে পারিতেছে না।

আমাদিগের সম্মুখে যে দেবমানব চিরবিবদমান দ্বৈত বিশিষ্টা-দ্বৈত ও অদ্বৈত মতের অপূর্ব্ব সরল সমাধান সম্পাদন করিয়াছেন —সর্ব্বমতই ঈশ্বর লাভের এক একটী পথমাত্র, এই জীবনে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বক আজীবন উহার প্রচার করিয়া ভারতে ও জগতে চির শান্তির সূচনা করিয়া গিয়াছেন—এবং যাঁহার তিরোভাবের মাত্র

চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মভাবসমূহ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের প্রায় সর্ব্বত্র স্বল্পবিস্তর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পা মানব তাঁহার পুণ্যচরিত্রের ও ভাবসমূহের পরিমাণ করিতে যা কখন ইতি করিতে পারিবে না।

ইতিমধ্যেই কত লোক না তাঁহার কথা কতভাবে আলো করিতেছে! যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে করিতেছে, আবার তাঁহাকে দেখে নাই সেও করিতেছে। যে তাঁহার গুণমুগ্ধ করিতেছে, আবার যে তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ-সম্পন্ন করিতেছে। তবে প্রভেদ এই, যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে তাঁহার অলে সামান্য অচিন্তাহেতুক চরিত্রের প্রতি বিন্দুতে সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বা দেখিয়া আত্মহারা হইতেছে—এবং শ্রদ্ধাহীন দুর্ভাগ্য অপ নিজ চক্ষুর দোষে ঐ সিন্ধুকে বিন্দুরূপে দেখিয়া আত্মশ্লা করিতেছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন দলে অন্যতম। যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটি ছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইনি উহার কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক কয়েক বৎসর বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন। হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পাতিয়া আরাধ্য দেবতাকে তাহাতে বসাইয়া মানব প্রথম তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত ও ধর্ম্মজীবন পুষ্ট করিতে

:কে। পরে ঐ ভাব যখন তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া মাত্রা
স্থন করে তখনই সে তাহার হৃদয়দেবতার কথা অপরকে না
য়া থাকিতে পারে না এবং বাহিরে অপরের হৃদয়ে তাঁহার
ান পাতিবার সহায়তা করিতে উদ্যত হয়। অতএব পাঠক-
শা যে গ্রন্থকর্ত্তার শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রালোচনায় অনেক বিষয়
ও শিক্ষিতব্য পাইবেন ইহা বলা বা-ল্য। ইতি

শ্রীসারদানন্দ।

নিবেদন।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" শ্রীম লিখিয়াছেন,—"তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেখিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য ভক্তের নিকট শুনিয়া লিখেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনীতে (Diary) লিপিবদ্ধ ছিল। যেই দিনে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত স্মরণ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। তাঁহার ধারাবাহিক 'চরিতামৃত' যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে।"

শ্রীমর সঙ্কল্প ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ কথিত 'চরিতামৃত' তিনি প্রকাশ করেন। আশা করিয়াছিলাম একদিন শ্রীম লিখিত চরিতামৃত প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সে আশা বোধ হয় জীবিত থাকিতে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিনা। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে "একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। প্রধান লক্ষ্য থাকবে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আর জীবনীটী তারই উদাহরণ স্বরূপ হবে।" স্বামিজীর সেই মহতী আশা, আমার অল্পমতি, কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার জন্য, অনেকাংশে 'কথামৃত' অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের "শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত" প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেই লোকাতীত জীবন লেখক যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও সেই সঙ্গে লিখিত আছে। ক চিহ্নিত উক্তিগুলি সমস্তই 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, উপন্যাস বা নাটকের মত পাঠ করিবার নয়। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সত্য, —জীবনপূর্ণ, শক্তিপূর্ণ! তাঁহার উক্তি তাঁহার 'মার' সাক্ষাৎ আদেশ বাণী! উক্তিগুলি যতই চিন্তা করা যায়, ইহার ভিতর হইতে নূতন ভাব ও নূতন সত্য বাহির হইতে থাকে। তাঁহার অনুপম উপমাগুলির মধ্যে মানব চরিত্রের যেরূপ প্রকৃতচিত্র অঙ্কিত আছে তাহার একটীও অত্যুক্তি বা মিথ্যা কল্পনা নয়। তাঁহার প্রত্যেক উক্তি জীবনে পরীক্ষা করিয়া ধারণা করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুনঃ পুনঃ আদেশ। তাঁহার এক একটী উক্তি অবলম্বন করিয়া এক একখানি দর্শন গ্রন্থ রচিত হইতে পারে! লেখক যে তাঁহার উক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিয়াছেন এরূপ অভিমান তাঁহার নাই। তাঁহার একটী কথার ধারণা করিতে একটা জীবনেও কুলায় না! মানববুদ্ধির বহির্ভূত এই চরিত্র বুঝিবার তাঁহার সামর্থ কোথায়? তিনি কৃপা করিয়া যেটুকু বুঝাইয়াছেন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক ধারণায় অক্ষম, ভাষায় দরিদ্র। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য সেই অমল চরিত্রে যাহা কিছু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহা লেখক অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে; যদি কিছু সত্য কথিত হইয়া থাকে তাহা তাঁহার কৃপায়! প্রভুর নাম ধন্য হউক!

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥"

সূচী

উদ্বোধন	...	১
জন্মকথা	..	১৭
বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস	.	৩২
হৃদয়ের বিকাশ	...	৪৪
বুদ্ধির উন্মেষ	...	৬০
কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ	...	৭৫
পুরাণমতে সাধন	...	৯৬
বিবাহ	...	১৪৩
তন্ত্রমতের সাধন	..	১৫৬
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস	...	২১৬
বেদমতে সাধন	...	২৫১
স্বদেশগমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহির্ভূত সাধনা		২৯০
ভক্তসমাগম ও লোকশিক্ষা	...	৩২৭
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ প্রকাশ	...	৩৯৩
ভাব প্রচার	...	৪৬০

চিত্র।

১।	শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর	পুস্তকের অগ্রভাগে
২।	কেশবগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব সমাধি	৫ম পৃষ্ঠা
৩।	খুদিরামের কুটীর ...	২৬ „
৪।	পরমহংসদেবের জন্মস্থান	২৮ „
৫।	গ্রামের পার্শ্বস্থ ভূতির খাল	৪০ „
৬।	কামারপুকুরের প্রান্তর আম্র কানন	৪৪ „
৭।	কামারপুকুরের শ্মশান ...	৬৪ „
৮।	রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী	৮৪ „
৯।	শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজী ...	৯৩ „
১০।	পঞ্চবটী ...	১১৪ „
১১।	শ্রীশ্রীরামলালা	১২৮
১২।	৺শ্রীশ্রীকালী...	

শ্রী...কৃষ্ণের হস্তাক্ষর ও তাঁহার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত ও উপদেশ।)

উদ্বোধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন,—"কেশব সেনকে আমি বল্লাম,—কেন ছাপালে? তা বল্লে, তোমার কাছে লোক আসবে বলে।" ক)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে, হিন্দুসমাজের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া জাতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, ভোগসুখানুরাগী ও বিলাসপরায়ণ। প্রত্যক্ষবাদী কোমৎ, অজ্ঞেয়বাদী হিউম্ ও জড়বিজ্ঞানবাদী ডারবীন্ এবং তদ্ভাবলম্বীগণ তাঁহাদের শিক্ষাগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সমাজ, ভ্রম, মিথ্যা ও কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীগণ ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী তখন তাঁহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাহারও নিকট পরিচিত হন নাই। দক্ষিণেশ্বরের লোকেরাও তাঁহাকে 'পাগলা বামুন' বলিয়া জানিত। অনেকেরই নিকট তিনি একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর একটী নিভৃত গৃহে তিনি থাকিতেন। দুই চারিজন সাধু

সন্ন্যাসী ও সাধক তাঁহার নিকট কথন কথন যাতায়াত করিত। কেবল তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সর্ব্বদা তাঁহার সহচর ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দেখা হইবার পর তিনি একজন ভ্রান্ত প্রবঞ্চক বা কপট সাধু কিনা সবিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্য, কেশবচন্দ্র স্বীয় কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। সত্যানুরাগী, গুণবেত্তা, অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন কেশবচন্দ্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন। তৎকালে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ, সুদূর য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার যশোরশ্মি বিকীর্ণ। সুতরাং কেশবচন্দ্রের প্রকাশিত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকানেক ধর্ম্মপিপাসুর চিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জনৈক ব্রাহ্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের মনোগত ভাব ও নিজের অনুভূতি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"১৮৭৫ সালে মার্চ্চ মাসে একদিন পূর্ব্বাহ্ণে ৮।৯ টার সময় পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উদ্যানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তরু-তলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযম ও বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্য-দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন করেন। তখন আচার্য্যদেব বন্ধুবর্গ সহ উদ্যানস্থ

সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ছেকড়া গাড়ীযোগে সেখানে উপস্থিত হন।”

“প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্য্যদেবকে বলেন যে, —“আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন।” এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংস দেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসের পরিধানে একখানা লাল পাড়ওয়ালা ধুতি মাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়াছিলেন, দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, “বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।” এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংস একটী রামপ্রসাদী গান করেন. গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা ইহা এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ অন্তে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিয়া উঠেন, তৎপরে প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত

হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সেদিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল।"

"পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মার গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্য্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া আচার্য্য ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আচার্য্যদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল লোক আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কত আনন্দের স্রোত মত্ততার ব্যাপার চলিত। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্য ভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন।"

"যখন আচার্য্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে ও পরমহংসদেব আচার্য্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চধর্ম্মভাব ও চরিত্র পুস্তকে ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিবরণ সকল লেখা হইল, "পরমহংসের উক্তি" নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন।"

কেশবচন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব সমাধি।

হৃদয় সযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া আছেন।

"পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীত ভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোন রূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না।"

"পরমহংস দেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল। কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই।"

"পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটী কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। একদা একজন ঘোর বিষয়ী লোক রামকৃষ্ণের গৃহে যাইয়া বসেন। রামকৃষ্ণের অঙ্গমার্জ্জনী ভূতলে পতিত ছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া রাখেন। সেই লোকটী চলিয়া গেলে আমাদের এক বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, এই লোকটা বিষয়ী, অনেক জাল জুয়াচুরী করিয়াছে, তাহার ছোঁওয়া গামছা আমি আর ব্যবহার করিব না, উহা বাহিরে ফেলিয়া দাও। পরে বন্ধুর একান্ত অনুরোধে তাহা গঙ্গায় ধৌত করিয়া আনিতে সম্মত হন।"

"টাকা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। একদিনও তিনি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করেন নাই, কখন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ

ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।"

"পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। নারীমাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাঁহার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার ভার্য্যার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিক ভাবে কি সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহুকাল পরে পত্নীকে নিকটে আশ্রয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় থাকিতেন।"

"আট বৎসর পরে রামকৃষ্ণ সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ সমাধির ভাব তেমনই ভক্তির মত্ততা প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং, ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন, কখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এ সমুদায় লক্ষণই

লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন, কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস ভক্তির মত্ততা অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তযোগে অতি সুন্দর সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্র তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্যশূন্য, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দনহীন মৃৎ প্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভ্যতা জানিতেন না। অনেক সময় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মচর্চ্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।"

"পরমহংসদেব একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে একজন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন,—"আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে।" তাঁহার যেমন শাক্তভাব, তেমনি বৈষ্ণবভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তাঁহাতে যোগভক্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগ সমাধিতে একেবারে স্পন্দনহীন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সমুদায় তাঁহাতে লক্ষিত হইয়াছে।"

"ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায়-জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক ও আলোকস্তম্ভ স্বরূপ। আমরা চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতা ও দিতেন না, পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। কাহারও নিকটে

শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বর কৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।"*

মহামনীষা সম্পন্ন ব্রাহ্মসমাজের অপরনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরাজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। সেই প্রবন্ধের কোন কোন অংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যখনই যেখানে এই অদ্ভুত পুরুষের সমাগম হয়, তিনি চারিদিকে এমন এক জ্যোতির্ম্ময় ভাব-সমীরণ সঞ্চারিত করেন যে, তাহাতে আমার চিত্ত অনুক্ষণ ভাসিতে থাকে। তাঁহাকে যখনই দেখি কি এক অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় করুণভাব তিনি আমার হৃদয়ে সেচন করেন, যাহার প্রভাব এখনও আমার মন হইতে দূর হয় নাই। তাঁহার সহিত আমার কি সহানুভূতি থাকিতে পারে? আমি একজন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, সভ্যতাভিমানী, স্বার্থান্বেষী, অর্দ্ধসংশয়বাদী, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি দরিদ্র মূর্খ অসভ্য অর্দ্ধ-পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দুসাধু। যে আমি ডিস্রেলী, ফসেট, ষ্টানলী, ম্যাকস্ ম্যুলার প্রভৃতি বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-যাজকগণের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন? আমি খ্রীষ্টের একজন অনুরাগী শিষ্য ও মতানুগামী, উদারচেতা খ্রীষ্ট প্রচারকগণের বন্ধু ও প্রশংসাকারী, যুক্তিমার্গ অবলম্বী ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও আনুষ্ঠানিক সভ্য, কেন আমি বাক্‌শূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকি? শুধু আমি বলিয়া

* শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি।

নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে। কোন কোন চতুর পণ্ডিতম্মন্য তাঁহার ভিতর কিছুই সার দেখিতে পান নাই। কোন কোন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে কপট, ভ্রান্ত ও উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। আমি ইঁহাদের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল বিশেষ অবধারণ করিয়াছি এবং এখন যাহা লিখিতেছি তাহা আমার আন্তরিক বিচার প্রসূত।"

"এই হিন্দু সাধুর বয়স ৪০ বৎসরের ন্যূন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, স্বভাবতঃই তাঁহার দেহ সুগঠিত, কিন্তু কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্র বিকাশ হওয়াতে শরীর ভগ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই জীর্ণ শীর্ণতার মধ্যেও তাঁহার মুখমণ্ডলের পরিপুষ্টতা বালকবৎ কোমলতা, গভীর প্রত্যক্ষ বিনীতভাব, এক অনির্ব্বচনীয় সুমিষ্ট মুখরাগ ও এরূপ হাসি যাহা আমি আর কোন মুখে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ...... পরিচ্ছদে ও আহারে অপরের সহিত কোনরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না, কেবলমাত্র তাঁহার স্বাভাবিক অবহেলার ভাবই প্রকাশ করে। জাতীয় ধর্ম্ম তিনি প্রত্যহই লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। ....বিষয়ী ও দেহসুখাসক্ত লোকের সঙ্গ তিনি সযত্নে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার ভিতর অলৌকিকতা কিছুমাত্র নাই। ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র প্রশংসা-পত্র। ....সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমস্ত মত, ক্রিয়াকাণ্ড ও উপাসনা পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী। প্রত্যেক ধর্ম্মমতই তাঁহার নিকট সত্য। তিনি পৌত্তলিক বটে, কিন্তু এক নিরাকার অনন্ত

ঈশ্বর যাঁহাকে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলেন, বিশ্বাস ও ভক্তি সমন্বিত হইয়া সেই পূর্ণ স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। .... তাঁহার ধর্ম্মের অর্থ প্রগাঢ় ভাবোন্মত্ততা, তাঁহার উপাসনার অর্থ প্রত্যক্ষ দর্শন। এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভাবের অগ্নিতে দিবারাত্র তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি জ্বলিতেছে। তাঁহার কথার ভিতর এই অন্তরাগ্নির অবিরাম উচ্ছ্বাস দীর্ঘকাল ধরিয়া বাহির হইতে থাকে। তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ শ্রান্তিবোধ করিলেও বাহ্যিক শীর্ণদেহ লইয়া তিনি কিন্তু সর্ব্বক্ষণই ক্লান্তিহীন। দিবাভাগে প্রায়ই ভাবাবেসে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকেন। কিন্তু যখনই আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতি বর্ণনা করেন বা বিশেষ উদ্দীপন হয়, অধিকাংশ সেই সময়ই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দেখা যায়। ... .এই সময় তাঁহার সরল হৃদয় নিহিত জ্বলন্ত ভগবৎ অনুরাগের আবেগে সহসা তাঁহার দেহ কাষ্ঠবৎ নিস্পন্দ, তিনি বাহ্যসংজ্ঞা শূন্য, তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন ও অশ্রুধারা তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল বাহিয়া পড়ে। এই সংজ্ঞা-শূন্যতার ভিতর এক মহান্ ঈশ্বরীয় ভাব ও অর্থ রহিয়াছে।"

"সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কি অনুভব ও সম্ভোগ করে কে বলিতে পারে? ভগবৎ প্রেম জনিত সেই সংজ্ঞাশূন্যতার গভীরতা কে পরিমাপে সমর্থ? কিন্তু তিনি যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে মৃতবৎ হইয়াও কিছু দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন, সম্ভোগ করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাহা না হইবে তবে সেই সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে কেন তাঁহার অশ্রুধারা বিগলিত হয়, কেন প্রার্থনা করেন, গান করেন, কথা কহিতে থাকেন, যাহার শক্তি ও করুণভাব কঠিন হৃদয় ও বিদ্ধ

করিতে থাকে এবং যে চক্ষু কখন ধর্ম্ম কথায় কাঁদে নাই তাহা হইতেও জলধারা বহিতে থাকে?"

"আমাদের এই সাধুপুরুষের মতে শক্তিপূজার অর্থ—স্ত্রীজাতির আকর্ষণী শক্তির ভিতর ভগবানের মাতৃভাব দর্শন করিয়া, বালকবৎ প্রীতিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমাদের বন্ধুবর স্ত্রীজাতির সহিত সর্ব্ববিধ সাংসারিক ও শারীরিকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী বর্ত্তমান, কিন্তু কখন তাঁহাকে দৈহিক সম্বন্ধে দৃষ্টি করেন নাই। তিনি বলেন স্ত্রীজাতির প্রতি সন্তানভাবে দৃষ্টি ব্যতীত মানুষ কখন স্ত্রীলোককে জয় করিতে পারে না।······ তজ্জন্য বহু বৎসর ধরিয়া স্ত্রীজাতির আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত কঠোর চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আকর্ষণ হইতে মুক্তির জন্য যখন তিনি গঙ্গাতীরস্থ নির্জ্জন গৃহে উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদারক কাতর ধ্বনি ও প্রার্থনা করিতেন তখন লোকের ভিড় হইত, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিত ও সাধনায় সিদ্ধির জন্য প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।"

"যে পাপপূর্ণ দেহসুখ তিনি এত ভয় করিতেন, নির্ব্বিঘ্নে তাহার হস্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন। মা, মা, বলিয়া যাঁহাকে তিনি ডাকেন,—তাঁহার ৺কালীমাতা—তিনি তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই তিনি অবতীর্ণা। এজন্য স্ত্রী মাত্রকেই তাঁহার মা জানিয়া তিনি মান্য করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক ও কুমারীর সম্মুখে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া মস্তক অবনত করেন। সন্তান কর্ত্তৃক মাতৃপূজার ন্যায় তিনি অনেককে পূজা করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সহিত তাঁহার পবিত্রভাব ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ও

শিক্ষণীয়। ইহা পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ভাবটী মূল হিন্দুভাব, প্রাচীনকাল হইতে সমাগত এবং ইহাই হিন্দুর মহীয়সী জাতীয় ভাব। হাঁ, হিন্দু স্ত্রীজাতিকে মান্য করিতে পারে।”

“কাঞ্চনের আসক্তিরূপ অপর পাপ হইতে মুক্ত হইতে তিনি জীবনের অনেক কাল ব্যয় করিয়াছেন। টাকা দেখিবামাত্র তিনি এক অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হন। কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগই তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব নৈতিক জীবনের গূঢ় রহস্য।”

“তিনি কখন কিছু লিখেন না, তর্ক বিচার করেন না, অপরকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথার নানা ভাব তরঙ্গ তাঁহার অন্তরাত্মা যেন অবিরাম ঢালিতে থাকে। তাঁহার গান কি চমৎকার! আর তাঁহার মুখ হইতে কি অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথা বাহির হইতে থাকে! পুরাণ শাস্ত্রের জটিল অংশে অজানিতভাবে এরূপ আশ্চর্য্য আলোক প্রক্ষেপ করেন, যাহাতে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা দার্শনিক সত্যের ন্যায় সরল হইয়া যায়। তাঁহার আড়ম্বর শূন্য অশিক্ষিত জীবন দেখিলে এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইলে এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য তত্ত্বজ্ঞানের সমষ্টি হইবে। মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি লিখিত হইলে লোকে অনুভব করিবে যে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের কাল আবার আসিয়াছে, প্রাচীন অশিক্ষালব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের যুগ পুনরাগমন করিয়াছে।”

“এই মহান্ পবিত্র পুরুষ হিন্দুধর্ম্মের গভীরতার ও মাধুর্য্যের জীবন্ত নিদর্শন। ইনি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়, এখন কেবল আত্মভাবে

পূর্ণ, ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ ও আনন্দময় পবিত্রতায় পূর্ণ। এই সিদ্ধ হিন্দুযোগী জগতের মিথ্যাত্ব ও অন্তঃসার শূন্যতার সাক্ষী স্বরূপ। তাঁহার এই সাক্ষ্য হিন্দু মাত্রের গভীরতম হৃদয় প্রদেশে, ইহার সত্যতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। এই দরিদ্র জীবনে ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন চিন্তা নাই, অন্য কোন বৃত্তি নাই, অন্য কোন আত্মীয় নাই, অন্য কোন বান্ধব নাই। সেই ঈশ্বর তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাঁহার দোষ লেশ শূন্য পবিত্রতা, তাঁহার সুগভীর অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ, তাঁহার অশিক্ষালব্ধ অশেষজ্ঞান, তাঁহার বালকবৎ শান্তিময়তা ও মনুষ্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ, তাঁহার সর্ব্বভুক্ সর্ব্বগ্রাসী ঈশ্বর প্রেম ইহাই কেবল তাঁহার পুরস্কার। তিনি যেন বহুকাল ধরিয়া সেই পুরস্কার উপভোগ করেন। আমাদের নিজ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ভিন্ন, কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন, আমরা আনন্দে তাঁহার পদতলে বসিয়া পবিত্রতার উচ্চ উপদেশ, অসাংসারিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবৎ প্রেম-মত্ততা, শিক্ষা করিব।"*

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণের শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা তাহা উল্লিখিত হইল। ইহা গোঁড়া-ভক্তের অত্যুক্তি বর্ণনা নয়, যুক্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাসীর কল্পনা নয়, কুসংস্কারমগ্ন অল্পবুদ্ধি জনের রচিত-কথা ও নয়। কিন্তু সত্য মিথ্যা অবধারণ ক্ষম বিচারনিপুণ সূক্ষ্মতত্ত্বান্বেষী কৃতবিদ্য সত্যনিষ্ঠ মনীষীগণের প্রত্যক্ষ দর্শন

* Theistic Quarterly Review, October, 1879. হইতে অনুবাদিত।

ও পরীক্ষার অনমুরঞ্জিত সিদ্ধান্ত। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এ অবস্থাটী তাঁহা হইতে আচার্য্যদেব অধিকরূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তিসত্ত্বেও বিশ্বাস ও জ্ঞান প্রধান ধর্ম্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে।" তাঁহারা আরও বলেন,—"পরমহংস-দেবের সমুদায় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্যস্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগ ভক্তি প্রধান সমুন্নত জীবন যে, নববিধানের উন্নতি সাধনে বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না।"*

কিন্তু কি সাধন বলে তিনি ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হইয়া-ছিলেন?. কি তপস্যা প্রভাবে সেই নিরক্ষর অন্তর হইতে জ্ঞান ভক্তির অবিরাম স্রোত নিঃসৃত হইত? যে কামিনীকাঞ্চনরূপ মোহময়ী মদিরা পানে জগৎ উন্মত্ত, কি যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া তিনি তাহা স্পর্শমাত্র ও করিতে পারিতেন না? কি প্রতিভা বলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের একবর্ণ ও না জানিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অলৌকিক মীমাংসা তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল? এই সকল গুরুতর প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র কূতর্ক ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত

* শ্রীমৎ রামকৃষ্ণপরমহংসের উক্তি।

হইয়া অনুধ্যান করিলে এই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন হইতে পারে ইহাই আমাদিগের ধারণা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান জ্ঞানলাভে নিরত ও জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে তাহার পরম শান্তিলাভ হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা সে বিনষ্ট হয়, তাহার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখও নাই।"*

* গীতা চতুর্থ অধ্যায়, ৩৯-৪০ শ্লোক

জন্মকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন কাহিনীর অনেকাংশ জনশ্রুতি। আর কতকগুলি জনশ্রুতি, বিশেষতঃ তাঁহার জন্মবিবরণ, এরূপ অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ যে, তাহার সত্যাসত্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকালীন ব্যাপার সকল তাঁহার জননী কতক স্বপ্নে কতক জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। জনশ্রুতির বিষয় সকল যে একেবারে ভিত্তিহীন একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এই সকল ঘটনার যথার্থতা এখন নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। এখন আমাদিগকে লোকপরম্পরাগত জনশ্রুতি বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে, এবং জনশ্রুতি বলিয়াই ইহারা যে কতক অতিরঞ্জিত, কতক কল্পনা প্রসূত, আর কতক বক্তার মনোভাব বিজড়িত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সকল জনশ্রুতির মধ্য হইতে সত্য নির্ব্বাচন একান্ত দুরূহ। সেইজন্য তাঁহার চরিত বর্ণনায় সেগুলি আমরা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিলাম। কোন কোন শ্রুত বিষয় কোনরূপ যুক্তি বিরোধী নয় বলিয়া এবং তাঁহার নিজ মুখ কথিত চরিতের সহিত কোনরূপ অসঙ্গতি না থাকতে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিজ জীবনের অনেক ঘটনা তিনি অনেকের কাছে বলিয়াছিলেন এবং তাহা শ্রীম যথাযথভাবে 'কথামৃতে' লিখিয়া

২

রাখিয়াছেন। সেই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, তাঁহাতে কিছুমাত্র কল্পনার সংস্রব নাই। অনেক সময় তিনি অনেক ঘটনা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। অনেক কথা অপরকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতেছেন বলিয়া মনে হইত, কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে সে সকল যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধেরই কথা তাহা সহজেই বুঝা যাইত। আমরা তাঁহার নিজ মুখের এই সকল উক্তি হইতে তাঁহার চরিত্ত-কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জলবায়ু সমাজের রীতি নীতি জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই সকল মানুষের চরিত্র বিকাশের বিশেষ সহায়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য পরিশ্রমশীলতা ও বলিষ্ঠতা বিশেষরূপে নির্ভর করে, এবং বাল্যকাল হইতে মাতাপিতা আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীগণের যেরূপ আচার ব্যবহার জ্ঞান ও শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতি আমরা দেখিতে পাই আমরা তাহারই অনুকরণ করিতে থাকি। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তৎকালিক গ্রামবাসীদিগের সামাজিক সংস্থান, শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম হুগলী জেলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে কামারপুকুর হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সংযোগ স্থলে তিনটী জেলার সীমারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কামারপুকুর জাহানাবাদ হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে, বর্দ্ধমান হইতে ষোল ক্রোশ দক্ষিণে এবং তারকেশ্বর হইতে বার ক্রোশ পশ্চিমে আমোদর নদের তীরে

অবস্থিত। পূর্ব্বে কামারপুকুরের সন্নিহিত প্রদেশে এক সময় বঙ্গের কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী প্রসূত দুর্গেশনন্দিনীর গড়মান্দারণ ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির কামারপুকুরের অনতিদূরে বর্ত্তমান। গড়মান্দারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"গড়মান্দারণে কয়েকটী দুর্গ ছিল, এজন্য ইহার নাম গড়মান্দারণ হইয়া থাকিবে: নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত। একস্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তদ্দারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিকে মানবহস্ত নিখাত এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশ পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াস লভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন। দুর্গের নিম্নতল মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে; অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি তিন্তিড়ী মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটী দুর্গ ছিল। বাঙ্গালার পাঠান সম্রাটদিগের শিরোভূষণ হোসেন সাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।"

দেশ সুশাসনে রাখিবার নিমিত্ত, পাঠান রাজত্বকালে নির্ম্মিত একটী প্রশস্ত রাজপথ বর্দ্ধমান হইতে গড়মান্দারণ ও কামার-

পুকুরের পার্শ্ব দিয়া পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই বহু জনপদব্যাপী দীর্ঘ পথদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান নগর সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে। বাণিজ্যের সুবিধা বশতঃ নানাস্থান হইতে বণিকদল এবং ৺ পুরীধামে জগন্নাথদেব দর্শনার্থ যাত্রীগণ, এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। অপর একটী পাকা রাস্তা ভাগীরথী তীরস্থ বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বর ও জাহানাবাদ হইয়া কামারপুকুরের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জ অভিমুখে গিয়াছে। পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নান, ৺ তারকেশ্বর দর্শনাদি করিবার জন্য ও কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আসিবার জন্য এদেশ-বাসীগণের ইহাই প্রধান পথ। এই দুইটী বিস্তৃত পথ সন্নিহিত থাকিয়া কামারপুকুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়াছিল।

১২৭৪ সালের পূর্ব্বে এতদঞ্চলের লোকেরা মালেরিয়া জ্বর কাহাকে বলে জানিত না। সে সময় বর্দ্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে লোকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিত। তখন গ্রাম সকলে সুস্থ ও শ্রমক্ষম লোকেরই বাস ছিল। কামারপুকুরে দুই তিন ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেবল কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি ব্যতীত, সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক জুগী কামার শাঁখারি নাপিত গোয়ালা সদ্‌গোপ ছুতার কৈবর্ত্ত জেলে বাগ্‌দী ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণে গ্রাম পরিপূর্ণ। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন কিরূপ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল আমরা পরে তাহা দেখিতে পাইব।

কামারপুকুরের শিরোদেশে আমোদর নদ বক্রগতিতে

প্রবাহিত হওয়াতে ধান্যক্ষেত্র সকলে কৃষিকার্য্যের জন্য কখন জলাভাব হইত না। এই প্রদেশের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা, আমোদরের সাময়িক বন্যায় ইহার উর্ব্বরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত। আমোদর তীরে গোচরভূমির ও অভাব নাই সুতরাং এই সমস্ত প্রদেশ কৃষিজীবীর আদর্শ বাসভূমি। কৃষিকার্য্যই এ স্থানীয় গ্রামবাসী-গণের প্রধান উপজীবিকা।

কামারপুকুর পূর্ব্বে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীপুর ও মুকুন্দপুর নামে দুইখানি গ্রাম ইহার সংলগ্ন থাকাতে ইহা একটী ক্ষুদ্র গঞ্জের ন্যায় হইয়াছিল। সে সময় কামার-পুকুরের হাটে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিজাত ও পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনিত হইত। গ্রামের অনেক জুগী জাতির ঘরে কাপড় গামছা সূতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে চালান যাইত। আব্‌লুস কাষ্ঠের হুকার নল, রুটি বেলিবার চাকি ও বেলন প্রভৃতি ছুতারের কাজে কামারপুকুরের একটু যশ ছিল। উৎকৃষ্ট মিঠাই জিলিপী প্রভৃতি মিষ্টান্নের জন্য কামারপুকুর প্রসিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামের জিলিপীর অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে এক সময় আহার করিতে বসিয়া মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে, কেহ কেহ আরও খাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি বলিলেন,—"আমার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ, আর একটী সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যের ও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপীর পথ হবে। জিলিপী হলে একথ[illegible]রি।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপীর পথ কেমন করে হবে?" তিনি উত্তর করিলেন, —"যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটী মানুষও কষ্টে স্বষ্টে চলিতে পারে না, এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়। এই জিলিপী খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য জিলিপীকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।"

গ্রামে তিন চারিটী দীর্ঘিকা বহু পুষ্করিণী ভগ্নদেউল রাসমঞ্চ শিবমন্দির সমাজস্থান অতিথিশালা প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় কামারপুকুরের আর্থিক সমধিক উন্নত অবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল জনহীতকর পূর্ত্তকার্য্য গ্রামবাসীদিগের আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা তাহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। কারণ তখনকার লোক সামান্য ইষ্টলাভেই সন্তুষ্ট থাকিত, আহার্য্য দ্রব্যাদি সহজ-লভ্য, জন মজুর ও অল্প পারিশ্রমিকে কার্য্যে নিযুক্ত হইত। লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে নিজের পর্ণকুটীর না ভাঙ্গিয়া অগ্রে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিত, ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বিদ্যার গৌরব রাখিত, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিত, পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধু অতিথি ও পথিকের শ্রান্তি দূর করিত। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা কিরূপ ছিল, দীনবন্ধু তাঁহার নীলদর্পণে গোলক-নাথের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন—"স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমী করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার কর্ত্তে

হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতেত হইলেও ধর্ম্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি
সেবা চলে, আর পূজার খরচ এার বিধান ও ক্রম ব্রাহ্মণ পূজিত
তেলের সংস্থান হইয়া ও০।৭বেত্যাদি সোপচারে করিতে হয়। ধর্ম্মের
আমার সোনার খমপুর; ও ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্ম্মের
ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের সময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয়।
পুকুরের মাছ। এমন সুদয়া ধর্ম্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্ম্মের
হয়? আর কেই বা পারে ধর্ম্মের মানৎ করিয়া লোকে চুল রাখে।
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম গাহিয়াছ গতি ও পূজার্থীকে ভকত বলে।
নিবসে হানিফ গোপ, না জাভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি
ক্ষেতে উপজয়ে নানা ধন। তবে ধর্ম্মের নামে সন্ন্যাস
গোম তিল মুগ মাস, বুট সর্ষপ কার্পাস, বিখ্যাত মন্দির
সবার পূরিত নিকেতন॥

বহুপূর্ব্ব হইতে কামারপুকুর ও এই প্রদেশের গ্রাম সকলে ধর্ম্মঠাকুর ও মনসাদেবীর পূজার বিশেষ আড়ম্বর ছিল। ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা হিন্দুধর্ম্ম বহির্ভূত পূজা। অথচ এ অঞ্চলের এরূপ গ্রাম বিরল যেখানে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয় না। ধর্ম্মঠাকুর বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ স্মৃতি এখনও এই প্রদেশে জাগাইয়া রাখিয়াছে। "যে ধর্ম্মের জন্য বুদ্ধদেব অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যে শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই মহাশূন্যই ধর্ম্মদেবতার নামান্তর বলিয়া গণ্য। রমাই পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে এই ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক। তিনি বৌদ্ধরাজা গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ সহজ ভাবে প্রচারোদ্দেশে শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মের পূজা পদ্ধতি প্রচার

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যেথানে বহু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর
তথন জিলিপীর পথ কেমন করে হবে?গ্‌দী, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাস
—"যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তাধবদেবীর ন্যায় কিন্তু ধর্ম্ম-
হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, ধর্ম্মঠাকুর কোথাও ঘট,
সুষ্টে চলিতে পারে না, এ অবস্থা; কোথাও কচ্ছপাকার,
গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়ার, কোথাও শিবলিঙ্গের
এই জিলিপী খাইবার পথ হবে, অন্য নৈক প্রকার প্রতিমা আছে।
সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।" কোথাও বা ভক্তের মানসিক
গ্রামে তিন চারিটী দীঘিহারা ধর্ম্মের স্থানে গিয়া পূজা দিয়া
শিবমন্দির সমাজস্থানয়র কোথাও বিষ্ণুরূপে তুলসী দিয়া পূজা করে
কামারপুকুরে দেয় না। আবার কোথাও ছাগল, ভেড়া, মুর্গী
শূকর পর্য্যন্ত বলি দেয়।"

"প্রায় সকল স্থানেই অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেই ধর্ম্মের পূজারী, কোথাও দুলে, কোথাও বাগ্‌দী, কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও সদ্‌গোপ, কোথাও আগুরি, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডোম বা পোদ। ডোম বা পোদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত আখ্যাধারী তাহারাই পূজা করে। ডোমপণ্ডিতগণ বৌদ্ধাচার্য্যদিগের প্রচলিত তাম্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরে ধর্ম্মপূজার অধিকারী হয়। তখন তাহারা আপনাকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষভাবে ও অপর সকল জাতিকে স্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করে। ধর্ম্মঠাকুর এক প্রকার ইহাদেরই নিজস্ব দেবতা। যেথানে ডোম প্রভৃতি নীচ জাতি পূজক, সেথানে শূকর মুর্গী প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কৈবর্ত্তাদি সেবিত ধর্ম্মস্থানেই বলি নিষিদ্ধ।"

"ধর্ম্মের পূজক নীচ জাতি হইলেও ধর্ম্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই আছে। পূজার বিধান ও ক্রম ব্রাহ্মণ পূজিত দেবতার ন্যায় স্নান ও নৈবেদ্যাদি সোপচারে করিতে হয়। ধর্ম্মের গাজন হয়। বৈশাখ ও ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্ম্মের উৎসবের দিন। এই সময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয়। সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া ধর্ম্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্ম্মের গান গাহিয়া থাকে। ধর্ম্মের মানৎ করিয়া লোকে চুল রাখে। ধর্ম্মের গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে গতি ও পূজার্থীকে ভকত বলে। ধর্ম্মঠাকুর নীচ জাতির মধ্যে প্রভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি জাতির গৃহস্থেরাও ইহার মানৎ করে। তবে ধর্ম্মের নামে সন্ন্যাস উচ্চশ্রেণীর লোকে করে না। যেখানে ধর্ম্মের বিখ্যাত মন্দির আছে, অনেক সংস্কৃতজ্ঞ যজমানী ব্রাহ্মণও যজমানের প্রীত্যর্থ সেখানে ধর্ম্মপূজা করিয়া থাকেন।"*

কামারপুকুরের ধর্ম্মের নাম রাজরাজেশ্বর ধর্ম্ম। ইঁহার মূর্ত্তি কচ্ছপাকার। গাজন ছাড়া ইঁহার রথযাত্রা ও পূর্ব্বে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। গ্রামে মনসাদেবীর পূজার ও বিশেষ আদর আছে। বাগ্‌দী ডোম কৈবর্ত্ত জুগী প্রভৃতি জাতির মনসাদেবী কুলদেবতা সুতরাং মনসাপূজা ইহাদের প্রধান পূজার মধ্যে গণ্য। গ্রামে এই সকল জাতীয় লোকের বাস অধিক বলিয়া মনসাদেবীর পূজা ও গ্রামে উৎসবেব সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই কারণে অনেক উচ্চবর্ণের গৃহেও মনসাদেবীয় পূজার ব্যবস্থা আছে। সকল গৃহস্থই দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মানৎ করিয়া থাকে।

---

* বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত।

আনুড় গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর মানৎ পূজা সকল গ্রামবাসীই বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রদান করে। গ্রামের কোন কোন গৃহস্থের, বিশেষতঃ সুবর্ণবণিকদের হরিবাসর ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ দেখা যায়। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের ও কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু দেবদেব মহাদেবেরই পূজা গ্রামের সকল পূজার প্রধান। শিবচতুর্দ্দশী ও বুড়শিবের গাজনে গ্রাম শুদ্ধ লোক মত্ত হইয়া উঠে। গ্রামে অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং সকল মন্দিরেই নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে।

এইরূপ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যময়ী স্বাস্থ্য-সঞ্চারকারী ধান্যধনে সুশোভিনী জনপদে, নিরক্ষর নিম্নজাতি ও কৃষকপূর্ণ গ্রামে এবং নিষ্ঠাভক্তি সমন্বিত বৈদিক ও অবৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রথম আদর্শ তাঁহার পিতা ও মাতা। তাঁহার পিতার নাম খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। খুদিরামের পৈতৃক বাসভূমি আমোদর নদের অপর পারস্থ দেরে গ্রাম। এইরূপ প্রবাদ যে, গ্রামের জমিদার কোন বিষয় ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়া খুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হওয়াতে জমিদারের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হন। কামারপুকুরের তৎকালিক ব্রাহ্মণ জমিদার খুদিরামের বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার নিঃস্ব অবস্থা জানিতে পারিয়া নিজ গ্রামে দেড় বিঘা ধান জমি ও থাকিবার দুইখানি পর্ণকুটীর প্রদান করেন। খুদিরাম পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিলেন। বন্ধু প্রদত্ত 'লক্ষ্মীজলা' নামক সেই দেড়

বিঘা ভূমিখণ্ড এখন তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়। খুদিরাম প্রকৃতপক্ষে অযাচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে সপরিবারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়াও স্ত্রীপুত্র পালনের জন্য তিনি প্রাণান্তে কখন শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। শুনা যায়, পত্নী চন্দ্রমণি-দেবী কোন [illegible]য় অনবধানতা প্রযুক্ত শূদ্রদত্ত দান গ্রহণ করাতে তিনি এমন ক্রোধাবিষ্ট হন যে, পায়ের খড়ম হস্তে লইয়া পত্নীকে মারিতে গিয়াছিলেন। পিতার এরূপ কঠোর আচারনিষ্ঠা ও বিষয়বিরাগ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল।

খুদিরামের অটল বিশ্বাস ভক্তি ও অকপট তেজঃপূর্ণ পবিত্রতা দেখিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পদধূলি রোগীকে রোগ-মুক্ত করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

> "আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্‌তেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠ্‌ত। বল্‌তো—ঐ তিনি আস্‌ছেন। যখন হালদার পুকুরে স্নান কর্‌তেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন?' তিনি রঘুবীর! রঘুবীর! বল্‌তেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।" (ক

তাঁহার পিতৃব্য রামকানাই চট্টোপাধ্যায় ও অতিশয় সরল-চিত্ত ও প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পিতৃব্যের বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"হলধারীর বাপ * ভারি ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ত,—রক্তবর্ণম্ চতুর্ম্মুখম্—এই সব বলে ধ্যান যখন কর্‌ত, তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়্‌ত।"

"আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস! মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল, রাস্তায় বেলফুল আর বেল পাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এল। রামযাত্রা হচ্ছিল, কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্‌লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্‌তে গিছিল—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। যে কৈকেয়ী সেজেছে তার কাছে এসে—'পামরী' এই কথা বলে দেউটী (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল! (ক)

তাঁহার মাতা চন্দ্রমণিদেবীকে গ্রামের সকলে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিয়া জানিত। লোকে তাঁহার দয়ার পরিচয়ে বলিয়া থাকে যে, অনেক দিন কাঙ্গাল অতিথি গৃহে আসিলে পরিজন দিগের আহারান্তে অবশিষ্ট নিজের অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে খাইতে দিয়া আপনি উপবাস করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সরলতা ও লোভ শূন্যতার দৃষ্টান্ত এইরূপ শুনা যায়,—চন্দ্রমণি দেবী বৃদ্ধাবস্থায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরা-

* হলধারী তাঁহার পিতৃব্য পুত্রের নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম রামতারক, রামকৃষ্ণ হলধারী বলিতেন।

বেনাই সোদরের ভূমা

নাথ বিশ্বাস তাঁহার আহারাদির জন্য সমস্ত খরচ প্রদান করিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সময় মথুরবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাঁহার কোন অভিলাষ থাকে তিনি তাহা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নিজের কোন সাধই বুঝিতে পারিলেন না। মথুরবাবু পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করাতে, কোন মতে ছাড়িবেন না দেখিয়া বলিলেন,—"তবে একপাতা দোক্তা দিও"। মথুরবাবু শুনিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—'এমন মা না হলে এমন ছেলে হয়!'

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে চিরদিন অন্নকষ্ট পীড়িত সংসারে এইরূপ দেবোপম জনক জননী ও স্বজনগণের ক্রোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়। নিম্নে আমরা খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশাবলী প্রদান করিলাম।

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়

খুদিরাম রামশীলা (কন্যা) নিধিরাম রামকানাই

রামকুমার কাত্যায়নী রামেশ্বর রামকৃষ্ণ সর্ব্বমঙ্গলা রামতারক (হলধারী)

রামঅক্ষয়

রামলাল লক্ষ্মী শিবরাম

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বংশাবলী হইতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম সময় তাঁহার পিতার বয়স ৬১ বৎসর ও মাতা চন্দ্রমণি দেবীর ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বংশাবলীতে আরও দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মিবার পর খুদিরামের আর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার, রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ৺ কালীমাতার প্রথম পূজারী ছিলেন। প্রায় এক বৎসর পূজার পর তাঁহার দেহত্যাগ হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃব্য পুত্র রামতারক (হলধারী) কালী মন্দিরে পূজক হন। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয় ও অনুগত সহচর হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃস্বসা রামশীলার দৌহিত্র। সুতরাং সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয় হইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আসল কোষ্ঠী নষ্ট হওয়াতে ১২৮৬ সালে অম্বিকা আচার্য্যের দ্বারা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত হয় তাহাতে জন্ম বৎসর ১৭৫৬ শক, ও ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া জন্মদিন বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কোষ্ঠীতে ভুল আছে বলিতেন। কোষ্ঠী সংশোধনের জন্য ১৩০০ সালে ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিরত্ন গণনা করিয়া জন্ম বৎসর ১৭৫৪ শক স্থির করেন, কিন্তু দিন ও তারিখ তাঁহার সহিত অম্বিকা আচার্য্যের কোন ভিন্নতা নাই। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা অবলম্বন করিয়া স্বামী সারদানন্দ বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম বৎসর ১৭৫৭ শক নিরূপণ করিয়াছেন। এই জন্ম বৎসর ধরিয়া নারায়ণ জ্যোতিভূর্ষণ যে নূতন কোষ্ঠী গণনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, ১৭৫৭ শক ৬ই ফাল্গুন বুধবার

শুক্লা দ্বিতীয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। আমরা এই গ্রন্থে উক্ত বিশুদ্ধ গণনা অবলম্বন করিয়াছি এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ঘটনা সকল ১৭৫৭ শক ধরিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

বিশেষ কারণ বশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের সকলেই তাঁহাকে গদাধর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার বংশানুক্রমিক নাম তাহা বংশাবলী দেখিলেই বুঝা যায় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহার রাশি নাম শম্ভুচন্দ্র রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকা আচার্য্যের ও নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণের প্রস্তুত কোষ্টীতে তাঁহার রাশি নাম শম্ভুরাম লিখা আছে। কোষ্টী গণনা করিবার সময় জ্যোতিষীগণ জাতকের রাশি অনুসারে কোন একটী নাম রচনা করিয়া থাকেন। অম্বিকা আচার্য্যের কোষ্টী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম সময়ের গণনা নয়, ইহা ৪০।৪৫ বৎসর পরে তাঁহার পীড়ার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কুম্ভরাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য জ্যোতিষ মতে তাঁহার নামের আদ্য অক্ষর গ বা শ দুইটী বর্ণের একটী হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহার রাশি নাম শম্ভুরাম হইতে পারে এবং গদাধর ও হইতে পারে। পিতা তাঁহার নামকরণের সময় বিশেষ কারণবশতঃ গদাধর নাম রাখেন, তাহাতে তাঁহার রাশি নামেই নামকরণ হইয়াছে। পিতা কর্ত্তৃক তাঁহার যে শম্ভুরাম বা শম্ভুচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

সকলেই বিশেষ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতাপিতার সকল সন্তান একরূপ হয় না। প্রত্যেকটীর প্রকৃতি ভিন্ন। এই জন্মানুক্রমিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ও ভারতের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা একমত। তবে এদেশীয় তত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রকৃতির কারণ, মানুষের স্বোপার্জ্জিত পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মানুষ যদিও তাহার দেহমাত্র মাতাপিতার নিকট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাতা পিতার মানসিক সংস্কার, সংসর্গ বশতঃ সন্তানের মনে সংক্রমিত হইয়া থাকে, এবং জন্মগ্রহণের পরও সে যেরূপ সংসর্গের মধ্যে থাকে তাহার মনে সেই সংসর্গজনিত ভাব ও সংক্রমিত হইয়া যায়। এইরূপ সংসর্গ প্রাপ্তি ও তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম জনিত। সুতরাং তাঁহাদের মতে মানুষের চিত্তই তাহার সংস্কারের আধার এবং তাহার প্রকৃতির কর্ত্তা সে নিজে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলেন মানুষের সংস্কারসমষ্টি তাহার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত দেহবীজ আশ্রয় করিয়া থাকে। মাতা পিতার শোণিত শুক্রোৎপন্ন সন্তানের দেহেই তাহা সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করে। মানুষ স্বয়ং তাহার প্রকৃতির কর্ত্তা নয়। যাহা হউক, আমরা নিজে নিজে অনুভব করিয়া থাকি যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের এক অজ্ঞাত আবেগে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বিচার

করিয়াও সেই বেগ ফিরাইতে পারি না। স্বতঃ উৎপন্নের ন্যায় এই মানসিক বেগই আমাদের জন্মগত সংস্কার, প্রকৃতি বা স্বভাব। এই প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই আমরা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। গদাধর কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি জন্মগত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি সকল কার্য্য করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন। ভাল মন্দ জ্ঞানশূন্য পাঁচ বৎসরের বালকের স্বভাব ও পরমহংসাবস্থা একইরূপ ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি নিজ বাল্যসংস্কারেরই ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "ঈশ্বরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। বালকের 'আমি' পাকা আমি। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগ্‌ড়া মারী-মারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব কত খেলা। রজোগুণের ও বশ নয়। এই খেলা ঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল, মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে; খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে, হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল, নয় বগলদাবায় করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটীকে বল—বেশ কাপড়খানি কার কাপড় রে? সে বলে—আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে,—না আমি দেব না। তারপর ভুগিয়ে একটী পুঁতুল কি একটী বাঁশি যদি হাতে দাও তা হলে

পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণের ও ,আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না, কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হল, তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়ল, পুরাণো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাতি অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে এ আমার দাদা, তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দিকি আমার ছোঁচান হয়েছে কি না ?”

বাল্যভাবের ঈদৃশ স্বরূপ অভিনয় কি চক্ষে দেখা যায় ? কিরূপ মনে ইহার জীবন্তছবি অঙ্কিত হয় ? কিরূপ জ্ঞানে,— বালক ত্রিগুণাতীত, এরূপ তথ্যের প্রত্যক্ষ হয় ? যদি আমরা সেই চক্ষু লইয়া দৃষ্টি করি আমরা বুঝিতে পারি যে, পাঁচ বৎসরের বালকের মন সকলকেই বিশ্বাস করে, তাহার আত্মপর জ্ঞান থাকে না, সে যাহা কিছু কাজ করে সমস্ত তাহার সরল হৃদয়ের প্রেরণায়, সে কামনা করিয়া কোন কাজ করে না, সে স্বার্থজ্ঞান শূন্য, তাহার ভালবাসায় মায়ার টান নাই, তাহার রাগের ভিতর মোহের সংস্পর্শ নাই, তাহার হর্ষ শোক অর্থহীন, সে আপনার

আনন্দেই মত্ত, খেলার পুতুলটীকেও সে জীবন্ত ভাবিয়া আদর করে, তাহার কাছে সব চৈতন্যময়!

বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে মানুষের বাল্যভাবের এই জগৎ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; ক্রমশঃ তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উদয় হয়, আমিত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, বিচার বুদ্ধির বিকাশ হইযা মানুষকে প্রজ্ঞাবানের আসনে অধিরোহণ করায়। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে যে অবস্থা উপস্থিত হয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহা বলিয়াছেন,—

"মনোগত সকল প্রকার কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাতেই যে তুষ্ট তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ পূর্ণজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখ প্রাপ্তিতে যাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, যাহার বিষয় তৃষ্ণা নাই, যাহার আসক্তি ভয় ক্রোধ মন হইতে বিগত হইয়াছে সেই সন্ন্যাসীই পূর্ণজ্ঞানী। যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আসক্তি রহিত, যাহার শুভ হইলেও হর্ষ নাই অশুভ হইলেও দ্বেষ নাই তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। *

উক্ত গুণ সকল প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ,—ইহাই পূর্ণজ্ঞানীর অবস্থা, ইহাকেই জীবন্মুক্ত বা পরমহংস অবস্থা বলে। মানুষের বাল্যভাব এই অবস্থার প্রতিরূপ। এইরূপ জীবন্মুক্তি লাভ করিবার জন্যই বৈদিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এই শিক্ষার মূলে শ্রদ্ধা—বালকের মত বিশ্বাস। গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, সদাচার পালন, ঈশ্বরোপাসনা, স্বাধ্যায় ও ধ্যানযোগ অবলম্বন, এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনা। ইহার ফল ব্রহ্মজ্ঞান, জীবন্মুক্তি রূপ

* গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৫—৫৭ শ্লোক।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু সে বৈদিক যুগ নাই, সে বৈদিক সমাজও নাই। বর্ত্তমান কালে এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন হইলে হিন্দুর এই জাতীয় আদর্শে পৌছিতে পারা যায়, হিন্দুর জাতীয় ভাব রক্ষা পায় ইহাই এ যুগের প্রবল সমস্যা।

সরল বিশ্বাস, সকলের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, সদানন্দ ভাবও শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের বশে কার্য্যানুরক্তি ইহাই গদাধরের বাল্য-সংস্কার। বাল্যকাল হইতেই এই বাল্যভাব তাঁহার জীবনের নিত্য সহচর। তাঁহার জীবনের কার্য্য সকল লক্ষ্য করিলে তাঁহার উক্ত বাল্যভাবের আবেগই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁহার শুদ্ধ সরল হৃদয়, কি কাজ করিতে হইবে বা কি না করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিত এবং তিনিও তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ অনুরাগে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার বাল্য কিশোর যৌবন বা প্রৌঢ় কোন কালেই তিনি বাল্যভাব বিযুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজ মুখে বলিয়া ছিলেন,—"আমি কাঁদ্‌তাম আর বল্‌তাম—মা, বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।"

পাঁচ বৎসর বয়স হইলে গদাধর লৌকিক প্রথা অনুসারে বিদ্যারম্ভ কাল উপস্থিত বলিয়া পাঠশালায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠশালার শিক্ষা লইয়া নানা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া জানিত এবং তিনি নিজেও আপনাকে মূর্খ বলিয়া পরিচয় দিতেন। সুতরাং সহজেই মনে হইল, তিনি পাঠশালায় নিশ্চয়ই পাঠে অমনোযোগী থাকিতেন, পাঠ-

শালার প্রধান শিক্ষা যে মানসাঙ্ক ও গণিত তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি কোন মতেই প্রবেশ করিত না, এবং পাঠশালার নাম করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া সহপাঠীগণের সঙ্গে হাটে মাঠে বাল্য-খেলায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এই সকল মীমাংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঠশালার শিক্ষা এদেশের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপে ইহার অধি-বেশন হইত। গুরুমহাশয়ের বৃত্তি ব্রাহ্মণেরা প্রায় গ্রহণ করিতেন না, অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ বর্ণের হস্তে ইহা থাকিত। পাঠ-শালায় বালকের শিক্ষা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ বৎসর পরে শেষ হইত। বালক প্রথমে হাতে খড়ির পর, তালপাতায় বর্ণমালা ও বানান লিখিতে আরম্ভ করিত, আর সকল বালকে মিলিয়া সমস্বরে মানসাঙ্ক, কড়া গণ্ডা দশক নামতা বলিতে বলিতে এই সকল তাহার মুখস্থ হইয়া যাইত। পরে তালপাতায় ঐ সকল অঙ্ক লিখন অভ্যাস করিয়া কলাপাতায় তেরিজ জমাখরচ প্রভৃতি ও নাম ধাম পত্র লিখিবার ধারা এবং সর্ব্বশেষে কাগজে, হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া প্রতিলিপি লিখন ও পুঁথি পাঠ শিক্ষার পর পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। দুই চারিজন কায়স্থাদি উচ্চবর্ণ ব্যতীত শুভঙ্করীনিয়ম মাসমাহিনা সুদকষা জমাবন্দী খৎ লেখা মহাজন ও জমিদারের খতিয়ানখাতা লিখন প্রভৃতি অপর কেহই শিক্ষা করিত না। অর্থোপার্জ্জন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না, কোনরূপ বিদ্যা উপার্জ্জন ও ইহার বিষয় ছিল না। পাঠশালায় পড়িলে বিশেষ গৌরব হইত না, আর এরূপ

শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে সমাজের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করিত না। এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কি গৃহস্থ কি, কৃষক কি দোকানী ও কি মহাজন সকলেই আপনার দৈনিক কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারে; যাহাতে সকলেই নিজের কেনা বেচা ও দেনা পাওনার হিসাব, আত্মীয় স্বজনের সংবাদের জন্য পত্র লেখা, আর অবসর থাকিলে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভাষা-পুঁথি পাঠ করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে। ইংরাজ অধিকারে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পুরাতন পাঠশালার শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত হয় নাই বরং তাহার অবনতিই হইয়াছে।

কেবল অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালায় একস্থানে বসিয়া মিলিত ভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া, শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। সুতরাং গদাধরের নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় যাইতেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই বয়সেই পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য যে তাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি স্বহস্তে যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা এরূপ দুই তিনখানি পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। যোগাদ্যার পালা লেখার শেষে নিজের নাম সাক্ষর করিয়া,—ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২৯শে মাঘ শনিবার—লিখিয়াছেন। সুতরাং এই পুঁথি তাঁহার ত্রয়োদশ

বৎসর বয়সের লেখা। এ সময় তাঁহার হস্তাক্ষর কিরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল তাহা পুঁথিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠক-গণের অবগতির জন্য তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

তিনি অবশ্য বলিতেন যে, "পাঠশালায় শুভঙ্করী ধাঁ ধাঁ লাগিত।" কিন্তু এ কথায় এরূপ অনুমান অনুচিত যে অঙ্ক শিক্ষায় তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল, এবং বহু চেষ্টায় তিনি গণিত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের লেখা হিসাব দেখিলে ইহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ৭।৮ বৎসর বালকের পক্ষে হেঁয়ালি ছন্দে শুভঙ্করী নিয়ম, দর্শনশাস্ত্রের সূত্রের ন্যায় ব্যাখ্যা ব্যতীত বোধগম্য না হওয়া তাঁহার মূঢ়তা প্রকাশ করে না। অনেক বৃদ্ধ শুভঙ্করের ও তাহা বুঝিতে ধাঁ ধাঁ লাগিয়া যায়। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, নবমবৎসর বয়সেই গদাধরের পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তিনি পুঁথি লেখা ও পুঁথি পাঠ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সংসারের দেনা পাওনার হিসাবও রাখিতে শিখিয়াছিলেন।

কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। বাল্যকালেই এই শিক্ষা লাভ করিবার প্রকৃত সময়। এ দেশের পাঠশালা সেই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত না হইলেও গদাধরের চরিত্রের বিকাশ পাঠশালায়ই আরম্ভ হয়। পাঠশালায় উচ্চ নীচ দরিদ্র ধনী সকলকেই একসঙ্গে লেখাপড়া খেলা গল্প সমস্তই করিতে হয়। বিশেষতঃ কামারপুকুরে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরই বাস। দরিদ্র হীনবর্ণ বালকগণের সহবাসে তাঁহার বাল্যস্বভাব প্রস্ফুটিত হইবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার সরলবিশ্বাসী

আত্মপরজ্ঞানহীন স্নেহময় সদানন্দ বাল্যস্বভাব এই একপ্রাণতার আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া একটী হৃদয়ে আর রুদ্ধ থাকিতে পারিল না। বালকের চক্ষু আপনার পর দেখে না, উচ্চ নীচ বুঝে না, তাহার ভালবাসার টানের ভিতর কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। গদাধরের সরল চক্ষে সমবয়স্ক সহপাঠী বালকেরা কামার কুমার তেলি মালীর ছেলে নয়, তাহারা তাঁহার খেলুড়ে আপনার লোক প্রাণের বন্ধু। তিনি নিজের হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জননীর কাছে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন; জননী চন্দ্রমণি আনন্দে তাহাদের সকলকে প্রীত করিয়া খাওয়াইতেন। আবার গদাধর যখন তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া কি করিয়া তাঁহাকে আপনাদের প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি আহার করাইয়া সুখী করিবে ইহাই চিন্তা করিত। তাঁহার সদানন্দ ভাব সুমিষ্ট কথা মধুরকণ্ঠের গান গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই সকল দরিদ্র নিম্ন জাতীয়-দিগের সুখ দুঃখ দোষ গুণ তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া একপ্রাণ হইয়াছিলেন। এই অনুক্ষণ ইতর সহবাসের সাক্ষী, তাঁহার অশ্লীল কথা উচ্চারণ, যাহার জন্য আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রসমাজ তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিল; আর তাহার সাক্ষী নীচ দরিদ্রের জন্য তাঁহার আজীবন অদ্ভুত সহানুভূতি।

তিনি বাল্যভাবে কিরূপ পরিচালিত হইতেন, তাঁহার স্নেহময় হৃদয় কিরূপ আত্মপর বিবেচনা ও উচ্চ নীচ বিচারশূন্য ছিল,

ভূমির হালের অবস্থা

তাঁহার উপনয়ন সময়ের ঘটনা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। উপনয়ন সংস্কারকার্য্য শেষ হইলে উপনীত বালককে মাতা বা মাতৃবন্ধুগণের নিকট প্রথম ভিক্ষা চাহিতে হয়। স্মৃতি বলেন,—"মাতা বা ভগিনী, অথবা মাতার সহোদরা ভগিনী অথবা যে স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা অবমাননা করিবার সম্ভাবনা না থাকে, ইঁহাদের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন।"* কিন্তু গদাধর তাঁহার মাতার নিকট ভিক্ষা না লইয়া তাঁহার ধাত্রী কামারকন্যা ধনীর নিকট প্রথম ভিক্ষা লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ অশাস্ত্রীয় ও কুলপ্রথা বিরোধী বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও গদাধর সকলের অসম্মতিতে ধনীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবম বর্ষীয় বালকের এরূপ শাস্ত্র ও কুলপ্রথা বিগর্হিত কার্য্য করিবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, ধনী পূর্ব্বে গদাধরকে উপনয়ন সময় তাহার কাছে প্রথম ভিক্ষা লইবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহার এরূপ আচার বহির্ভূত কার্য্যের আচরণ। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ধনীর ঈদৃশ উৎকট অভিলাষের কি কারণ ছিল? এই ব্রাহ্মণসংসার কিরূপ আচারনিষ্ঠ সে জানিত; সে গদাধরের ধাত্রী,—গদাধর তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করে, তাহাকে মাতৃবৎ ভক্তি করে তাহাও জানিত। তথাপি উপনয়ন কালে শূদ্রের ভিক্ষা গ্রহণ করাইয়া পরিজন সকলকে সন্তাপিত করিলে, নিজে

* মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ৫০ শ্লোক।

অগ্রে ভিক্ষা দিয়া মাতাকে বঞ্চিত করিলে তাহার কি অধিক ইষ্টলাভ হইবে? আবার এই নিরর্থক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য গোপনে পূর্ব্বাহ্ণে বালককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা,—ধর্ম্মভীরু স্ত্রীলোকের মনে এরূপ কুটিলতা ও ঘৃণ্য স্বার্থপরতার উদয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উপনয়ন কালে গদাধরের শূদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ, তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার নিমিত্ত বিচারবুদ্ধি প্রসূত দৃঢ়পণ বলিয়া বোধ করা যায় না, এবং সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দ্বারা বর্ণধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিধির অসারতা প্রদর্শনও মনে করা উচিত নয়। তিনি চিরজীবন সর্ব্বান্তঃকরণে শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতেন, কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই।

আমাদের অনুমান হয়, ধনী গদাধরের উপনয়ন কালে তাঁহার একজন ভিক্ষা দাতা হইবে, এই মাত্র অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গদাধর তাঁহার সহজ বাল্যভাবের আবেশেই মাতার নিকট ভিক্ষা না লইয়া ধনীর নিকট প্রথম ভিক্ষা যাচ্‌ঞা করেন। তাঁহার সরল বিশ্বাসী বালকের চক্ষে ধনী শূদ্র কুলোদ্ভবা নীচ জাতীয়া স্ত্রী নয়। ধনী তাঁহার ধাত্রী,—প্রসবান্তে ধনীই তাঁহাকে প্রথম ক্রোড়ে লইয়াছিল। জননীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে ধনীও তাঁহার মা; তিনিও বুঝিয়াছিলেন ধনী তাঁহার ষোল আনা মা। ধনীর অকপট স্নেহ তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন। সেই ভালবাসার আকর্ষণে অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রবিধি ও দৃঢ় আচারনিষ্ঠা ভাসিয়া গেল, তাঁহার অনুপম মাতৃভক্তিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না, তিনি ধনীর

সম্মুখে—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়াছিলেন। যতদিন না মানুষ এরূপ বালকের মত সমদর্শিতা লাভ করে, ততদিন মানুষের ভ্রাতৃভাব কেবল কথায় থাকিয়া যায়।

হৃদয়ের বিকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণের সুললিত কণ্ঠের প্রাণমনমুগ্ধকারী গান অনেকেই শুনিয়াছেন। যে একবার শুনিয়াছে তাহার মোহিনী আকর্ষণ কখন ভুলিতে পারে নাই। এই সুমধুর গানের উৎস বাল্যকালে তাঁহাতে স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়াছিল। রামযাত্রা কৃষ্ণযাত্রা রামরসায়ণ চণ্ডীরগান হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রামে যাহা হইত গদাধর তাহা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, একবার যাহা শুনিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না, আর যেরূপ শুনিয়াছেন অবিকল তাহা গাহিয়া দিতে পারিতেন। গান শিখিয়া সেই গান সকলের কাছে গাহিয়া বেড়ান গদাধরের প্রধান বাল্যক্রীড়া। সুতরাং আমরা সহজে বুঝিতে পারি কেন সদানন্দ, প্রিয়দর্শন বালক গদাধর শৈশবেই গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই স্নেহ ভাজন হইয়াছিল। তাঁহার মুখে গান শুনিবার জন্য সকল ঘরেই তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া যাইত। সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। গ্রামের নিকটে প্রান্তর বেষ্টিত মাণিকরাজার সুন্দর নির্জ্জন আম্রকানন, ইহার পার্শ্বেই গোচারণ ভূমি। রাখাল বালকেরা প্রত্যহ এইস্থানে গরু চরাইতে আসিত। গদাধরকে দেখিতে পাইলে তাহারা গরুগুলি গোচারণ মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আমবাগানের ভিতর গদাধর ও তাঁহার

সহচরদের সঙ্গে মিলিয়া কখন গান ব কীর্ত্তন কোন যাত্রার পালা অভিনয় করিয়া খেলা করিত। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই বাল্যক্রীড়ার ভিতর দিয়া গদাধরের ভাবময় চরিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। কেমন তাঁহার সঙ্গীত ও অভিনয় অনুরাগ, ভগবৎ অনুরাগের দিকে তাঁহাকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তনের অমোঘ ফল—ভগবৎ ভক্তি, তাঁহার কোমল অন্তর কেমন অলক্ষ্যে পূর্ণ করিতেছে।

গদাধরের নিজ গৃহও তাঁহার হৃদয় বিকাশের অপর একটী পুণ্যক্ষেত্র। জ্ঞানোদ্রেকের সঙ্গে তিনি সর্ব্বক্ষণ একাগ্র চিত্তে দেখিতেন, তাঁহার পিতা কিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে ইষ্টদেব রঘুবীরের সেবার আয়োজন করিতেছেন, স্বহস্তে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া শ্রীবিগ্রহকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিতেছেন, কি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পূজা জপ ধ্যান স্তবপাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, নিমিলিত নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে! তাঁহার সৌম্য তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি কি অপূর্ব্বরাগেরঞ্জিত! জীবনের প্রত্যূষে তাঁহার নির্ম্মল মানসপটে এই পবিত্র চিত্র দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যখন আমার বাবার ভক্তির কথা ভাবি,—তিনি ফুলগুলি লইয়া তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীরের পূজা করিতেছেন, তখন আবার যেন আমার হৃদয়ে সেই ফুলগুলি ফুঠে উঠে, আমাকে দিব্য সৌরভে পূর্ণ করে।"

কিন্তু তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই পবিত্র শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে অতি অল্প দিনই ঘটিয়াছিল। সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মনে হইতে পারে জীবনস্বরূপ পিতার দেহাবসানে তাঁহার স্নেহময় হৃদয় কিরূপ শূন্যময় ও সহায়হীন বোধ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বালকের মন ভাব-প্রবণতা বশতঃ সংসারের এইরূপ দুর্ঘটনায় সে সাময়িক অধৈর্য্য হইলেও, তাহার চিত্ত বিচারপ্রবণ হয় না; সুখ দুঃখের ভবিষ্যৎ বিচারে তাহার মন চিন্তাকুল হইতে চাহে না। আমরা জানি, বাল্যভাবই গদাধরের হৃদয়ের বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁহার দয়াপূর্ণ অন্তরে মায়া কিরূপে দীর্ঘকাল স্থান পাইবে? পিতার অদর্শনে তাঁহার হৃদয়ের শোকাগ্নি অল্প দিনেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, এরূপই অনুমান হয়।

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের, গ্রামের ভিতর অতিথিশালা আছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান হইতে পুরী পর্য্যন্ত একটী পাকারাস্তা কামারপুকুরের নিকট দিয়া গিয়াছে। পুরীযাত্রী অনেক সাধু সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার এবং দর্শনান্তে ফিরিবার সময় এই অতিথিশালায় বিশ্রাম করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। গদাধরের পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরে ঘটনাবশতঃ গ্রামের অতিথিশালায় অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। গদাধর অবকাশ সময় অতিথিশালায় সাধু দর্শন করিতে যাইতেন। পূর্ব্বে তিনি যেরূপ পিতার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত রঘুবীর বিগ্রহের পূজাদি দেখিয়া অন্য কাজ ভুলিয়া যাইতেন, এই সাধুদের গান ভজন পাঠ পূজা দেখিবার জন্য

সব ভুলিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া থাকিতেন। তিনি নিবিষ্ট মনে কাহারও শাস্ত্রপাঠ ও ভজন শ্রবণ করিতেন, কাহারও স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন, অঙ্গে বিভূতি লেপনাদি কর্ম্ম আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কাহারও বা ইষ্ট-বিগ্রহ পূজার জন্য দ্রব্যাদি স্বহস্তে আহরণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। এ সময় সাধুদের নানাভাবে সেবা করিতে দেখিয়া মনে হয়, গদাধরের জীবনের আকাঙ্ক্ষা যেন এক অভিনব উত্তেজনার বশে পূর্ণ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তিনি বলিতেন,—

> "ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে সাধুরা যা পড়্‌তো, বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তবে একটু আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি, কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।" (ক)

তাঁহার এই কয়টী কথা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার একাগ্রতা কিরূপ গাঢ় ছিল। অপঠিত গীতাদি সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ অনন্যমনে শ্রবণ করিয়া তিনি এই বাল্যবয়সেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই কথাগুলির নির্দ্দেশে আমরা যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাই, কি গভীর অনুরাগে তিনি সাধুসন্ন্যাসী বেষ্টিত হইয়া তাহাদের পূজা দেখিতেছেন, ভজন শুনিতেছেন, তাহাদের ক্রিয়াকলাপে অবহিত চিত্তে যোগ দিয়া আপনাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া বোধ করিতেছেন। শুনা-যায়, একদিন তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া সাধুদের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ ও অঙ্গে বিভূতি লেপন করিয়াছিলেন। অতিথিশালা

হইতে এইরূপে সাধুবেশে সজ্জিত হইয়া গৃহে আগমন ও জননীকে তাহা আনন্দে প্রদর্শন,—তাঁহার বাল্যক্রীড়া মাত্র বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে তাঁহার অন্তরের সরল বিশ্বাস ও অনুরাগই দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম বৎসর বয়সে তাঁহার উপনয়ন ও পাঠশালার শিক্ষা সমাপন হইলে তিনি গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজার ভার প্রাপ্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কিরূপে দেবপূজা ও জপধ্যানাদি করিতে হয়, তিনি পিতা এবং সাধুসন্ন্যাসীগণের আচার দেখিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং দেবপূজায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করিবার সময় পাইয়াছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে রঘুবীরের পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মনে হইতে পারে যে, দেশে সর্ব্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মবিদ্বেষের মধ্যে তাঁহার অন্তরে,—সকল ধর্ম্মমত সত্য,—এই উদারভাব কোন সময় উদয় হইয়াছিল? ভাবিয়া দেখিলে বোধহয় যে, বাল্যকালেই গৃহদেবতা পূজাকালীন তিনি উক্তরূপ অসাম্প্রদায়িক তথ্যে উপনীত হন।

আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার পিতা গৃহদেবতা বিষ্ণুশিলা রঘুবীর ও রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি শীতলাদেবীর ঘট স্থাপনা করিয়া তাঁহার নিত্য পূজা করিতেন এবং অঙ্গনে রোপিত সাজবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা হইত। এই শীতলা ও মনসাপূজা বিশেষ অবধান যোগ্য। যদিও স্থানে স্থানে শীতলাদেবীর স্বতন্ত্র পূজার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যথায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়, প্রায় সেই স্থানেই শীতলাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের

পূজিত শিশুরক্ষাকারিনী, ব্রণনাশিনী হারীতীই এক্ষণে শীতলারূপে পূজা পাইতেছেন। ধর্ম্মঠাকুরের ন্যায় শীতলা পূজকেরাও অতি নিম্নজাতীয়। ইহাদের শীতলা পণ্ডিত বা ডোম পণ্ডিত বলে। শীতলা পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে শীতলা মূর্ত্তি হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে শীতলার মানৎপূজা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গৃহস্থেরা বসন্তরোগ নিবারণের জন্য শীতলার পূজা দেন বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকেই শীতলা মূর্ত্তি পূজা করিতে দেখা যায় না। ঘট স্থাপন করিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ গৃহে শীতলার নিত্য পূজা আর কোথাও আছে কিনা আমরা অবগত নহি। কিন্তু শাস্ত্রানুগামী আচারবান্ খুদিরামের নিত্য শীতলা পূজায় তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবের পরিচয় প্রদান করে। বিশেষতঃ গ্রামে যে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার উৎসবে গ্রামের আপামর সাধারণের মত তিনিও ভক্তিপূর্ব্বক যোগদান করিতেন, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনসাদেবী ও গ্রাম্য দেবতার মধ্যে পরিগণিত এবং নিম্নজাতির ভিতর ইঁহার প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণের গৃহে ইঁহার নিত্যপূজাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতলা ও মনসাদেবীর উপর খুদিরামের ভক্তি ও বিশ্বাসের উদার ভাব, বালক গদাধরেও যে সংক্রমিত হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গৃহে পূজাকালীন গদাধরের সহজ বাল্যভাব ও এই মহাসত্য ধারণা করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার সরল আত্মপর দৃষ্টিহীন মন, পাঠশালায় শিক্ষার সময় সহপাঠীদের ভিতর যেমন উত্তম ও অধম ভাব দেখিতে পায় নাই, গৃহ

দেবতা পূজাকালে বিষ্ণু শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দেব দেবী মূর্ত্তি সমভাবে তাঁহার অনুরাগ আকর্ষণ করিত, এবং শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টরূপ বিদ্বেষ ভাব তাঁহার ভক্তিরসসিক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি যেমন সমবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া প্রমত্ত ভাবে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন সেইরূপ কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের শিব শ্যামা বিষয়ক গান করিতেও তাঁহার সবিশেষ আনন্দ হইত। তাঁহার পিতার আদর্শ এবং নিজ বাল্যভাব অনুরঞ্জিত পূজা ও কীর্ত্তনাদি তাঁহাতে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে দেয় নাই।

শ্রুত হওয়া যায়, এই সময় দেবপূজা ও সাংসারিক কর্ম্মের অবসরে তিনি অধিক সময় প্রতিবেশীদিগের গৃহে গান ও কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিতেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি পুঁথি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তির সহিত মধুরস্বরে একান্ত মনে প্রহ্লাদ চরিত্র, দাতাকর্ণ প্রভৃতি পুঁথিপাঠ শুনিতে স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ সকলেই সমবেত হইত। সায়ংকালে গ্রামের মধু জুগী, শ্রীনিবাস শাঁখারি, সীতানাথ পাইন প্রভৃতির বাটীতে প্রতিবেশীগণ মিলিত হইয়া পরমানন্দে গদাধরের গান ও পুঁথিপাঠ শ্রবণ করিত। সদানন্দ বালক গদাধরকে গ্রামের সকলেই কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিত সীতানাথ পাইনের কন্যা রুক্মিণীর কথায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। রুক্মিণী বলিয়াছিলেন,—"গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণ কথা বলিতেন, কত রঙ্গ পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় ঐ সকল শুনিতে শুনিতে

আনন্দে গৃহকর্ম্ম সকল করিতাম। তিনি যখন আমাদের নিকট থাকিতেন তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা একমুখে আর কি বলিব। যে দিন তিনি না আসিতেন সে দিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদের মন ছট্‌ফট্‌ করিত। ...তাঁহার প্রত্যেক কথাটী আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সেজন্য তিনি যে দিন আমাদের বাটীতে না আসিতেন, সে দিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"*

গদাধর জন্ম হইতেই পিতা পিতৃব্য ও অনেক সাধুসন্ন্যাসী সংসর্গে মহাসাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। সেই মহাজন সংসর্গে তাঁহার সহজাত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে পূজা জপ ধ্যান ভজনে সর্ব্বদা মত্ত করিয়া রাখিত। কখন দেবপূজা, কখন ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন, কখন পুঁথিপাঠ, কখন দেবলীলা অভিনয়, এইরূপে তিনি কালক্ষেপ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ভগবৎ স্মরণ মনন কীর্ত্তনই যেন জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই গদাধরে আমরা নব লক্ষণা ভক্তি উদ্ভাসিত দেখিতে পাই। এ সাধনের কি কোন ফল নাই? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার মঙ্গলজনক ও পবিত্রকারী চরিত্র কথা শ্রবণ, আমার লীলা সকল গান ও স্মরণ, বারংবার আমার জন্মাদি অভিনয় ও আমার আশ্রিত হইয়া এবং আমার সেবার জন্য ধর্ম্ম অর্থ ও কাম আচরণ করিয়া, সনাতন পুরুষ যে আমি আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করে। এইরূপে

* লীলাপ্রসঙ্গ, পূর্ব্বকথা।

সৎসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত ভক্তির দ্বারা, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার উপাসক ভক্ত হন এবং সাধুগণ আমার যে পদ দর্শন, করিয়া থাকেন তাহা অনায়াসে লাভ করেন।"*

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছিলেন,—

"নারদ বল্‌লেন,—আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি। এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙ্গ কর্‌তে হয়। সৎসঙ্গ কল্‌লে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা,—ঈশ্বর কথাবই আর কিছু শুন্‌তে ইচ্ছা করে না, তাঁরই কাজ কর্‌তে ইচ্ছা করে। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী-নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তিহয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁর কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুন্‌তে ও বল্‌তে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বল্‌তে বল্‌তে লাল পড়ে।

"ভক্তি মানে কি—না কায়মনবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া; কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা; বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কল্‌লে, তাঁর নাম গুণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন কল্‌লে, তাঁর

* শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশস্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়, ২৩—২৫ শ্লোক।

উপর ভালবাসা ক্রমে হয়। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণ গান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বে কোন সন্দেহ নাই।” (ক)

কিরূপ মনের অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয় তিনি বলিতেছেন,—

“ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। ভক্তি পাক্‌লে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে মানুষ অবাক্ হয়ে যায়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়। একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্‌শূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভাব হলে বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়। (ক)

গদাধরের বাল্যজীবনে ভগবানের নাম গুণ কীর্ত্তনের ফল অবিলম্বে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্চলা ভক্তিবশে একদিন তাঁহারও মনপ্রাণ ঈশ্বরে লীন হইয়াছিল। একদিন তাঁহারও মন সচ্চিদানন্দকে ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

“ছেলে বেলাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দশ এগার বছরের সময়, বিশালাক্ষী দেখ্‌তে গিয়ে মাঠের উপর কি দেখ্‌লাম! একেবারে বাহ্য শূন্য! সবাই বল্‌লে বেহুঁস হয়ে গিছ্‌লাম, কোন সাড়্ ছিল না। সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম! নিজের ভিতর আর একজনকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। যখন ঠাকুর পূজা কর্‌তে যেতাম, হাত্‌টা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে

না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্‌তো, আর ফুল মাথায় দিতাম। যে ছোক্‌রা কাছে থাক্‌তো, সে আমার কাছে আস্‌তো না, বল্‌তো,—তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।" (ক)

কামারপুকুরের নিকট আনুড় গ্রামে, বিশালাক্ষী দেবীর স্থান। কয়েকজন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেবীর পূজা উপলক্ষে প্রান্তর পার হইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ মাঠের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। গদাধরের ইহাই প্রথম ভাব-সমাধি। ভাবসমাধি হইলে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইত, ব্রাহ্ম-ভক্তের ও প্রতাপচন্দ্রের কথায় পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীম, তাঁহার ভাব সমাধির এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন।......মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। ...হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই! অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়? না জানি কতদুর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়! গানটী এই,—

"চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।

নব রাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত ;
(কিবা) বিজলী চমকে সে রূপ-আলোকে পুলকে শিহরে জীবন ।”

গানের এই চরণটী গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চ, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বর দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে,—

“হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন ।”

আবার সেই ভুবন মোহন হাস্য—শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ, স্তিমিত লোচন, কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন,—আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন ; সমাধি ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।” (ক)

কথিত আছে যে, অনেকাংশে এবংবিধ দিব্যদর্শনের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিশুখ্রীষ্টের ভক্তদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য যখন সল্ নামক কোন খ্রীষ্ট বিদ্বেষী দামাস্কাস্ নগরে যাইতেছিলেন, পথে এক দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। সল্ দিব্যস্বর শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,—সল্! সল্! কেন আমাকে পীড়ন করিতেছ? সল্ বলিলেন,—প্রভু! আপনি কে? উত্তর শুনিলেন—আমি যিশু যাহাকে তুমি পীড়ন করিতেছ।

পরে ইনিই সেণ্ট পল্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন সমগ্র গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন।

সংশয়বাদী প্রশ্ন করেন,—"ঈশ্বরকে কি দেখা যায়'?" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে অবিশ্বাসীর বিশ্বাসের জন্য সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া বলিয়াছেন,—

> "হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায় আবার অরূপও দেখা যায়। ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলে,—"আমি ঈশ্বরকে দেখেছি", তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে,—আমাদের দেখিয়ে দিক্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখ্তে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ঘুর্তে হয়, তখন কোন্টা কফের নাড়ী, কোনটা বায়ুর নাড়ী, কোন্টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গ করতে হয়।" (ক)

দিব্য দর্শন লাভ হইলে কিরূপ অনুভব হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

> "জ্ঞান হলে তাঁকে আর দূরে দেখা যায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না, তখন ইনি,—হৃদয়ের মধ্যে, অন্তর্যামী-রূপে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।" (ক)

একাদশ বৎসর বয়সে হৃদয়ের তীব্র অনুরাগে সচ্চিদানন্দময়ী মার দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, মা

তাঁহার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। এখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী। তাঁহার অনুরাগের বস্তু এখন তাঁহার নিজের হৃদয় মধ্যে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর্মুখীতা মাঝে মাঝে এত তীব্র হইত যে, তিনি অন্তর্যামীর সহিত তন্ময় হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া যাইতেন,—তাঁহার আমিত্ব জ্ঞান লোপ হইত। সুতরাং বিশেষ উদ্দীপনা হইলে তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণে যে ভগবানের দিব্যরূপ দর্শন করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! এরূপ শুনা যায় যে, এই সময় গ্রামের বালকেরা মিলিত হইয়া একটী যাত্রার দল করিয়াছিল। গদাধর এই যাত্রা-দলের একজন বিশিষ্ট অধিনায়ক ছিলেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতানাথ পাইনের বাটীতে সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অভিনয় হইবার কথা। গদাধরের স্যাঙাত (সখা), গ্রামের জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু, বেশকারী হইয়া তাঁহাকে শিবের বেশে সাজাইয়া দিল। গদাধর শিব সাজিয়া আসরে আসিবামাত্র শিবের আবেশে তাঁহার গভীর ভাবসমাধি হইয়া সমস্ত রাত্রি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনুরাগের প্রাবল্য হইলেই এরূপ ভাব সমাধি তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত।

এই কালের আর একটী জনশ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ঘটনাটী অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া সহজে বিশ্বাস না হইবার কথা। জনশ্রুতি এরূপ যে, কোন সময় গ্রামের জমি-দার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হয়। সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে গদাধরও শ্রাদ্ধসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলী বিশেষ কোন

শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। গদাধর নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইল যে, পণ্ডিতগণের সকল সন্দেহ দূর হইয়া তাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। রামকৃষ্ণ চরিত লিখিতে গিয়া অধ্যাপক মাকস্ মুল্যার্ ইহাকে ভক্তগণের কাল্পনিক অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু গদাধরের দিব্যদর্শনের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাকে গল্প বলিয়া মনে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দিব্যভাবাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা কল্লে আমার একটী অবস্থা হয়। পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড়্ কুটো মনে হয়। সেজবাবুর * সঙ্গে এক জায়গায় গিছ্লাম, অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার কর্‌তে এসেছিল। আমি ত মুখ্যু। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্‌লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলে বল্‌লে, মহাশয়, আগে যা পড়েছি তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়াবিদ্যা সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফোটে। তাই বল্‌ছি বই পড়লে পণ্ডিত হয় না।" (ক)

* রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস। রাণীর সেজজামাতা বলিয়া সকলে সেজবাবু বলিত।

এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, এ সময় গদাধরের মনে দিব্যভাবের আবেশ হওয়াতেই শ্রাদ্ধসভায় বালকের নিকট পণ্ডিতগণ নিরুত্তর হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমরা তাঁহারই কথায় এইমাত্র বলিতে পারি,—

> "তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন, আর কষ্ট নাই।" (ক)

কি প্রগাঢ় ধ্যানযোগে মন নিমগ্ন হইলে, কীদৃশ প্রবল ঈশ্বরানুরাগ ও অব্যভিচারী ভক্তি বশে ভগবৎ প্রেমের বন্যা হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে, একাদশ বৎসরের বালক ঈশ্বর দর্শনের অধিকারী হয়? ইহা পৌরাণিক উপন্যাস নয়, কবি কল্পনা নয়, ভক্তগণের অত্যুক্তিপূর্ণ অযৌক্তিক রটনা নয়, কিন্তু এই অলৌকিক রহস্য এক শুদ্ধসত্ত্ব স্বার্থলেশশূন্য সত্যমূর্ত্তি, বালকবৎ সরল পুরুষোত্তমের শ্রীমুখ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাবোন্মত্ত প্রেমানন্দ অবস্থা, ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন এবং বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা তাঁহাদের মনোবুদ্ধির অগম্য; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। জগতের ইতিহাসে এরূপ আর কয়টী জীবন আমরা দেখিতে পাই!

বুদ্ধির উন্মেষ

আশু শৈশব হইতেই গদাধরের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। যে বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ, মন সহজেই তাহাতে একাগ্রভাবে সংযুক্ত হইত। তিনি যখন যাহা চিন্তা করিতে বসিতেন তাহাতেই তন্ময় হইতেন। তাঁহার একাগ্রতা সম্বন্ধে এরূপ একটী ঘটনা শুনা যায়,—বর্ষাকাল একদিন প্রভাত সময় কয়েকটী প্রতিবেশী বালক মিলিয়া মাঠের আলি পথে যাইতে যাইতে চুবড়ি হইতে মুড়ি লইয়া খাইতেছিলেন। সহসা একখানি মেঘ উঠিয়া গাঢ় অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। গদাধর দেখিলেন, এক ঝাঁক বক সেই সময়ে উড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার মনে হইল যেন কালমেঘের কোলে শ্বেতপুষ্পের মালার সুন্দর শোভা হইয়াছে। একাগ্রমনে দেখিতে দেখিতে এরূপ ধ্যানমগ্ন হইলেন যে, জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঠে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। ঘটনাটী তিনি নিজে বলিয়াছিলেন। এরূপ সহজে যে চিত্ত একাগ্রভাবে তন্ময় হইতে পারে, অজ্ঞাত সত্য সেই চিত্তই আবিষ্কার করিতে সমর্থ, সেই চিত্তই অলৌকিক তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার অধিকারী।

তিনি স্বহস্তে ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে ভাল বাসিতেন। এ প্রকার প্রবাদ যে, তিনি শিব ও শ্যামা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সোপচারে পূজা করিয়াছিলেন। গ্রামে পূজোপলক্ষে যে গৃহে

প্রতিমা নির্ম্মাণ হইত গদাধর যাইয়া নিবিষ্ট মনে তাহা দেখিতেন। কিরূপে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হয় তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

> "চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রং ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং—পরে পরে কর্‌তে হয়।" (ক)

অল্পদিনেই তিনি সুন্দর দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি কেহ কেহ দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনের হৃদয় বলিতেন যে, তাঁহার হাতের প্রস্তুত শিব মূর্ত্তি দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর দৃষ্টি তাঁহার উপর আকৃষ্ট হয়, এবং কালীবাড়ীর মন্দিরের পূজা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্বহস্তে দেবমূর্ত্তি গঠন করিবার সার্থকতা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

চিত্রকর চক্ষে সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, মানস পটে সেই সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, পরে তাঁহার তুলিকা সেই সৌন্দর্য্য চিত্রপটে প্রতিফলিত করে। তিনি বলিতেন, 'ভিতরে ভক্তি না থাক্‌লে চালচিত্র আঁকা যায় না।' কিরূপ দেবভাবে তন্ময় হইয়া তিনি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহার উক্ত কথায় তাহা প্রকাশ পায়। যে প্রতিভা বলে মহান্ সৌন্দর্য্য-ছবি মানসনেত্রে ধারণ করিয়া অসাধারণ ধীসম্পন্ন চিত্রকরের অলৌকিক চিত্র জীবন্তবৎ দৃষ্ট হয়, গদাধরের অনুপম সৌন্দর্য্যলুব্ধ চিত্তে তাহা বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—

"যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফেলে, চক্ষু দেখ্‌লেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?" (ক)

অতুলনীয় রাফাএলের দৈব তুলিকায় এই চিত্র চিত্রিত হইবার যোগ্য!*

গদাধরের দৃষ্টিশক্তি এরূপ সূক্ষ্মভাবগ্রাহী ছিল যে, কোন বিষয় দেখিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন রূপ সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং স্মৃতিপটে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া রাখিতেন। আবার যখন তাঁহার সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতেন, তাহার স্বাভাবিকতা সকলকেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিত। মনীষা ও প্রতিভার অদ্ভুত সমাবেশ নটকুলরবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যদি ঠাকুরকে আমাপেক্ষা কোনও বিষয়ে খাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নোওয়াইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু খ্যাতি আছে, কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হৃদয়ে জীবন্ত ভাবে গাঁথা রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের সাধকের চরিত্র তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়া মাত্র তুলিয়াছি। আমার মস্তিষ্ক নিতান্ত দুর্ব্বল নহে; একদিন তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের কথা শুনিতে শুনিতে আমি তাঁহাকে

* রাফাএলে ইটালির ক্ষণজন্মা চিত্রকর, মেরি কোলে যিশুখ্রীষ্টের দৈবী মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া জগতের অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—মহাশয়, আর বলিবেন না, আমার মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম।"

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অপূর্ব্ব সূক্ষ্মভাবগ্রাহিতা তাঁহার চিত্তবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় নয়। বাহ্য জগতের সামান্য দৃষ্টবিষয় হইতে, অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বের উদ্ভাবন একমাত্র প্রতিভারই কার্য্য। একটী আপেলের পতন বা একখানি অস্থিখণ্ড দর্শন করিয়া মহা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার, নিউটন ও ডারবীনের মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হয়। মনোরাজ্যের অলৌকিক দার্শনিক তত্ত্ব ভগবান কপিল ও পতঞ্জলির মানস ক্ষেত্রে উদয় হয়। মানব চরিত্রের মহীয়সী মহত্ত্ব মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাসের লেখনী চিত্রিত করিতে পারে। আর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিই প্রত্যক্ষ করেন।

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাশি, অনাদি বর্ত্তমান বেদ, কিভাবে বৈদিক ঋষি হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল এই বহিঃশিক্ষা পরিশূন্য মূর্খ ব্রাহ্মণ তাহা দেখাইয়াছেন। অলৌকিক অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল যে রূপে তাঁহার চিত্তে প্রকাশিত হইত তিনি তাহা বলিয়াছিলেন,—

আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো,—এই চক্ষু দিয়ে, যেমন তোমায় দেখ্ছি, এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।" (ক)

শ্রুতিতে উল্লিখিত,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।

"সহবর্ত্তি ও সমান স্বভাব দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে সংযুক্ত রহিয়াছেন; তদুভয়ের মধ্যে একটী (জীব স্বাদু-

কর্ম্মফল ভোগ করেন; আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র।" জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মহান্ উপমা, তিনি ঈদৃশ সাকার ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের যে সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা তিনি বলিতেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

গদাধরের চক্ষু সকল বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিত; তাঁহার চিত্ত এই সকল দৃষ্টবিষয়ের প্রকৃত ভাব সহজেই অবধারণ করিত; এবং তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ বুদ্ধি তন্ময় হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিত। এই প্রকার মানসিক বিকাশ প্রতিভার চরমোৎকর্ষ। কি শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন? বালককালের শিক্ষা হইতে আমরা যে সংস্কার সঞ্চয় করি, হৃদয়ে তাহা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে,—জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহার শক্তি অনুমাত্র ক্ষীণ হয় না। বালকের কোমল চিত্ত দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় যেরূপ ছাঁচে ঢালিবে সেইরূপ আকারই ধারণ করিবে। বালকের চিত্ত আবেগময়ী নব প্রাণের স্পন্দনে সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালকের বাল্যক্রীড়া ও কার্য্যানুরাগ সেই চঞ্চলতা প্রকাশ করে। বালককে তাহার ক্রীড়া ও অনুরাগের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, অন্যথা সেই শিক্ষা ফলবতী হইবে না। গদাধরের পাঠশালায় কোন প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় নাই। কারণ, সেকালের পাঠশালা বুদ্ধি বিকাশের স্থান ছিল না। যে কোন পাঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া বর্ণমালা ও গণিতের অভ্যাস, আর দাগা বুলাইয়া হস্তাক্ষর শিক্ষা, পাঠশালার চরম

ফরিদপুর

উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়াও গদাধর আপনাকে মূর্খ বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, যেখানে যাত্রাগান কীর্ত্তন; তাঁহার শিক্ষার স্থান, যেখানে হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর; যেখানে প্রখর রৌদ্রতাপিত ঘর্ম্মাক্ত কৃষক কর্ষিত ভূমি; যেখানে পাদপ-ছায়া-শীতল, পক্ষীকূজিত, গুল্মলতা পরিবৃত নির্জ্জন উপবন; যেখানে দুর্ব্বাদলপূর্ণ গোচারণের মাঠ; যেখানে শস্যশ্যামলা দিগন্ত-ব্যাপী ধান্যক্ষেত্র; আর তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, ধূপ-গন্ধ-সুবাসিত, ফল-পুষ্প-সুশোভিত পুণ্য দেবগৃহ। পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া সাধারণ আহারে পুষ্ট হইয়া, অনাবৃত মাঠে কাননে খেলা করিয়া, তাঁহার শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল। মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণবিবর মধুরস্বর শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইত, একবার যাহা শুনিত, ভুলিতে পারিত না। প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু সৌন্দর্য্য দর্শনে লোলুপ হইত, দেখিবার সাধ মিটিত না। সুমধুর কীর্ত্তন গান করিয়া তাঁহার সুকণ্ঠ সুমিষ্ট বাক্য ভিন্ন অন্য কথা বলিত না। তাঁহার হস্ত অনুরাগের আবেশে সুন্দর দেবমূর্ত্তি গড়িয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমা সৃষ্টি করিত। এইরূপে তাঁহার সৌন্দর্য্য-লিপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নির্ম্মল চিত্তপটে শুদ্ধ-ভাবের ছবিই আঁকিত। তীব্র ভগবৎ অনুরাগ, অটল একাগ্রতা, ও অখণ্ড স্মৃতি বেগবতী স্রোত-স্বিনীর ন্যায় প্রবলতম হইয়া, তাঁহার চিত্তভূমি হইতে সর্ব্ব-প্রকার অবিদ্যা ও বাসনা বিধৌত করিয়াছিল। এবং সর্ব্বাবভাসক অমল নিষ্কলঙ্ক সত্ত্বগুণ, অসাধনলব্ধ ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে, তাঁহার অমানুষিক প্রাতিভজ্ঞান উন্মেষপূর্ব্বক অসাধারণ চরিত্রের বিকাশ করিয়াছিল।

গদাধর প্রবল ঈশ্বরানুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার প্রেমপূর্ণ সৌহার্দ্দ সেই অনুরাগেরই প্রতিচ্ছায়া! তিনি ইতর ভদ্র সকলকেই আপনার ভাবিয়া দেখিতেন। তাঁহার খেলার সহচর যুগী, কামার, জেলে, মালা, তাহাদের সঙ্গে তিনি সরল প্রাণে মিশিয়া ছিলেন, তাহাদের দোষটা পর্য্যন্ত নিজের করিয়াছিলেন। তাহাদের কাছে অশ্লীল কথা শিক্ষাও তাঁহার এই সহানুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহার অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, দেহের মলমূত্রের ন্যায় বাহিরেই সংলগ্ন থাকিত,—তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে কখনও স্থান পায় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মা! তুমি উনপঞ্চাশ বর্ণরূপিণী, তুমি বেদে আছ, তুমি কি খেঁউড়ে নাই?" অশ্লীল খেঁউড়ও তাঁহার মনে ঈশ্বরভাব উদ্দীপিত করিত। যে অশ্লীল কথা গোপনে বলিতে জিহ্বা কুঞ্চিত হয়, তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া একদিন মহা পাষণ্ড নাস্তিকও কাঁদিয়াছিল। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' নাম তাঁহাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

সাধারণ মানব স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা করে না। সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, যাহা করে সমস্তই স্বার্থ জড়িত। কাজে কাজে তাহার মন স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারে না। কিন্তু পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায়, গদাধরের মনের ভিতর স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না। আর তাঁহার শিক্ষার মধ্যে তিনি কেবল শিখিয়াছিলেন ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি। সুতরাং যেখানে সাধারণ মানবমন স্বার্থ দেখিতে পায়, গদাধর তাহার ভিতর পরমার্থ দর্শন করিতেন। যে সকল বিষয়ের অনুশীলনে কেবলমাত্র

লৌকিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার মধ্যে গদাধর তত্ত্বজ্ঞান দেখিতে পাইতেন। সেই নিমিত্ত ঢেঁকিশালায় ধান ভাঙ্গা, দোকানীর বেচাকেনা, জেলের মাছধরা, কুমারের হাঁড়ীগড়া, মহাজনের ধানমাপা প্রভৃতি সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারের উপমায়, কত গভীর তত্ত্ব তাঁহার উক্তিতে, ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার ন্যায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

তাঁহার বাল্যচরিত্রে আর একটী বিচিত্র অনুরাগের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহার মেয়ে সাজিয়া থাকিবার অভিলাষ। সময়ে সময়ে তিনি মেয়ে সাজিয়া মেয়েদের ভিতর থাকিতেন, তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মত গৃহকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত হইতেন। পল্লির অনেকের অন্তঃপুরে এই ভাবে গান অভিনয় করিয়া অনেক সময় কাটাইতেন। তাহাতে বাটীর কর্ত্তৃপক্ষেরা অনেকেই হর্ষপ্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন, কেহ বা উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার স্ত্রীবেশের অঙ্গভঙ্গী, সাজসজ্জা, চলন বলন এরূপ স্বাভাবিক দেখাইত যে, পুরুষ বলিয়া কেহ সন্দেহ করিত না। স্ত্রীভাবের অভিনয় তাঁহার কিরূপ অকৃত্রিম, তৎসম্বন্ধে এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে।—গ্রামে দুর্গাদাস পাইন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। বোধহয় অবস্থাপন্ন বলিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদের অপর কাহারও সহিত আলাপ করিতে দিতেন না এবং গদাধর অন্তঃপুরে গিয়া গান ও কৌতুক করেন তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। একদিন সন্ধ্যাকালে দুর্গাদাস বাহিরের অঙ্গনে বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর স্ত্রীবেশে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি যেন কোন দুর

গ্রামের বিপন্না স্ত্রীলোক, ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে রাত্রের জন্য আশ্রয় চাহিতেছেন। দুর্গাদাস কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া গদাধরকে অন্তঃপুরে যাইতে অনুমতি দিলেন। গদাধর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বাটীর গৃহিণী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত এরূপ সহজ ভাবে মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, প্রায় প্রহরেক কাল এইরূপে ব্যাপৃত থাকিলেও কেহই তাঁহার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিল না। ইত্যবসরে তাঁহার মধ্যমভ্রাতা তাঁহার অন্বেষণে আসিয়া নিকটে কোন স্থানে থাকিতে পারেন ভাবিয়া, উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গদাধর ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র—যাই গো দাদা! বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং দ্রুতপদে দুর্গাদাসের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রীভাবে অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন। একদিন তাঁহার স্ত্রীলোকের নানারূপ হাবভাবের অনুকরণ দেখিয়া কোন উপস্থিত স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন,—"সে মাথার কাপড় টানা, কাণের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকের কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া,—একেবারে হুবহু ঠিক্।" তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন,—

"আমি একজন কীর্ত্তনীয়াকে মেয়েকীর্ত্তনীর ঢঙ্ সব দেখিয়েছিলাম। সে বল্লে—আপনার সব ঠিক্ ঠিক্; আপনি এসব জান্‌লেন কেমন করে?" (এই বলিয়া তিনি সকলকে মেয়েকীর্ত্তনীর ঢঙ্ দেখাইতে লাগিলেন। কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না)। (ক)

কিন্তু মনে হইতে পারে, গদাধরের স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া

স্ত্রীদিগের ন্যায় আচরণ করিবার অস্বাভাবিক অভিরুচির কারণ কি? বাল্যক্রীড়াবশে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের ভিতর থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসাই দেখিতে পাই। স্ত্রীজাতির প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতিই স্ত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীভাবে থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের মনোভাব বুঝিতে গেলে স্ত্রী হইতে হইবে,---কেবল মনে মনে বুঝা নয়, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইতে হইবে,—বেশভূষায়, কথায়কৌতুকে, মনেজ্ঞানে,—তবে স্ত্রীজীবনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের দুর্ব্বলতা, হৃদয়ের বেদনা বুঝিতে পারিবে। যে সরল হৃদয়ের ভালবাসার টানে গ্রামের দরিদ্র নীচ বালকদিগকে আপনার করিয়াছিল, তাহারই আকর্ষণে এখন তিনি স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান বিরহিত হইলেন। ভারতের দরিদ্র পতিত নীচ-বর্ণের ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা, একদিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের অন্তর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল, এবং তাহাদের সকল প্রকার ব্যাধি ও যন্ত্রণার একমাত্র ঔষধ,—ভগবৎ ভক্তি জানিয়া, তিনি তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন।

গদাধরের স্ত্রীভাবে থাকিবার অপর একটী উদ্দেশ্য, আমরা তাঁহার কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের জন্য সাধনার কথা চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি। মানুষ যতকিছু সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, দেহসুখের জ্ঞান তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। অজ্ঞান বাল্যকাল অতীত হইয়া যতই বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, দেহসুখাভিলাষ ততই প্রভাব বিস্তার করে। এই দুর্দ্দমণীয় সংস্কার বশীভূত না

থাকিলে সকল শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। সেইজন্য প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীর প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযমের বিধান। গদাধরের স্ত্রীভাব অবলম্বন, তাঁহার অস্খলিত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্যের সাধনস্বরূপ হইয়াছিল।

আমরা গদাধরের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অপর একটী বিশেষত্ব অলোচিত হওয়া আবশ্যক,—ইহা তাঁহার মানব-ভাব। তিনি বাল্যকাল হইতেই কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই সহিত কিরূপ সরল মনে মিশিতে পারিতেন আমরা দেখিয়াছি। বাল্যকালেই তাঁহার সরস রসিকতায় লোকে প্রফুল্লিত হইত; তাঁহার অকপট রঙ্গ পরিহাসে হাস্যের স্রোত বহিত; তাঁহার জিহ্বাগ্রবর্ত্তী সুমিষ্ট কথার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতও মুগ্ধ হইত। স্ত্রীলোকের হাবভাব, চাটুভাষীর তোষামোদ প্রভৃতির অনুকরণে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন গ্রামের সকলেই তাহা জানিত। ক্রীড়া কৌতুকে তিনি কাহারও ন্যূন ছিলেন না। গদাধরকে ছাড়িয়া থাকিতে কাহারও ইচ্ছা হইত না।

আনন্দময়ীর দিব্যদর্শন লাভ করিবার দুই তিন বৎসরের মধ্যে যদিও তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অন্তর ভিন্ন ভাবে গঠিত হইতেছে, তাঁহার রুচি ভিন্ন হইয়াছে, অন্তরের ভাব, ইচ্ছা আশা উদ্দেশ্য সমস্তই ভিন্ন পথে চলিতেছে,—তিনি আর সে গদাধর নাই, কিন্তু বাহিরে তাহার কোনরূপ প্রকাশ লোকে দেখিতে পাইত না। গৃহে রঘুবীরের পূজা করিতে গিয়া যদিও অন্য কর্ম্ম লয়া যাইতেন,—পূজা জপ ধ্যানে অধিক কাল কাটিয়া

যাইত, কিন্তু আবার গৃহকর্ম্মেও তাঁহার কোনরূপ আলস্য ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের মাতৃহীন শিশুপুত্র অক্ষয়কে তিনি সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আহরণ ও অন্যান্য কার্য্য তিনি কখন অবহেলা করিতেন না।

সুতরাং এসময় মনের অন্তঃস্থলে ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও তাঁহার সহজ মানব-ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় স্নেহভক্তি পূর্ণ। তাঁহার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি তুলনা রহিত। জনক জননীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর্‌তাম, সেই জগতের মাই, মা হয়ে এসেছেন,—তাই কারু শ্রাদ্ধ শেষে ইষ্টের পূজা হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে, ততক্ষণ মার খবর নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না তখন অন্য কথা,—তখন ঈশ্বরই সব ভার লন। যে বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্ম কোর্‌বে তার ছাই হবে। বাপ মা কত বড় বস্তু!" (ক)

ভ্রাতৃগণের আনুগত্যে তাঁহার কখন ত্রুটি, ছিল না। সমবয়স্ক-দিগকে,—সকলেই তাহারা দরিদ্র নীচ কুলোদ্ভব—তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। বিবাহ হইবে, শ্বশুরালয়ে যাইবেন, সাধ আহ্লাদ করিবেন, এরূপ অভিলাষও তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। প্রাতবেশী স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে যেরূপ আন্তরিক ভালবাসিত ততোধিক অকৃত্রিম ভালবাসা তিনি প্রত্যর্পণ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে (জাতিতে গন্ধবণিক) কত ভালবাসিতাম। কিন্তু এখানে যখন এলো ছুঁতে পারলাম না। বিষয়ী লোক এখন দেখ্‌লে ভয় হয়। শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে বেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাত দিন এক সঙ্গে থাক্‌তাম, এক সঙ্গে শুয়ে থাক্‌তাম। তখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স। লোকে বল্‌তো,—এদের ভিতর এক জন মেয়ে মানুষ হলে তুজনের বিয়ে হতো। তাদের বাড়ীতে যখন তুজনে খেলতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়্‌ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্কী চড়ে আস্‌তো, বেয়ারাগুলো হিঞ্জোড়া হিঞ্জোড়া বল্‌তে থাক্‌তো।" (ক)

গদাধরের মানব-ভাব তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবকে এরূপ আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাঁহার সাময়িক দেবভাব ও সমাধির অবস্থা, কোনরূপ রোগের উপসর্গ বলিয়া সাধারণ লোকে মনে করিত। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কেহই তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে নাই।

আমরা গদাধরের বাল্যাবস্থার সমালোচনা শেষ করিলাম। এখন আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ সংস্কার লইরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের সহিত যাত্রাগান ভজনাদি শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরানুরাগের বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়; সাধুমুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা, ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও ভক্তিরসাস্বাদ করিয়া তাহার পুষ্টি হইতে থাকে; জপ ধ্যান পূজাদিতে মগ্ন থাকিয়া সেই অনুরাগের বৃদ্ধি সাধন হয়, এবং স্মরণ মনন ও ভগবৎ লীলাভিনয় দ্বারা, ভগবৎ ভাবে তন্ময় করিয়া, তাঁহার অহেতুক ঈশ্বরপ্রেম, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময়ীর দিব্য দর্শন

লাভে অধিকারী করে। এক্ষণে তিনি অনন্যভক্তিবলে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ভগবানকেই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বাল্যভাবের আত্মপরজ্ঞানহীন ভালবাসা, কিরূপ গ্রাম্য পাঠশালা হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল; উচ্চনীচ ভাব তাঁহার হৃদয়ে আদৌ জাগিতে না দিয়া, তাঁহাকে দরিদ্র নীচবর্ণের সহিত একপ্রাণে মিলাইয়াছিল; স্নেহের আকর্ষণে কঠোর আচারনিষ্ঠ কুলে, নীচ শূদ্রকেও ব্রাহ্মণের অগ্রে বসাইয়াছিল; এবং অদ্ভুত সহানুভূতির আবেশে স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান রহিত করিয়া, মানবত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখাইয়াছিল।

আমরা আরও দেখিয়াছি, তাঁহার সৌন্দর্য্য স্পৃহা কিরূপ অসাধারণ! তাঁহার সৌন্দর্য্য দৃষ্টি একদিকে ক্রীড়াপ্রসঙ্গে তাঁহাকে দেবমূর্ত্তি গঠনে সিদ্ধহস্ত ও অপরদিকে তাঁহাকে একাগ্রতা শিখাইয়া ও ধ্যানযোগ পরায়ণ করিয়া,—কঠোর তপস্যারও অপ্রাপ্য, দিব্য সমাধির অধিকারী করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সেই অনন্যযোগ ও অব্যভিচারী ভগবৎভক্তি, তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাতিভজ্ঞান উৎপাদনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার এখন প্রৌঢ় হইয়াছেন, সংসার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত, কিন্তু তাঁহার অর্থোপার্জ্জন সামান্যই ছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে কোন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবার তাঁহার উপায় নাই। বিশেষতঃ তিনি ব্রাহ্মণবৃত্তির অনুরূপ বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতি ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিত। স্বদেশে তাঁহার বিদ্যা ও কৃতিত্বের কোনরূপ সফলতা না দেখিয়া তিনি ইতঃপূর্ব্বে

কলিকাতায় একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি স্বদেশে আসিয়া গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। গদাধর যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর (১২৫৯—৬০)।

কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

গদাধর যখন কলিকাতায় প্রথম আগমন করেন, রামকুমারের চতুষ্পাঠী তখন আহারীটোলা নাথের বাগানে ছিল। নিকটেই পতিতপাবনী গঙ্গা। হিন্দু মাত্রেরই বিশেষতঃ দূর পল্লিগ্রামের হিন্দু সাধারণের গঙ্গাভক্তি অত্যন্ত প্রবল। হিন্দুর বিশ্বাস, গঙ্গায় সজ্ঞানে মৃত্যু মোক্ষ প্রদায়ক। দূর দেশস্থ জনেরা অনেক ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, গঙ্গাজলে মৃত পিতৃগণের অস্থি সমর্পণ করিতে আসিয়া থাকেন। যোগ বিশেষে ও গ্রহণ সময় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কত দূরদেশ হইতে গঙ্গাতীরে কিরূপ অগণন যাত্রী সমাগত হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ হিন্দুর ন্যায় গদাধরেরও অচলা গঙ্গাভক্তি। তিনি প্রত্যহই গঙ্গাস্নানে আসিতেন। গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া কলিকাতার স্ত্রীসমাজে কিরূপ অবিশ্বাস ও ধর্ম্মহীনতা প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি বলিতেন,—

"কেউ হয়তো গঙ্গাস্নান কর্ত্তে এসেছে, সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে,—গল্প কর্ত্তে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প।—তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে?—অমুকের বড় ব্যাম,—অমুক শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে কি না;—অমুক কনে দেখ্‌তে গিছ্‌লো, তা দেওয়া থোওয়া, সাধ আহ্লাদ খুব করবে,—হরিশ আমার বড়

ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না ;—এত দিন আস্‌তে পারিনি মা,—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা পিসী বল্‌ছে,—মা, দুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না,—শ্রীটী গড়া পর্য্যন্ত! বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া হলে, সব আমায় কর্ত্তে হবে মা, তবে হবে। এই ফুল-শয্যার যোগাড়,—খয়েরের বাগানটী পর্য্যন্ত! দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নান কর্ত্তে এসেছে, যত সংসারের কথা! বিশ্বাস নাই অথচ পূজা জপ সন্ধ্যাদি কর্‌ছে তাতে কিছু হয় না।” (ক)

জ্যেষ্ঠভ্রাতার যজমান-গৃহে পূজা করিতে যাইয়া বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের ধর্ম্মহীনতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

“ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে, পূজার নৈবেদ্য, চন্দনঘসা এই সব হচ্ছে,—ঈশ্বরের কথা একটী নাই! কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঞ্জনটী বেশ হয়েছিল,—ও ছেলেটী আমার খুড়তুত ভাই হয়,—হ্যাঁরে তোর সে কর্ম্মটী আছে?—আর আমি কেমন আছি,—আমার হরি নাই! এই সব কথা। দেখ দেখি ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব কথাবার্ত্তা।”

“অনেকে আহ্নিক কর্‌বার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা কর্ত্তে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস,—হুঁ, উঁহুঁ, এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ কর্‌ছে,

তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে,—জপ কর্ত্তে কর্ত্তে হয়তো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়!" (ক)

উত্তম বৈদ্য রোগের লক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন। অন্য লোকে দেখিতে পায় না, কিন্তু বৈদ্যের চক্ষে রোগীর শয়নের ভাব, নিশ্বাসের গতি, অতি সামান্য উপসর্গ মাত্র দেখিয়া রোগটী কি বুঝিতে পারেন। প্রত্যহ গঙ্গার ঘাটে, প্রত্যহ ঠাকুর পূজার সময়, প্রত্যহ ঘরে ঘরে এই অবিশ্বাস ও ধর্ম্ম হীনতার দৃশ্য! আর যে বৈদ্যের চক্ষে রোগের লক্ষণ এরূপ স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, তিনি যে প্রকৃত ভব-রোগ-বৈদ্য তাহাতে সন্দেহ কি?

নাথের বাগান হইতে রামকুমার তাঁহার চতুষ্পাঠী ঝামাপুকুর গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ী স্থানান্তরিত করেন। এখানে অধ্যাপনা ছাড়া অনেক সৎ শূদ্রের গৃহে যাজকতা করিতেন। এই উপলক্ষে গদাধরের, ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ দিগম্বর মিত্র, আঁটপুর নিবাসী রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির বাটীর পরিজনের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে, তাঁহার স্বদেশের সাধারণ লোকের গ্রাম্য সরলতা ও ধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত, এই সকল সংসারী লোকের বিষয়ানুরাগের প্রাবল্য ও ঈশ্বর বিমুখতা, অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সংসারী লোক এত শোক তাপ পায় তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে! ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছু-দিন পরেই সব ভুলে গেল! তবু আবার বছর বছর ছেলে

হবে! সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এরকম লোক, মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার বছর বছর তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। বলে কি কোরবো অদৃষ্টে ছিল! মোকদ্দমা কোরে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদের খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্তে পারে না, আবার বছর বছর ছেলে হয়।"

"সংসারে কিছুই নাই, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা তারপর, রোগ শোক দারিদ্র! আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে হয় ত মূর্খ, গোঁয়ার, মাতাল, গাঁজাখোর, অবাধ্য। বিস্তার সংসার তুচারটা। দেখে বল্লাম,— মা! এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।" (ক)

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কি স্ত্রী, কি পুরুষ অধিকাংশের ভিতর উক্তরূপ অবিশ্বাস ও ধর্ম্মহীনতা দিন দিন প্রবল হইতেছে। ধর্ম্ম এখন কেবল মুখস্থ,—কতকগুলি বাহ্য আচারে আবদ্ধ। ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখন অন্তঃসারশূন্য, লক্ষ্যশূন্য,—করিতে হয় বলিয়া কেবল আচরণ করা হয়। এই ধর্ম্মহীনতার কারণ, ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব। একদিকে আধুনিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মভাব দূরে থাক্, জাতীয়তা পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছে। বাল্যকালে যেরূপ শিক্ষালাভ হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের সংস্কার তদনুরূপ হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অনিষ্টকর ফল নিবারণের জন্য ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষময় ফল লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু ইহা আমাদিগের নিরবচ্ছিন্ন শ্রেয়স্করী হয় নাই। ছাত্রগণ প্রকৃত-পক্ষে প্রচ্ছন্ন বৈদেশিকরূপে পরিণত হইতেছেন। কিছুদিন পরে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে! হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে! ইংরাজী শিক্ষা সমাজের তথাবিধ অনিষ্টপ্রসূ ব[illegible]য়া, ইহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিনির্ম্মুক্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি আমাদের অবশ্য শিক্ষনীয়, অপরিহার্য্য ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের চিরন্তন আচার ব্যবহারের সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে এই অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষা অলক্ষ্যভাবে আমাদের চিরন্তন আচার ব্যবহার-গুলিকে বিকৃত বা তৎস্থলে নূতন আচার ব্যবহার স্থাপিত করিতেছে। আচারের সহিত জাতীয় ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে আমরা সেই জাতীয় ভাব হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িতেছি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বিজাতীয় ভাবের সম্মুখীন হইতেছি। আমরা যতই জাতীয় রীতি নীতি পোষণ করিব ততই জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব।"*

অপর দিকে ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে ঘোর সাংসারিকতা, ধর্ম্ম-হীনতা ও অশান্তি সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইতেছে। এই

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত—'শিক্ষা'।

সাংসারিকতা ও ধর্ম্মহীনতার উচ্ছেদ করিবার কি উপায় আছে? যাঁহাদের হস্তে ধর্ম্ম শিক্ষার ভার সেই গুরু ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কয়জন ভক্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া শিক্ষা দানে সক্ষম? অধ্যাপক ব্রাহ্মণসমাজ শাস্ত্রের কূটার্থের বিচারেই জীবন ক্ষয় করিতেছেন। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবধারণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষায় ও ধর্ম্ম সাধনায় কয়জন অগ্রসর? শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য কিরূপ বিপরীতগামী হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বদেশবৎসল, বিদ্যা ও ধর্ম্মানুরাগী ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া বিচার-মল্লতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্যজ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ অমনোযোগ হইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতা ন্যূন হইয়া যায়। বিদ্যাবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলব্ধি উচ্চতর শক্তি। উহাই বুদ্ধিমত্তার পরিপাক।"*

শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য এখন ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মসাধনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অর্থোপার্জ্জন ও সংসার প্রতিপালনই শাস্ত্রানুশীলনের মূল প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। রামকুমারও এই উদ্দেশ্যে গদাধরকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, গদাধরকে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া সংসার প্রতিপালনে মনোযোগী করেন। গদাধরের মেধা সুতীক্ষ্ণ, সে অধ্যবসায় সহযোগে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার আশা। ন্যায় অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় না দিতে পারিলে অর্থাগমের সুবিধা হয় না। সুতরাং

* সামাজিক প্রবন্ধ।

যাহাতে গদাধর সুপণ্ডিত হন, রামকুমার তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষা-দান করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

রামকুমার গদাধরকে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু গদাধরের হৃদয়ে ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত এ সময় অন্য কোন বিষয়ই স্থান পাইতে ছিল না। নিজের জীবিকা সংস্থান ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য ভগবৎ আনন্দ ত্যাগ করিয়া, ন্যায় কাব্য অলঙ্কার ও স্মৃতির অনুশীলন তাঁহার বিষবৎ বোধ হইল। যে বিদ্যায় প্রেম ও ভক্তির সাহায্য করে না, যে বিদ্যায় বিবেক বৈরাগ্যের স্থান নাই, তাহা কিরূপে শিক্ষা করিবেন? একমাত্র ভগবানেরই দাসত্ব করিতে তাঁহার অন্তর প্রস্তুত, সংসারের দাসত্ব কি করিয়া করিবেন? তিনি বলিয়াছিলেন ;—

> "রাখালকে বল্লাম, ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুন্‌বো, তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরি করিস্ একথা যেন না শুনি।"
>
> "নেপালের একটী মেয়ে এসেছিল। বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গানকল্লে—হরি নাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে, তোমার বিবাহ হয়েছে?—তা বল্লে, আবার কার দাসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি।" (ক)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কামারপুকুরে অবস্থান কালে, একাদশ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তর এক অভিনব আবেগে উদ্বেলিত হইতেছিল। দিব্যদর্শনের পর হইতেই হৃদয়-মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আর একজনকে দেখিতেছিলেন। এখন তাঁহাকেই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। এসময়

তাঁহার প্রাণের আকাঙ্খা নিজের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন,--

"ভগবানের আনন্দলাভ কল্লে সংসার আলুণি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।"

"যারা 'সংসারে ধর্ম্ম 'সংসারে ধর্ম্ম' কর্চ্ছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—কাজের সব আঁট কমে যায়,—ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে, কাজ আর কর্ত্তে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি কোরে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়!"

"চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপূর, তবু সে জল খাবে না! ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে,—বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর।" ক)

সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন তাঁহাকে নিবারণ করিল। গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন,—"চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে পারিব না।" বিদ্যা শিক্ষার দ্বার এই খানেই তাঁহার জীবনে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইল।

পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার অবজ্ঞা

বা রূঢ়তার পরিচয় নয়। ইহা তাঁহার অনন্য ভগবৎভক্তির নিদর্শন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই; গোপীরা কৃষ্ণের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই; প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই; বলি ভগবানের প্রীতির জন্য শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই; বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের কথা শুনে নাই। তবে ঈশ্বরের পথে যেওনা একথা ছাড়া সব কথা শুন্‌বি।" (ক)

অবিদ্যার সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত বদ্ধজীবের যন্ত্রণা ও অশান্তি দেখিয়া, গদাধরেব সংসার বিরাগ যেমন বৃদ্ধি হইতেছিল, তাঁহার ভগবৎ প্রেম স্ফুটতর হইয়া,—তিনি যে ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্র-মাত্র, এই অনুভব তাঁহার বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাদের অহঙ্কার (অহং জ্ঞান) থাকে না; তারা জানে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা। তাদের ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা, যে-কর্ম্ম তারা করে সেই কর্ম্মই সৎকর্ম্ম, কিন্তু তারা জানে ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই,—আমি ঈশ্বরের দাস, আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী,—তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।" (ক)

ভগবান যাহা করাইবেন তাহাই করিব এই প্রকার ভাব

এসময় তাহার অন্তরে জাগিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের এই বিশেষ ভাবটী লক্ষ্য না করিলে তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ কার্য্যগুলির অর্থ আমরা বুঝিতে পারিব না। যে তীব্র বৈরাগ্যের তুমুল ঝড় তাঁহার জীবনে আট বৎসরকাল ব্যাপিয়া শীঘ্রই প্রবাহিত হইবে, তাহার সূচনা হইয়াছে। যে উৎকট সাধন যাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিস্ময়ে মগ্ন হয়, যে মহা সাধনযজ্ঞে তিনি নিজ দেহ মন অন্তরাত্মা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন, তাহার অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত। বাল্য ক্রীড়ায় তাঁহার ভক্তি, ধ্যান, জ্ঞান-দীক্ষা শেষ হইয়াছে। তাঁহার অন্তর্যামী এখন কি কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া দুই বৎসর যাবৎ জ্যেষ্ঠের নিকট অবস্থান করিয়া যজমান গৃহে পূজা ভিন্ন গদাধরের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা শুনা যায় না। ইহার পর আমরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেখিতে পাই। কলিকাতা জানবাজারের প্রসিদ্ধ মাড়বংশীয় রাজচন্দ্র দাসের পত্নী, স্বনাম ধন্যা রাণী রাসমণি, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে বিস্তর অর্থব্যয়ে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। গঙ্গাতীরে ৫৫ বিঘা জমির উপর মন্দির ও তৎসংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান এবং অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে রাণীর দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

গঙ্গা হইতে মন্দিরে যাইতে হইলে, বাঁধাঘাট দিয়া উঠিয়া--- চাঁদনী। চাঁদনীর দুই পার্শ্বে ছয়টী করিয়া দ্বাদশ শিবের মন্দির।

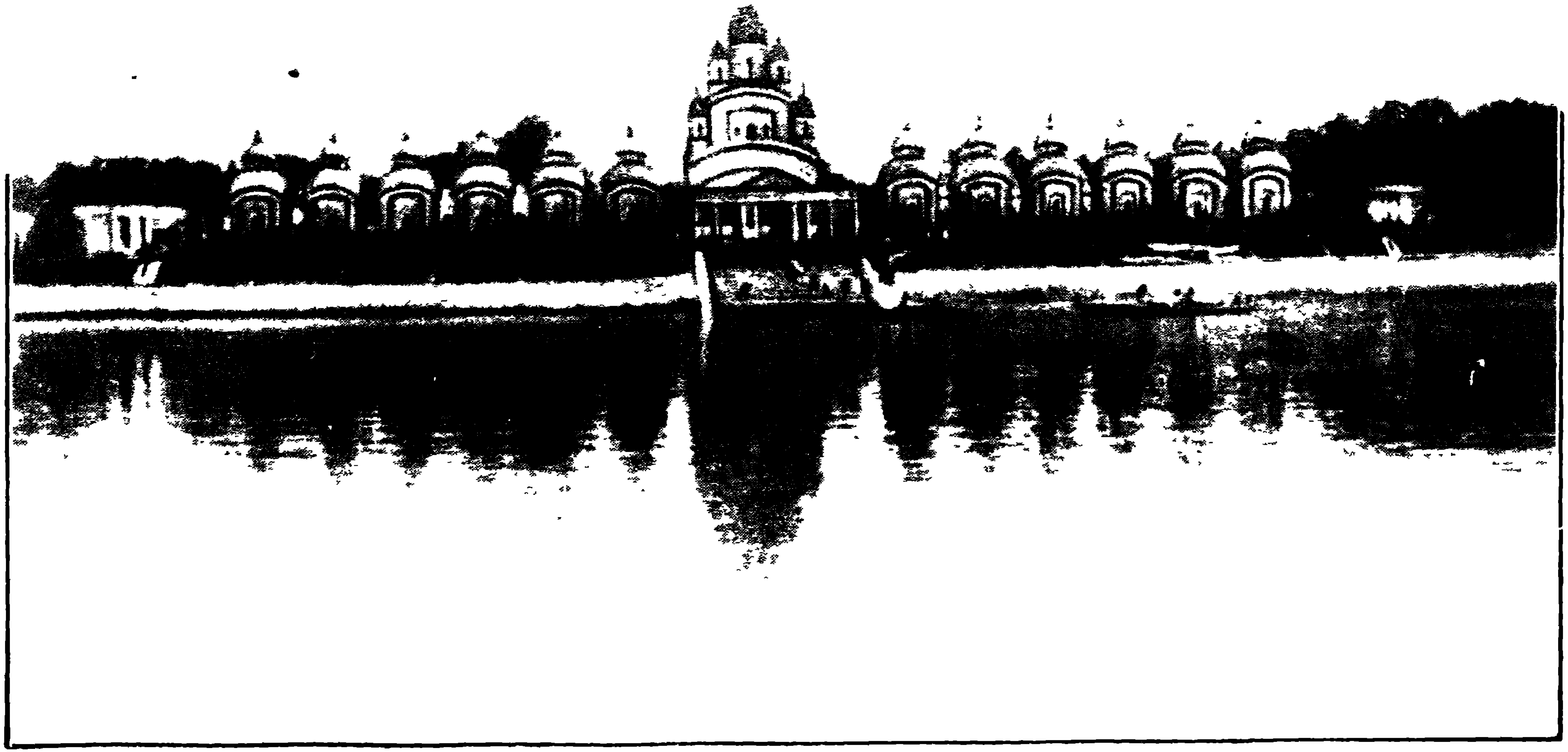

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী।

গঙ্গার উপর সুদূর বিস্তৃত পোস্তা ও তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটী নহবৎ খানা। চাঁদনীর মধ্য দিয়া যাইয়া টালি আচ্ছাদিত দীর্ঘ উঠানে পড়িতে হয়। উঠানের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে নবচূড়া-বিশিষ্ট কালীমন্দির, মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির ও উত্তরে রাধা-কান্তের মন্দির,—দুইটীই সাত ফোকর দালানের আকারে নির্ম্মিত। মন্দিরশ্রেণীর পশ্চাতে একতালা গৃহ,—নৈবেদ্যের ঘর, ভোগঘর, ভাণ্ডার, রান্নাঘর ও অতিথিশালা। বড় উঠানের দক্ষিণে ও উত্তরে ঐরূপ একতালা ঘর,—মন্দিরের কর্ম্মচারী ও পূজারীদিগের থাকিবার স্থান। নবরত্ন মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালী মাতার কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। রৌপ্য নির্ম্মিত সহস্রদল পদ্ম ও তদুপরি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত মহাদেবের উপর, নানা স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া ৺কালীপ্রতিমা দক্ষিণাস্যায় দণ্ডায়মানা। মন্দিরের তলদেশ শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে আচ্ছাদিত। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ সিংহাসনের উপর পশ্চিম মুখে বিরাজিত। উভয় মন্দিরে অন্নভোগের ব্যবস্থা, এবং সদাব্রতে পূজারী ও মন্দিরের কর্ম্মচারী ব্যতীত, কাঙ্গালী অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীগণের, ৺কালী ও রাধা কৃষ্ণের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত আছে।

রাণী রাসমণি ১২৬২ সালে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নান যাত্রার শুভদিনে, দক্ষিণেশ্বরে নব নির্ম্মিত দেবালয়ে মহাসমারোহে দেবদেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। নানাস্থান হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া মহোৎসবে উপস্থিত হন এবং যথোপযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামকুমারও বিদায়ের পত্র প্রাপ্ত

হন এবং গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন কালী বাড়ীতে আগমন করেন। রামকুমারের দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনা যায়। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় বলেন যে, রাণী রাসমণি স্বপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবীকে অন্নভোগ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে অন্নভোগ দিবার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদান করিতে কোন অধ্যাপক পণ্ডিত সম্মত হন নাই। রামকুমারই কেবল ব্যবস্থা প্রদান করেন যে, কোন ব্রাহ্মণের নামে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিলে অন্নভোগে দোষ হইবে না। রাণী এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর পূর্ব্বক, স্বীয় গুরুর নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজসঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। রামকুমার স্বকীয় প্রদত্ত ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্রতী হইয়া উৎসবে গমন করেন এবং দেবীর পূজায় কোন সদ্ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতে সম্মত না হওয়াতে, রাণীর বিশেষ অনুরোধে ৺কালী মাতার পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় অন্যরূপ বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে,—রামকুমারের স্বদেশের পরিচিত কোন ব্যক্তি রাণীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই রামকুমারকে প্রতিষ্ঠার দিবস বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করেন। কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণীর দান গ্রহণ করিলে, পাছে সমাজে নিন্দিত হইতে হয় মনে করিয়া রামকুমার প্রথমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বশ্রেণীর অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত এবং

তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি পত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন কালীবাড়ীতে উপস্থিত হয়েন। রামকুমার মন্দিরে আসিয়া দেশস্থ কোন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা ও পূজা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। তিনিও সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্রতী হন এবং পরে ৺কালীমাতার নিত্য পূজক হইতে কোন আপত্তি করেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ অধিক সম্ভব বলিয়া আমাদের অনুমান। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আত্মবৎ-সেবা মত অবলম্বন করিয়া শূদ্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্নভোগ দিতে কোনরূপ আপত্তি করেন না, এবং স্মার্ত্ত অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ হইলে শূদ্র দেবালয়ে অন্নভোগের ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং রামকুমারের পূর্ব্বে এরূপ ব্যবস্থা অপর কেহ প্রদান করেন নাই একথা প্রকৃত নহে, এবং রাণী যে অন্য কোন প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবল রামকুমারের ব্যবস্থা বলে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

তবে মনে হইতে পারে, রামকুমার কৈবর্ত্তের দেবালয়ে দেবল-ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র ও সমাজগর্হিত কার্য্যে কেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন? ইহা যে তাঁহাকে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া করিতে হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়। রামকুমার সংসার প্রতিপালনের নিমিত্ত অর্থাগমের কোনরূপ সুবিধা করিতে দিন দিন অক্ষম হইতেছিলেন। উপার্জ্জনের সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিফল

মনোরথ হন। অশূদ্রযাজী আচার পরায়ণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শূদ্রের যাজকতা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ও কোনরূপ সুবিধা হইল না। অদৃষ্ট তাঁহার সম্পূর্ণ বিরোধী। দারিদ্রদুঃখ নিবারণের জন্য তাঁহার ভাগ্যে দেবলব্রাহ্মণের বৃত্তি বিধাতা কি অবশেষে লিখিয়াছেন? রামকুমার অন্য কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। চিরজীবন জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া রামকুমার যে আপনার ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। স্বধর্মনিষ্ঠ পরমভক্ত রামকুমার রঘুবীরের ইচ্ছা বুঝিয়াই কৈবর্ত্তের দেবালয়ে পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। অথবা, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার জগৎ হিতার্থ মহাকার্য্য সাধনের পূর্ব্বানুষ্ঠান!

যাহা হউক, গদাধর ভ্রাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া প্রতিষ্ঠার মহামহোৎসব দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চারিদিকে অগণন লোক সমাগম, স্থানে স্থানে যাত্রাগান কীর্ত্তন ও কথকতা এবং রাত্রে মন্দির, প্রাঙ্গণ ও উপবন নানাবিধ আলোক মালায় সুসজ্জিত দেখিয়া গদাধর বলিয়াছিলেন,—"রাণী যেন রজত গিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়াছেন।" উৎসব সন্দর্শনের পর অপরাহ্ণ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া গদাধর সেদিন একাকী কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। শুনা যায় উৎসব ক্ষেত্রে কোনরূপ আহার গ্রহণ না করিয়া, ক্ষুৎপিপাসা শান্তির নিমিত্ত নিকটস্থ কোন মুদির দোকানে এক পয়সার মুড়কী কিনিয়া খাইয়াছিলেন। রাত্রে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতার বাসায় ফিরিলেন না দেখিয়া, পরদিন প্রত্যুষে সংবাদ লইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে

পুনরাগমন করেন এবং ভ্রাতাকে শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন যে, রামকুমার শ্রীশ্রীভবতারিণীর নিত্যপূজকের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন গদাধর বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থিতির কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রাতা তাঁহার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করেন জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, গদাধর কিছুদিন কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অবশেষে, রামকুমার কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি ভ্রাতার আদেশমত কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে সম্মত হন। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার কতদিন পরে কালীবাড়ী তাঁহার নিবাসগৃহ হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বিশেষ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে অবশেষে যে দেবল-ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অতি হীনবৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। স্মৃতিতে আছে,—"চিকিৎসক, প্রতিমাপরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী এবং নিন্দিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।'* মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে,—"দেবল, নক্ষত্র যাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য।" দেবল ব্রাহ্মণ নিন্দিত হইবার কারণ এই যে, বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজা

* মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় ১৫২।

করিতে করিতে পূজক শ্রদ্ধাভক্তিহীন হয়,—ভগবানের পূজা ব্যবসায়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বেতন স্বরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া, বিদ্যাদান ও ধর্ম্মদান করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য ঘটে। শুনা যায়, দরিদ্রতা নিবন্ধন এইরূপ অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে হইল মনে করিয়া, গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার ও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এ সমস্তই মার ইচ্ছা! মা, তাঁহাদিগকে যেরূপ করাইতেছেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে। মা, যন্ত্রী—তিনি মার যন্ত্রস্বরূপ,—ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। বালকের ন্যায় মাকে কাঁদিয়া বলিলেন,—"মা! শেষে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়ালি?" যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইবার মহাপরীক্ষা উপস্থিত দেখিয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন,—হে পিতঃ! যদি সম্ভব হয়, এ দারুণ পরীক্ষা হইতে আমাকে রক্ষা কর, কিন্তু আমার নয় প্রভু! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" গদাধরও কাতর-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"বেতনভোগী হইয়া, মা! তোমার পূজা করিতে হইল! তুমি ইচ্ছাময়ী! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" ইহাই গদাধরের মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতের অর্থ! স্বামী বিবেকানন্দ, 'মদীয় আচার্য্যদেব' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ বিধান দেখা যায় যে, বিদ্যাদানের ন্যায়,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অধিকতর সত্য, দেবল ব্রাহ্মণ দেবপূজায় বেতন গ্রহণ করিয়া পবিত্র বস্তুকে ব্যবসায়ে পরিণত করে। সুতরাং ইহা অনুভব করা যায় যে, এই বালক দরিদ্রতা নিবন্ধন যখন দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি গ্রহণ করিবার নাই দেখিল, তখন তাহার অন্তর কিরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল!"

কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

গদাধর কালীবাড়ীতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইল। তিনি মন্দিরে প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে এরূপ নিষ্ঠা, অনুদারতা ও কুসংস্কার সম্ভূত বলিয়া কেহ দোষারোপ করিতে পারেন; কেহ বা এরূপ কার্য্যে—দেবীপ্রসাদ অগ্রাহ্য করাতে, তাঁহার ভক্তিহীনতা দর্শন করেন। উভয় কল্পনাই তাঁহার প্রকৃত ভাব হইতে দূরে অবস্থিত। তাঁহার আহার সম্বন্ধে আচরণ যাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তিনি অপরের উদ্দেশ্যে আনিত আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। ইচ্ছা করিয়া যে এরূপ করিতেন তাহা নহে, ইহা স্বতঃই তাঁহাতে দেখা যাইত। মন্দিরের নিবেদিত ভোগরাগাদি, পূজারী, মন্দিরের কর্ম্মচারী ও ভিক্ষুক অতিথির জন্যই নির্দ্দিষ্ট। তিনি এখনও মন্দিরের পূজক বা কর্ম্মচারী নহেন, আর কাঙ্গালী অতিথির অন্ন গ্রহণ করিয়া কেন তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন? সুতরাং মন্দিরে নিবেদিত ভোগ আহার করিতে, স্বতঃই তাঁহার অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। যেদিন হইতে তিনি মন্দিরের পূজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সেইদিন হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না। সেইজন্য শুনা যায় যে, রামকুমার তাঁহাকে শিধা লইয়া স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই, রামকুমার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর মন্দিরে স্বতন্ত্র পূজক নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরে গদাধর কালীবাড়ীতে আসিয়া

অবস্থান করিলেন। গদাধর মন্দিরের পূজাদি সকল কার্য্যেই দর্শকভাবে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ সময় তাঁহার মনে একদিকে বিষয় বিরাগ, অপর দিকে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ, সর্ব্বোপরি তাঁহার অন্তর্যামিনীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ,—তাঁহার ইঙ্গিত ভিন্ন কোন দিকেই কোন স্থিরতর উদ্দেশ্যে তাঁহার মন পরিচালিত হইতেছিল না। এই ভাবে কতদিন তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। এইমাত্র শুনা যায় যে, রাণী রাসমণির জামাতা মথুরা নাথ বিশ্বাস, এ সময় রাণীর প্রধান পরামর্শ দাতা ও তাঁহার অতুল সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহকরূপে, দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। মন্দিরের সমস্ত কার্য্যে তিনিই একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা। দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদাই আসিতেন এবং কুঠিতে (বৈঠকখানা বাড়ী) অবস্থান করিয়া সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। গদাধর রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানিতে পারিয়া মথুরবাবুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং ঘটনাক্রমে গদাধরের প্রস্তুত সুন্দর শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ও মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গদাধরের পূজাকার্য্যে অনভিমত বুঝিতে পারিয়া, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইলে পর, মন্দিরে কোন দৈব দুর্ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময় গদাধর তাহার প্রতিকার করাতে রাণী কর্ত্তৃক সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া মন্দিরের কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ঘটনাটী এইরূপ হইয়াছিল,—এক বৎসর জন্মাষ্টমী-ব্রত ও পূজাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর

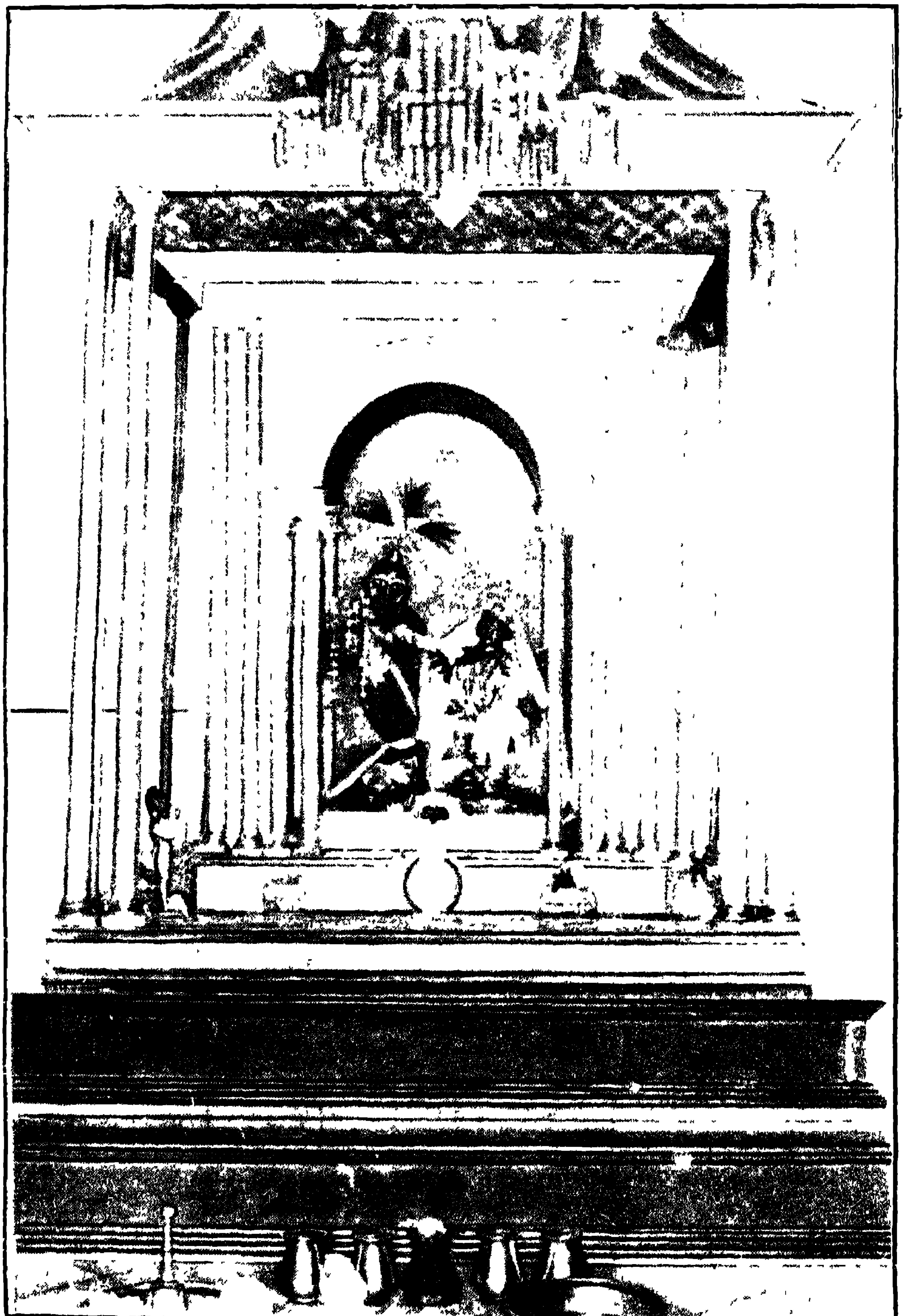

শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজী

পূজক শ্রীবিগ্রহকে শয়ন দিবার জন্য লইয়া যাইবার সময় অসাবধানে পড়িয়া যান এবং শ্রীমূর্ত্তি হস্তচ্যুত হওয়াতে একটী পদ ভগ্ন হয়। ভগ্ন ও অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হইতে পারে না; কারণ শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, পদ্ধতিকারগণের মতে, স্ফুটিত, খণ্ডিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থান-চ্যুত, যাগহীন, পশুস্পৃষ্ট, দুষ্টভূমিতে পতিত, ভিন্ন মন্ত্রে অর্চ্চিত, আর পতিতের স্পর্শদূষিত, এই দশ প্রকার দোষদুষ্ট বিগ্রহের পূজা নিষিদ্ধ। সুতরাং নূতন বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত, পূজা কার্য্য বন্ধ হইবে দেখিয়া এবং তজ্জনিত অমঙ্গল আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত, গদাধর বিগ্রহের ভগ্নপদ এরূপ সুকৌশলে জুড়িয়া দিলেন যে, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াও ভগ্ন বিগ্রহ বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না এবং নিত্য পূজারও কোন বাধা রহিল না। গদাধরের কার্য্যনিপুণতায় এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বলিয়া, রাণী কৃতজ্ঞ ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গদাধরকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর নিত্যপূজাকার্য্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন। গদাধরও সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পূজায় ব্রতী হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ অনুমান করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার বৎসরই অর্থাৎ ১২৬২ সালের ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী দিবসে এই ঘটনা হইয়াছিল এবং গদাধর এই সময় হইতে মন্দিরে পূজক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অপর একটী বিবরণ এইরূপ শুনা যায় যে, গদাধর মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার কৈবর্ত্তের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা শ্রবণ করেন। পরে, কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া

গদাধর সিওড় গ্রামে, ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। সিওড় গ্রামের নিকট গদাধরের ভবিষ্যৎ পত্নী সারদাদেবীর মাতুলালয়। তিনি তাঁহার জননীর সহিত সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সারদাদেবীর তখন তিন বৎসর মাত্র বয়স। একদিন গ্রামের কোন পল্লিতে বিশেষ কীর্ত্তনাদি উপলক্ষে অনেক লোক সমাগম হয়। জননী কন্যাকে লইয়া গান শুনিতে আগমন করেন। গদাধরও হৃদয়ের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেহ কৌতুক করিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতগুলি পুরুষের ভিতর কাকে বিয়ে করবে ?" বালিকা হাত তুলিয়া গদাধরকে দেখাইয়া দিল। কথাগুলি কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু গদাধর যে, কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পর কিছুকাল স্বদেশে অতিবাহিত করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় তিন বৎসর হইল তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিদ্যাশিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। পূর্ব্বের ব্যবস্থা সকল সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া, এক্ষণে অবস্থার বৈগুণ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তিনি এখন কি করিবেন কিছুই স্থিরতা নাই। সুতরাং এইরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায়, তাঁহার মনে একবার স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা হইবে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

কেহ বিবেচনা করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে, ১২৬৩ সালের জন্মাষ্টমীর সময় হইতেই গদাধর মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। শ্রীম, 'কথামৃতে' লিখিয়াছেন,—"ঠাকুর রামকৃষ্ণের

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়ীর প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে।" (ক)

সুতরাং শ্রীমর মতে গদাধরের পূজক পদ গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম-বৎসর ১২৪২ সাল গ্রহণ করিলে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় ১২৬৩ সালই স্থির হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশ গমনের কিংবদন্তী সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনা সকলের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। বিশেষতঃ তাঁহার সাধনার সময় নির্দ্ধারণ ও কোন্ সময় কি সাধন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা, একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে আমরা তাঁহার মহাসাধনার দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সাধনা এক অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার! ইহার প্রত্যেক পদে মহাশক্তির খেলা! অল্পবুদ্ধি মানবের দেহ মনের কার্য্য ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সে যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, যাহা তাহার বিচার বুদ্ধির মধ্যে আইসে না, সে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না। গদাধরের অমানুষী সাধনায় অনেক অলৌকিক ব্যাপারের সংশ্রব আছে বলিয়া, অবিশ্বাসের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা সেইজন্য, শ্রীম লিখিত 'কথামৃত' হইতে, তাঁহার নিজ মুখের কথা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সাধন-কাণ্ড যতদূর সম্ভব পূর্ব্বাপর বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

পুরাণমতে সাধন

গদাধর শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজক হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতেন—"সে সময় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ।" কিন্তু যে পূজাদি কর্ম্ম এখন তিনি করিতেছিলেন তাহাকে বৈধকর্ম্ম বা বৈধীভক্তি বলে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কিন্তু ভক্তি অমনি কল্লেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটী নাম রাগভক্তি। প্রেম অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।"

"আর এক রকম ভক্তি আছে তার নাম বৈধীভক্তি। এত জপ কর্ত্তে হবে, এত ধ্যান কর্ত্তে হবে, উপোস্ কর্ত্তে হবে, এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্ত্তে হবে, তীর্থ যেতে হবে, এত উপচারে পূজা কর্ত্তে হবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্ত্তে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক কর্ত্তে কর্ত্তে তবে ক্রমে রাগভক্তি আসে। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি, যেমন হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্যে পাখার দরকার।

ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আস্‌বে বলে তাই জপ্ তপ্ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, তা হলে পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। যদি ঈশ্বরের উপর অনুরাগ প্রেম আপনি আসে, তা হলে জপ্ তপ্ কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী-কর্ম্ম কে কর্‌বে?" (ক)

শ্রীমদ্ভাগবতে পূজাদি বৈধকর্ম্ম কিরূপে করিতে হয় তাহা লিখিত আছে—

"যে ব্যক্তি শীঘ্র আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করে, তন্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা কেশবের পরিচর্য্যা তাহার কর্ত্তব্য। আচার্য্যের অনুগ্রহলাভ আর তাঁহার নিকট আগমার্থ জানিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষ অর্চ্চনা করিতে হয়। শুচি দেহে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা নিজ দেহ শোধন এবং ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষাবিধান পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনার পূর্ব্বে যথালব্ধ উপচার, পূজার দ্রব্য, ভূমি, নিজ আত্মা ও শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনা যোগ্য করিয়া, স্বীয় আসনে জল প্রোক্ষণ, পাদ্যাদি কল্পনা পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন, এবং সমাহিত চিত্তে অঙ্গন্যাসাদি সহকারে মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়। অঙ্গ উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত বিগ্রহকে পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ মাল্য দূর্ব্বা পুষ্প ধূপ দীপ ও নানা উপহার, মূলমন্ত্র দ্বারা প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া, বিধিবৎ স্তবপাঠ ও হরিকে নমস্কার করিবে। আপনাকে তন্ময়রূপে ধ্যান করিয়া হরির শ্রীমূর্ত্তির পূজা, মস্তকে হরির নির্ম্মাল্য

ধারণ এবং দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে।" *

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিজ ইষ্টমূর্ত্তিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রচিত্ত ও তন্ময় হইয়া পূজা জপ স্তবপাঠ, নামগুণকীর্ত্তন এই সকল বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, ভগবানে প্রেমাভক্তির উদয় হয় ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। বৈধ পূজাদি-কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিবার জন্য শাস্ত্রের বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—

> "সংসারী লোকের পূজা জপ্ তপ্ দানাদিকর্ম্ম প্রায় সকাম হয়ে থাকে। সে ভাল নয়। যে কর্ম্মে কামনা আছে সে কর্ম্ম কল্লেই ফল পেতে হবে। একটু ও আসক্তি থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁস থাক্‌লে ছুঁচের ভিতর যাবে না।" (ক)

যাহারা কামনাপর হইয়া স্বর্গাদি লাভ করিবার জন্য পূজা-যাগাদি কর্ম্ম করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাদের অবস্থা বলিতেছেন,—

"ত্রয়ীবেদবিদ্ মানব সোমপানের দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত এবং নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া স্বর্গগমনে অভিলাষ করিয়া থাকে। তাহারা পুণ্যফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং দেবগণের ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে। কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে সেই বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই মর্ত্তলোকে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রকারে কাম্যকর্ম্ম আশ্রয় করিয়া

* শ্রীমদ্ভাগবত, একাদশস্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ৪৮-৫৫ শ্লোক।

সেই কামকামীগণ এই সংসারে ক্রমাগত গতায়াত করিতে থাকে।" *

শ্রীভগবান্ সেইজন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বার বার বলিতেছেন,—

"ভগবানের প্রীতির জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে অন্য কর্ম্ম আচরণ করিলেই সেই কামনাপর পুরুষের কর্ম্ম, বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মফল লাভের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।" †

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—

"ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, নিষ্কাম হয়ে পূজা জপ্ তপ্ অনেক কর্ত্তে কর্ত্তে ক্রমে ভগবানের প্রতি অনুরাগ হয়। এই অনুরাগ বা রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল-আনা মন হবে তবে তাঁকে পাবে। যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি, কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি। ভক্তির দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর

* গীতা, নবম অধ্যায়, ২০-২১ শ্লোক।

† গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৯ শ্লোক।

ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—' দয়া থাকে। আমার জিনিষ আমার জিনিষ বলে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। সব্বাইকে ভালবাসার নাম দয়া। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়—একটি কর্ম্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কিন্তু কল্‌কাতায় কর্ম্মভূমি—বাসা করে থাক্‌তে হয়, কর্ম্ম কর্‌বার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে, সংসারাসক্তি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে। বিষয়বুদ্ধির লেশ মাত্র থাক্‌লে দর্শন হয় না। দেশ্‌লায়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো কোন রকমেই জ্বল্‌বে না—কেবল একরাশ কাঠী লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশ্‌লাই।" (ক)

ভগবানের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইলে, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। ভক্তির বৈরাগ্য সহজ বৈরাগ্য, এ বৈরাগ্যে জোর করিয়া কিছু ত্যাগ করিতে হয় না। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার, ভক্ত কিছুই পরিত্যাগ করেন না। পূর্ব্বে বিষয়ের প্রতি যে ভালবাসা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে সরিয়া যাইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়। কাম ক্রোধাদি রিপু-সকল ও ভগবান লাভের সহায় হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি মন হইতে সম্পূর্ণ ত্যাগ হইলে, ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরানুরাগে পূর্ণ হইয়া যায়। "এই অনুরাগ এই প্রেম এই পাকাভক্তি এই ভালবাসা

যদি একবার হয়, তা হলে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।”

ভক্তের অনুরাগের পাত্র সগুণ-ঈশ্বর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সগুণ-ঈশ্বরের স্বরূপ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

“আমার জড় ও জীবরূপা দুইটী প্রকৃতি সকল ভূতের উৎপত্তির হেতু। এইজন্য সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর আমি, এই দুই প্রকৃতিকে দ্বারস্বরূপ করিয়া সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হই। আমিই ঈশ্বর, আমা হইতে অন্য কোন কারণান্তর নাই। হে ধনঞ্জয়! ঈশ্বর, আমাতে এই পরিদৃশ্যমান সকল বিশ্ব, সূত্রে মনিগণ যেমন গাঁথা সেইরূপ গাঁথা রহিয়াছে।” *

জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর কি আকারে বিরাজ করিতেছেন, শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন,—

“আমার যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত মূর্ত্তি, তাহার দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে, আমি কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন, সেইজন্য সেই সকল বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করি না।” †

প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারী অব্যক্ত মূর্ত্তি ব্যতীত, নরদেহে আবির্ভূত অপর এক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তমূর্ত্তি আছে। সাধারণ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন,—

“সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ জীবসমূহের ঈশ্বর আমি, মনুষ্য দেহ আশ্রয়

* গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ৬-৭ শ্লোক

† গীতা, নবম অধ্যায়, ৪ শ্লোক।

করিয়াছি বলিয়া, আমার পরমতত্ত্ব না বুঝিয়া মূঢ় মানব আমায় অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি, প্রাপ্ত হইয়া অনন্যমনে আমাকে—ভূতগণের আদি ও অব্যয় জানিয়া ভজনা করেন। সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তন এবং যত্নপর ও দৃঢ়ব্রত হইয়া সেই নিত্যযুক্ত ভক্তগণ, নমস্কার পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। অন্য ভক্তগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, ব্রহ্মা বিষ্ণু বা আদিত্যাদি নানা দেবতারূপে অবস্থিত বা বহুভাবে বিশ্বরূপে বিরাজিত আমাকে পূজা করিয়া উপাসনা করেন।" *

ঈশ্বর কি কারণে ও কখন নরদেহ আশ্রয় করেন, তাহাই বলিতেছেন,—

"যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের উদ্ভব হয়, হে ভারত! তখনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা পাপকারীগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সম্যক্ প্রকারে স্থাপন করিবার জন্য, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" †

যিনি সগুণ-ঈশ্বর, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও অব্যক্ত-মূর্ত্তি, যিনি নানা দেবদেবীরূপে ও বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই লোককল্যাণের নিমিত্ত নরদেহে অবতীর্ণ হন,— পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব ইহাই প্রতিপাদন করে।

ভক্তের ভগবান্ কি স্বরূপ? শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"ভক্তের ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্।

---

* গীতা, নবম অধ্যায়, ১১।১৩।১৪।১৫ শ্লোক।

† গীতা, চতুর্থ অধ্যায়, ৭-৮ শ্লোক।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সগুণ, —একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দ্যাখা দ্যান। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ হয়, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্ত শক্তি।"

"পুরাণমতে ভক্ত একটী, ভগবান্ একটী; আমি একটী, তুমি একটী; শরীর সরা, এই শরীর মধ্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ জল রয়েছে। ব্রহ্ম সূর্য্য স্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। (এই প্রতিবিম্ব সূর্য্যই সগুণ ব্রহ্ম।) ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান কচ্চি এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্ছো এ জ্ঞান ও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি মা আমি ছেলে, এ ভেদবোধ থাক্‌বে। এই ভেদবোধ—আমি একটী, তুমি একটী, এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্চেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদবোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ ততক্ষণ শক্তি (সগুণ-ব্রহ্ম) মান্‌তে হবে। তাই যতক্ষণ—'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই; ততক্ষণ সগুণ-ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎ ও সত্য, ঈশ্বরের নামরূপ ও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধ ও সত্য।"

"বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণ ও বলেছে নির্গুণ ও বলেছে। কি রকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেম্‌নি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকারমূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে, কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দ্যাখা দ্যান। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল তেম্‌নি জল। অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে,—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার। আমাদের সাম্‌নে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে আবার তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলেছে। তবে বল্‌তে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে। নিত্য কৃষ্ণ, তাঁর নিত্য ভক্ত। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম। হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের ও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।" (ক)

সেই অখণ্ডসচ্চিদানন্দ নররূপে অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

"মানুষ দেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্ব ভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি

রকম জ্ঞান? গরুর যেখানটা ছোঁবে গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে, শিংটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর অনন্ত বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা কল্লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু প্রেমভক্তি মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হন, এটী উপমা দ্বারা বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। তাঁর অবতারকে দেখলে তাঁকে দেখা হয়।"

"নরলীলায় অবতার হন। নরলীলা কিরূপ জ্ঞান? যেমন বড় ছাদের জল, নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটী প্রণালী দিয়ে— নলের ভিতর দিয়ে আসছে। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দ্যান। মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দ্যান। অন্ন দানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আর ও বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন।"

"অবতার যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ সেইখানেই অবতার। তিনিতো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর

তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণ ভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।”

“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখ্‌লে পরে, তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্‌তে পার্ব্বে, তবেই ভাই ভগিনী, বাপ মা, সন্তানের মত ঈশ্বরকে স্নেহ কর্ত্তে পার্ব্বে! তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটী হয়ে লীলা কর্ত্তে আসেন। যেমন ঠিক সূর্য্যো-দয়ের সময়ে সূর্য্য, সে সূর্য্যকে অনায়াসে দেখ্‌তে পারা যায়,—চক্ষু ঝল্‌সে যায় না, বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।”

“অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ মানুষে খুঁজ্‌বে। তিনিই সব হয়ে-ছেন, তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখ্‌বে ঊর্জ্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ছে, ঈশ্বরের জন্য পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।” (ক)

এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে অবতারের ভিতর দিয়া লাভ করাই পুরাণমতে সাধনার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

“ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য সাধন চাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিষ থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল,

কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জন্য ব্যাকুল না হলে কিছু হবে না। খুব ব্যাকুল হতে হয়। সাধনের খুব দরকার। ফস্ করে কি ঈশ্বর দর্শন হয়?"

"একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে ঈশ্বর লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তভাব নিয়ে ছিলেন। তাঁদের অন্য কিছু ভোগ কর্‌বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা। সে জানে আমার স্বামী কন্দর্প।"

"হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীর ও দাস ভাব থাকে, স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদার ও ছিল।"

"শ্রীদাম, সুদাম ব্রজের রাখালদের সখ্যভাব। যেমন বন্ধুর ভাব—এস এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল এনে খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়্‌ছে।"

"যশোদার বাৎসল্যভাব—ঈশ্বরে সন্তান বুদ্ধি। স্ত্রীরও কতকটা থাকে—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটী পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবেন বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।"

"শ্রীমতীর মধুর ভাব। স্ত্রীর ও মধুর ভাব—এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। রামাবতারে শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য কথ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সব ছিল—আবার মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব,

—পরকীয়া রতি। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব। তাঁরই লীলা, যখন যে ভাব।”

“তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম পুরাণমতের, তারপর তন্ত্রমতের, আবার বেদমতের।” (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে—তিনি ‘বিষ্ণুঘর’ বলিতেন,—পূজা বেশী দিন করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পূজা করিয়াই তাঁহার অন্তর ঈশ্বরানুরাগে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিত্যপূজা শেষ হইলে তিনি শ্রীবিগ্রহের নিকট বিষণ্ণমনে বসিয়া থাকেন। কখন ‘কালী ঘরে’ গিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিমার সম্মুখে ক্রন্দন করেন, কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। বৈধকর্ম্ম নিয়মিত সম্পন্ন করিতে তিনি ক্রমে অক্ষম হইতে লাগিলেন। সংসার পালনের চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, সকল বিষয়েই আস্থা শূন্য। ক্রমশঃ, সংসারবিরাগ তাঁহার প্রবলতর হইতে লাগিল। সংসারীজীবের অশেষ যন্ত্রণা ও দারুণ অশান্তি তিনি অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন; তিনি দেখিতেছিলেন, কিরূপ অনিত্য দেহসুখের প্রত্যাশায় বদ্ধজীব কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হইয়া সংসার দাবানলে নিশিদিন জ্বলিতেছে। সংসারের ক্ষণিক আনন্দের প্রলোভন তিনি অন্তর হইতে দূর করিয়া দিলেন। সংসারী লোকের সংসর্গ, তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলিতেন,—“সংসারী লোক দেখ্‌লেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম।”

সম্ভবতঃ এই সময়,—১২৬৩ সালের মধ্যভাগে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পরলোকগত হন। দরিদ্র সংসারের অর্থাভাব দূর করিবার

জন্য রামকুমার মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোযোগ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সংসারের কোন কর্ত্তব্যই তাঁহাকে ঈশ্বরপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। মাতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ আত্মীয়গণের সৌহার্দ্দ্য সংসারের সুখের আশা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। তীব্র ভগবৎঅনুরাগের আবেগে সংসারের মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার অন্তরাত্মা এখন সংসারবন্ধনহারিণী মাতৃ অভিমুখে, অব্যভিচারী ভক্তিপথে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইল।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য কিরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল, নিম্ন কথিত উক্তিতে তাহার আভাস দিয়াছেন,—

> "তীব্র ব্যাকুলতা হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—কেমন করে ভগবান্‌কে পাবো? গুরু বল্লেন,—আমার সঙ্গে এস, এই বলে একটা পুকুরে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধল্লেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্‌লেন ও বল্লেন,—তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বল্লে—আমার প্রাণ আটুবাটু কচ্ছিল,—যেন প্রাণ যায় যায়। গুরু বল্লেন,—দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।"

"তাই বলি, তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে

টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে করে কেউ যদি ভগবান্‌কে দিতে পারে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। "ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে!" তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পাল্লে তাঁর দেখা দিতেই হবে।" (ক)

ভগবানের জন্য এই তীব্র অনুরাগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার পক্ষে, এ অবস্থায় নিত্য পূজাদি কর্ম্ম একরূপ অসম্ভব। তিনি নিত্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

যখন এই অবস্থা হলো, পূজা আর কর্ত্তে পারলাম না। বল্লাম মা, এ রকম যদি কল্লে এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে? আমাকে কে দেখ্‌বে? আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে, সাধু ভক্ত লয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে, সাম্‌নে পড়্‌লে কারুকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, এ সব মা, কেমন করে হয়? মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে দাও।" (ক)

ভগবান্‌ দর্শনের জন্য যখন তাঁহার অভূতপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার ভার গ্রহণ করিলেন,—রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু। একজন দরিদ্র মূর্খ নগণ্য ব্রাহ্মণ যুবক, পাঁচ টাকা বেতনে মন্দিরের পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, নিত্যকর্ত্তব্য দেবসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া, অতি সদয় হৃদয় প্রভু হইলে,

তাহার চিকিৎসা বা পথ্যের কিছু সাহায্য করিলেই তাঁহার বদান্য-তার যথেষ্ট পরিচয় হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া, একজন শিক্ষিত ঐশ্বর্য্যবান্ প্রভুশক্তি সম্পন্ন পুরুষ, নিজের দেহ মন ও সম্পত্তি ঈদৃশ উন্মত্তের সেবায় যে অর্পণ করিলেন তাহার কারণ কি? কোনরূপ সাময়িক প্রেরণা, বা ধন মান বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, দুই চারি দিনের খেয়ালে নয়, কিন্তু অবিশ্রান্ত চতুর্দ্দশ বৎসর নিজ দেহপাত পর্য্যন্ত, আজ্ঞাপালনকারী শিষ্যের ন্যায় কেন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন? ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন ইহার আর কি উত্তর থাকিতে পারে? আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলে, ভগবান্ যে সকল সুযোগ করিয়া দেন, অসম্ভব ও সম্ভব হয়, ইহা একটী আধ্যাত্মিক সত্য। যিশুখ্রীষ্ট যখন শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—প্রার্থনা কর, প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে, অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যাইবে; তখন এই মহাসত্যই উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটী উপমায় এই সত্যটী বুঝাইয়াছেন,—

"কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করে,—মশাই, আমাদের কি কোন উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাক্‌বে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন!

"একজনের ছেলেটী মারা যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে, এর কাছে ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বল্লে,—তুমি যদি এইটী যোগাড়

কর্ত্তে পার, তো ভাল হয়। স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়্বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্‌বে, সেই জল একটী ব্যাঙ্ খেতে যাবে, সেই ব্যাঙ্‌কে একটী সাপ তাড়া কোর্ব্বে, ব্যাঙ্‌কে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ, ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়্বে, আর ব্যাঙ্‌টী পালিয়ে যাবে! সেই বিষ জল, একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে পার, তবে রোগী বাঁচে।"

"লোকটী অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজ্‌তে স্বাতী-নক্ষত্রে বেরুল। এমন সময় এক পসলা বৃষ্টি হল। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে,—ঠাকুর এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখে, একটী মড়ার খুলি, তাতে স্বাতীনক্ষত্রের জল পড়েছে। তখন সে আবার প্রার্থনা করে বল্‌তে লাগ্‌ল—দোহাই ঠাকুর, এইবার আর একটী জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ্ ও সাপ। তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটী সাপ ব্যাঙ্‌কে তাড়া করে আস্‌ছে, আর কাম্‌ড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে, তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন—সব সুযোগ করে দেবেন।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের অসহায় উন্মত্তাবস্থার প্রার্থনা মা শুনিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অবস্থান সময় গদাধরকে দেখিয়া মথুরবাবুর মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজাকার্য্যে

রাণী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রুত হওয়া যায়, সেই সময় মথুরবাবু গদাধরের ভিতর অদ্ভুত দৈবশক্তির বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হন। মথুরবাবু তাঁহাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরের কথা এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করেন,—

> "বাবা, তোমার ভিতর আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র—যেমন বাহিরে কুমড়ার আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখ্‌লাম যেন কেউ ঘোম্‌টা দিয়ে চলে যাচ্ছে।" (ক)

মথুরবাবু সেইদিন হইতে গদাধরকে নিজ ইষ্টের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ ঈশ্বরানুরাগে তাঁহার উন্মাদবৎ অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তাঁহার অলৌকিক সাধনার প্রথম সুযোগ হইল, মথুর বাবুর সাহায্য। বোধ হয়, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হইবার ৫।৬ মাস মধ্যে, তাঁহার ভাবান্তরের সূচনা এবং ১২৬৩ সালের শেষকাল হইতে, তাঁহার পুরাণমতের সাধনার আরম্ভ। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি গদাধর নামেই পরিচিত ছিলেন। মথুরবাবু গদাধর নামের পরিবর্ত্তে, তাঁহার বংশানুক্রমিক নাম 'রামকৃষ্ণ' মন্দিরের হিসাব খাতায় লিখাইয়া বলিলেন,—"বাবা, তোমার গদাই গদাই ও কি পাড়াগেঁয়ে বুড়ুটে নাম, রামকৃষ্ণ নামই তোমার ঠিক্ নাম।"

এস্থানে আর একটী ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। আমরা

দেখিয়াছি, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বদেশে গমন করিয়া সিওড়গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কিছুদিন ছিলেন। হৃদয় বয়সে প্রায় চারিবৎসরের ছোট এবং বাল্যকাল হইতে তাঁহার অনুগত। যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বদেশ হইতে দক্ষিণেশ্বরে জ্যেষ্ঠের নিকট প্রত্যাগত হন, সম্ভবতঃ তখন বা তাহার কিছুদিন পরে আসিয়া, হৃদয় তাঁহার সহিত কালীবাড়ীতে একত্র বাস করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইলে, মথুরবাবু হৃদয়কে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পরিচারক রূপে নিযুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্যের নিমিত্ত নিয়োগ করেন। এসময় হইতে হৃদয় ও তাঁহার মাতুলের সেবাভার প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর তাঁহার নিকট ছায়ার ন্যায় অবস্থান করিয়া, তাঁহার উন্মাদ অবস্থায় ও পীড়াকালে অদ্ভুত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—"সে সময় হৃদে না থাক্‌লে, এ দেহ রক্ষা হত না।"

কালীবাড়ীর বহুলোক সমাগম ও বাধাবিঘ্ন হইতে দূরে নির্জ্জনে কি করিয়া সর্ব্বদা মাকে ডাকিবেন, কি করিয়া অনন্যমনে মার ধ্যান চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন, এজন্য তাঁহার বিশেষ ভাবনা হইল। মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গাতীরে একটী অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। বৃক্ষের গুঁড়ির চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী। বর্ত্তমান সময় বৃক্ষের একটী বৃহৎ শাখা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বেদীর উত্তরপশ্চিম কোণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই শাখার নিম্নস্থান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন স্থান। বটবৃক্ষের পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী রোপণ ও তুলসীকানন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

"পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম, জপ্ ধ্যান কোর্ব্বো বলে। ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি,—জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সাম্নে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ার একজন ভারি ছিল (ভর্ত্তাভারি)। সে নাচ্তে নাচ্তে এসে খবর দিলে।" (ক

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ঘটনাটীতে কিছু অলৌকিকত্বের সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু, ইহা তাঁহার নিজের কথা, সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ ঘটনাটীও পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বর কৃপার নিদর্শন। অনেকেই জীবনে অনুভব করিয়াছেন যে, যে সময় কোন বিশেষ অভাবে মন অস্থির হইয়াছে, কি করিয়া তাহা পূর্ণ হইবে এই চিন্তায় প্রাণ আকুল, কোন অলক্ষ্য অচিন্ত্য উপায়ে তাহা দূর হইয়া-গিয়াছে। এ ঘটনাটী তাহারই একটী দৃষ্টান্ত।

মন্দিরের ভর্ত্তাভারির সাহায্যে পঞ্চবটীর চারিদিকে বেড়া দিয়া তুলসীকানন মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পুরাণমতের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—

"প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা কত্তাম। তুলসীকানন হলো—তার মধ্যে বসে ধ্যান কত্তাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে, মা, মা, বলে ডাক্তাম,—বা রাম, রাম, কত্তাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এ সাধনার আদিতে মধ্যে ও অন্তে কেবল একমাত্র ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা দেখা যায়। মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রাণের কিরূপ দুঃসহ কাতরতা

তীব্রবেগে তাঁহার দেহমন আলোড়িত করিতেছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থানে তাঁহার নিজের কয়েকটী কথা লিখিত হইতেছে,—

"সকলেরই যে বেশী তপস্যা কত্তে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট কত্তে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাক্‌তাম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত,-কেবল মা, মা, বলে ডাক্‌তাম্—কাঁদ্‌তাম্!"

"আমি মা, মা, বলে এমন কাঁদ্‌তাম যে লোক দাঁড়িয়ে যেত!"

"যখন এই অবস্থা হলো, দিনরাত কোথাদিয়ে যেত বল্‌তে পারি না। সকলে বল্লে পাগল হলো।"

"কৃষ্ণকিশোর আমায় বলেছিল—পৈতেটা ফেল্লে কেন? যখন আমার এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনেঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল, আগেকার চিহ্ণ কিছুই রইল না। হুঁস নাই, কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা পৈতে থাক্‌বে কেমন করে?" ক)

এই কথাগুলি হইতে তাঁহার প্রেমোন্মাদের অবস্থা আমরা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। শুনা যায়, তিনি কখন গঙ্গাতীরে মাটিতে পড়িয়া—"মা! আর একটা দিন যে চলে গেল, কিছুই যে হলো না, মা! তোমার দেখা যে পেলেম না!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন ও মাটিতে মুখ রগড়াইতেন। চারিদিকে লোকের ভিড় হইত, কেহ বা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিত,—"আহা! একেবারে পাগল হয়েছে! বোধ হয় কোন অসহ্য পীড়ার

যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্চে!” কখন মন্দিরে আসিয়া ৺কালীর প্রতিমার সম্মুখে করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন,—“মা! আমায় দয়া কর; মা! রামপ্রসাদকে দয়া করে ছিলে, আমার উপর কি মা, দয়া হবে না? মা! আমি কিছু জানি না, কি করে তোমায় পাব আমি পথ দেখ্‌তে পাচ্চি না! মা! আমি কিছুই চাই না; মা! আমি লোকমান্য চাই না; মা! অষ্টসিদ্ধি চাই না মা; ওমা! শতসিদ্ধি চাই না মা; দেহ সুখ চাই না মা; কেবল এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়!” সন্ধ্যা হইলে, মন্দিরের আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে পঞ্চবটীতে কাতরস্বরে কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন,—“মা আনন্দময়ী! দেখা দিতে যে হবে!” কখন আবার বলিতেন,—“ওহে দীননাথ! জগন্নাথ! আমিতো জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন,—আমি কিছুই জানি না, দয়া করে দেখা দিতে হবে!” (ক)

শান্তভাব সাধন।

ভক্তিমার্গের সাধনায় কিরূপে বৈধীভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাতে প্রেমাভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তিনি তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

> “ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্য্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা ঈশ্বরীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের বেশী প্রকাশ। তার পর দর্শন দ্বিভুজা,—তখন দশহাত নাই, অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তার পর গোপাল মূর্ত্তিদর্শন,—কোনও ঐশ্বর্য্য

নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এর ও পারে আছে,—
তখন কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।" (ক)

ঈশ্বরের নামগুণগান, পূজা জপ স্তবপাঠাদি বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরানুরাগ জাগরিত হয়, ভক্ত যখন ভক্তির পরিপাকে ভাবসমাধি মগ্ন হন, তখন ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় রূপ তাঁহার ভাবচক্ষে আবির্ভূত হয়। ভক্তের অন্তর তখন ভয় ও বিস্ময় বিরহিত হয় নাই। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বগুণের আধার রূপে প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একাদশ বৎসর বয়সে ঈদৃশ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী ঈশ্বরীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বৈধীভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যত প্রগাঢ় হইতে লাগিল, মন হইতে ভয় ও বিস্ময় অন্তর্হিত হইল। তিনি কালীবাড়ীর গঙ্গাতীরে নির্জ্জন পঞ্চবটীতলে জপধ্যান মগ্ন হইয়া মার বরাভয়দায়িনী শান্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাই তাঁহার শান্তভাব সাধন। এ সময় তাঁহার মাতৃভক্তি সমস্তবিধিবিহিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছে,—এখন তাঁহাকে আপনার 'মা' বলিয়া জানিয়াছেন। ফুল হাতে লইয়া মাকে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"মা! এই লও তোমার পাপ এই লও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম; আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই

লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।" (ক)

'মা, আমি কিছুই চাই না কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে'—ইহাকেই নিষ্কাম অমলা অহেতুকী ভক্তি বলে। বিষয়াসক্তি ও স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে এরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য ভক্তির উদ্ভব কখন হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এরূপ আত্মসমর্পণ,—প্রেমাভক্তির পূর্ণাবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার প্রেমাভক্তির অবস্থা আভাসে বলিতেছেন,—

"প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা! প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটী লক্ষণ। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়, জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়। দেহের উপর ও মমতা থাক্‌বে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।" (ক)

বৈধীভক্তি সাধনের সময় দেহ ইন্দ্রিয় ও বাহ্য উপকরণাদিরই প্রাধান্য। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি প্রদান এবং নামকীর্ত্তন স্তবপাঠ মন্ত্রজপ শ্রীবিগ্রহের দর্শন স্পর্শনাদির সহযোগে ভক্তের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়। কিন্তু প্রেমাভক্তিতে ঈশ্বরদর্শনের জন্য কেবল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনাই প্রধান উপকরণ। চিত্তশুদ্ধ না হইলে, প্রেমাভক্তির উদয় হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"চিত্তশুদ্ধ না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ, কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বুকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বুকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। তখন ঈশ্বর দর্শন হয়। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, আর কাঁদ, চিত্তশুদ্ধ হয়ে যাবে। ভক্তের 'আমি' রূপ আর্শিতে সেই সগুণব্রহ্ম দর্শন করবে। কিন্তু আর্শি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।" (ক)

শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরানুরাগ স্বতঃই আবির্ভূত হয়,—মন দিব্যচক্ষু লাভ করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, "তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিয়াছ, সে রূপ কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা কি দান, কি যজ্ঞ কিছু দ্বারাই দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না। কেবল অনন্যভক্তির দ্বারাই আমার এই বিশ্বরূপ প্রথমে বুঝিতে পারা যায়, পরে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারা যায় এবং অবশেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"*

কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি ত্যাগ হইয়া যখন চিত্তশুদ্ধ হয়, ভক্ত যখন অনন্যভক্তিযোগে ভগবানের চিদ্ঘনরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তখনই তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ দিব্যচক্ষে ঈশ্বর দর্শন হয় তাহা বলিয়াছিলেন,—

"তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, সাধনা কর্ত্তে কর্ত্তে

* গীতা, একাদশ অধ্যায়, ৫৩—৫৪ শ্লোক।

একটী প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষু প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গযোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।” (ক)

সুতরাং প্রেমাভক্তির সাধনা এক অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার! প্রেমাভক্তির মহান্ ভাব সাধারণ মানব ধারণা করিতে অক্ষম, কারণ ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা। জড়রাজ্যের মানুষ, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধুকে যে ভালবাসে তাহা স্বার্থপর মলিন ভালবাসা—কেবল দেহসুখে আবদ্ধ, অনিত্য বিষয়সুখের প্রতি ধাবিত। কিন্তু প্রেমিকভক্তের ভালবাসা একমাত্র প্রেমস্বরূপ ভগবানে অর্পিত। ভক্ত ভগবানের নিকট তাহার ভালবাসার প্রতিদান চায় না—তাহার ভালবাসা অহেতুকা। কিন্তু মানুষের মলিন ভালবাসার ভাব লইয়াই প্রেমিকের নিষ্কাম প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে হইবে—অন্য উপায় নাই। প্রেমিক ভক্তের ভগবৎপ্রেম, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য বা মধুর ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, প্রেমস্বরূপের সহিত মিলিত হয়। শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান্ ব্যক্তিই প্রেমাভক্তির সাধন জানিবার ও বুঝিবার অধিকারী।

পুরাণমতে সাধনের আরম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সীতাদেবীর মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

“আমি সীতামূর্ত্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে, যোনি হাত পা বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই—যেন জীবনটা রামময়, রাম না থাকলে, রামকে

না পেলে প্রাণ বাঁচবে না! উন্মাদিনী! ঈশ্বর লাভ কর্ত্তে গেলে পাগল হতে হয়!" (ক)

রামময়জীবিতা সীতা যেরূপ ভাবে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা প্রেমাভক্তির অপূর্ব্ব শুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বতোমুখী ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, সীতাদেবীর অপরূপ প্রেমময় মূর্ত্তিকে চিত্তপটে ধারণপূর্ব্বক এখন মহাসাধনায় নিমগ্ন হইলেন। শ্রীরামপ্রেমে উন্মাদিনী সীতাদেবীর রামরূপ ধ্যানে তন্ময়তার ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনায় আমরা দেখিতে পাই।

দাস্যভাব সাধন।

সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমিত্বের বর্জ্জন সকল সাধনার মূল সাধনা। ভক্তিপথে অহঙ্কারের পরিহার কি করিয়া করিতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না! সংসারীর 'আমি', অবিদ্যার 'আমি', কাঁচা 'আমি', একটা মোটা লাঠির ন্যায় সচ্চিদানন্দ সাগরের জল যেন দুভাগ কচ্চে। কিন্তু বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি'. দাস আমি, জলের উপর রেখার ন্যায়। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। 'আমি' ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আমি দাস তুমি প্রভু, এই অভিমান অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে ঈশ্বর লাভ হয়। এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা

যায়। তুমি প্রভু, আমি দাস, এ ভাবটীর নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটী খুব ভাল।" (ক)

অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করিবার সহজ উপায় নিজেকে ভগবানের দাস ভাবে চিন্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস্যভাবের সাধন কালে, শ্রীরামদাস হনুমানকে তাঁহার আদর্শ করিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যমূর্ত্তি মহাবীর ধন-মান দেহসুখ কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় জীবন সমর্পণ। বীরভক্ত যেরূপ একাগ্রমনে, ঐকান্তিক ভক্তিভাবে, প্রভুর কার্য্যে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—রামধ্যান রামজ্ঞান রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই, রামের আজ্ঞা পালন করিতে জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া, সিংহবিক্রমে মৃত্যুর ও সম্মুখীন হইতে তিল মাত্র ভীত হইতেন না, রামনামে অটল বিশ্বাস করিয়া সমুদ্র ও গোষ্পদের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় ব্রহ্মপদ ও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, সেইরূপ জলন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি সমন্বিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ রঘুবীরের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। রাম দর্শনের জন্য প্রাণ অস্থির হইল। ব্যাকুল হইয়া 'কোথায় রাম' 'কোথায় রাম' বলিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে 'রাম, রাম' বলে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে ছিলাম। দিনরাত কোথা দিয়ে যেত বলতে পারি না। যখন 'রাম রাম' কর্ত্তাম, তখন হনুমানের ভাবে হয়ত একটা ল্যাজ পরে বসে আছি—উন্মাদের অবস্থা!" (ক)

দাস্যভাবের অবতার বীরভক্ত হনুমানের ন্যায় শ্রীরামরূপে তন্ময় হইয়া, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাবসমাধি মগ্ন হইলেন, প্রেমাভক্তির পূর্ণতায় মহাবীরের ন্যায় যখন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে রামরূপের অধিষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার দাস্যভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল।

এইরূপ জনশ্রুতি যে, দাস্যভাব সাধন সময় যখন তিনি হনুমানের ভাবে তন্ময় হন, সে সময় তাঁহার আহার বিহার, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই তাঁহারই মত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টি, মুখের ভাব, আহার বিশেষে রুচি, কণ্ঠের স্বর, প্রভৃতি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, অবিকল দৃষ্ট হইত। তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন, এবং অনুভব হইল যে, "একটু ল্যাজও যেন বাহির হয়েছে।" দেহ ও ইন্দ্রিয়ের এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা। কিন্তু এরূপ হইলেও, ঘটনাটী অযুক্তিপূর্ণ উপকথা এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন যে, জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্ত্তে অন্য জাতিত্ব প্রাপ্তি, প্রকৃতির আপূরণের দ্বারায় সম্ভব হয়। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়া থাকে যে, কি দেবশরীর, কি মানুষশরীর, কি পশুশরীর, সকলেরই উপাদান পঞ্চভূত, এবং সেই সকল শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়ের উপাদান, বুদ্ধিতত্ত্ব। এই দুই বস্তু হইতে সর্ব্ববিধ শরীর ও সেই সকল শরীরস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। পশুশরীর ও ভূতবিকার, মানবশরীর ও ভূতবিকার এবং যে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে পশুমন জন্মিয়াছে তাহা হইতে মানবমনও জন্মিয়াছে। সুতরাং সকল শরীরের ও সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি

এক। আমরা যে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করি, তাহা এই সর্ব্বব্যাপিনী প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন করে,—এক জাতি, অন্য জাতি হয়, এক দেহ, অন্য দেহ হয়। এই পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, কোনরূপ অযৌক্তিক অসম্ভব ব্যাপার নয়। সর্ব্বব্যাপিনী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির, সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ পরিণাম হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক; আর অজ্ঞান ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধর্ম্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক। যে প্রকৃতিতে অজ্ঞানের ও অধর্ম্মের দ্বারা পশুশরীর রূপ পরিণাম ঘটিতেছে, তাহাতে এখন জ্ঞান ও ধর্ম্ম পরিণাম অবরুদ্ধ আছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মবল বৃদ্ধি হইয়া যদি অজ্ঞান ও অধর্ম্মকে নষ্ট করে, তাহা হইলে, নিষ্প্রতিবন্ধকে কার্য্য হইয়া, পশুশরীরে দৈবপরিণাম ঘটিতে পারে। দেবশরীর হইবার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলেই পশুশরীর আপনা আপনি দেব-শরীর হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই জাত্যন্তর পরিণামের মূল। জ্ঞান ও ধর্ম্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের সাহায্যকারী মাত্র।*

যোগী যখন তাঁহার আরাধ্যদেবে তন্ময় হন, যখন তাঁহার প্রকৃতি হইতে দেবভাবের সকল বিরুদ্ধভাব চলিয়া যায়, তখন তাঁহার মানব দেহমন, দেব দেহমনে রূপান্তরিত হইবার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতিতে এ সময় অপর সকল ভাব রুদ্ধ হইয়া, একমাত্র মহাবীরের ভাব প্রবল হওয়াতে,

* পাতঞ্জল দর্শন—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

তাঁহার দেহ ইন্দ্রয়ের পরিবর্ত্তন, প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ দৈহিক পরিবর্ত্তন, হিন্দু তত্ত্ববিদ্‌গণের পরিণাম বাদই সমর্থন করে। কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়ের ঐরূপ পরিবর্ত্তন কতদূর গভীর তন্ময়তায় ঘটিতে পারে, তাহা যোগীগণই বলিতে সমর্থ।

সখ্যভাব সাধন।

সখ্যভাবের সাধনায় সাধক আপনাকে ভগবানের সখা-- খেলার সঙ্গী মনে করেন। এই সংসার ভগবানের লীলাভূমি। তিনি সকলকে লইয়া খেলা করিতেছেন। কাহাকে দরিদ্র কাহাকে ধনবান্, কাহাকে সুখী কাহাকে দুঃখী সাজাইয়া, তিনি নিজে খেলা করিতেছেন। এই জন্য সখ্যভাবের সাধনা হইতে সর্ব্বজীবে আত্মভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। ব্রজের রাখালগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধাভক্তিই সখ্যভাবের আদর্শ। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসা নিষ্কাম ভালবাসা। বন্ধুর কার্য্যে বন্ধু প্রাণদানেও পরাঙ্মুখ হয় না। ভগবান্ আমাদের পরম সুহৃদ্, তাঁহার কার্য্যে তাঁহার জন্য প্রাণ যদি যায় তাহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য? তিনি আমাদের পরম বন্ধু.—বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে সকল বিষয়ে প্রাণের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনের ভার লাঘব করিতে পারি। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সখাকে না দিয়া নিজের ভোগ করিতে অভিলাষ হয় না। বন্ধুর জন্য সর্ব্বত্যাগে ও প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। ব্রজের রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবেই ভালবাসিয়াছিল। সখ্যভাবের সাধনায় ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ সহজে উপস্থিত হইয়া থাকে।

সখ্যভাবে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব মনে থাকে না, এবং ঐশ্বর্য্য-ভাব থাকে না বলিয়া, ভয়ের ভাব ও মনে আসে না। যখন অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, তখন সখ্যভাব ভুলিয়া গিয়া ভয় বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখন ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা মানুষজ্ঞানে শুদ্ধাভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম করিয়াছিলেন। ব্রজবালকদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহেতুক ভাল-বাসা। শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই আত্মভাবে সকলকে ভাল-বাসিয়া ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই স্ত্রী পুরুষ পণ্ডিত মূর্খ ধনী দরিদ্র সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক সহানুভূতি গুণে একপ্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ভালবাসা সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোককে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিয়াছিল। সখ্যভাব শ্রীরামকৃষ্ণের সহজভাব। শ্রীদামাদি ব্রজের রাখালগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধাভক্তির ন্যায়, তাঁহার সকলের প্রতি অহেতুক ভালবাসা ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া, সহজেই তাঁহাকে সখ্যভাবে সিদ্ধ করিয়াছিল।

বাৎসল্যভাব সাধন।

বাৎসল্যভাবে ভগবান্‌কে সন্তান মনে করিয়া ভালবাসিতে হয়। সখ্যভাবে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব কখন মনে আসিতে পারে; এবং ঐশ্বর্য্যের ভাব মনে আসিলে ভয়েরও উদয় হইতে পারে। ভয় থাকিলে ভালবাসা মনে স্থান পায় না। কিন্তু বাৎসল্য ভাবে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব একেবারেই মনে উঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছিলেন,—"তখন কেবল গোপাল মূর্ত্তি

দর্শন—কোন ঐশ্বর্য্য নাই কেবল কাঁচছেলের মূর্ত্তি।” বাপ মা সন্তানকে যে ভালবাসেন তাহার ভিতর ভয়ের ভাব নাই, কোনরূপ স্বার্থ দোকানদারী নাই। সে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রাণ দিয়াও সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্খা করে। বাৎসল্যভাব প্রেমের উচ্চ ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যভাব সাধনের সময় কোন রামাৎ সাধু ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে জটাধারী বলিতেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের বালকমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন, এবং রামলালা নামে একটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীবিগ্রহ ইষ্টস্বরূপে নিত্যপূজা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারীর নিকট রামমন্ত্র গ্রহণ করেন। জটাধারী শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবসংসর্গে নিজ ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কালীবাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ রামলালা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহমূর্ত্তি কালী-বাড়ীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ রামলালার সহিত এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতেন যেন তাহা জীবন্ত তিন চারি বৎসরের বালক। তাঁহার চক্ষে রামলালা অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিগ্রহ নয়,—সে বালক রামচন্দ্র,—“তাহার মনোহর অঙ্গকান্তি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।” যশোদার নিকট গোপাল যেরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামলালাকে সেইরূপ বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন। রামলালাকে স্নান করাইয়া দিতেছেন, খাওয়াইয়া দিতেছেন, সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে-ছেন, সমস্তক্ষণ চক্ষে চক্ষে রাখিতেছেন। পাছে রামলালার অসুখ

শ্রীশ্রীরামলালা

হয়, ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেছেন। রাগ করিয়া বলিতেছেন,—"যদি বারণ না শুন্‌বি তাহলে তোকে প্রহার কর্ব্বো। শুন্‌লিনে—বাগানে যে কাদা হয়েছে, পায়ে যে লাগ্‌বে। বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজে যাবে, শেষে কি জ্বর কর্‌বি?" রামলালাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন। রামলালা জল হইতে উঠিতে চাহিতেছে না দেখিয়া বলিতেছেন,—"দ্যাখ্ অত করে জলে থাকিস্ নে—অত জলে যাস্‌নে ডুবে যাবি। আয় তোর গা পরিষ্কার করে দি।" তিনি বলিতেন,—

"আমি 'রাম, রাম' করে পাগল হয়েছিলাম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে সঙ্গে লয়ে বেড়াতাম, তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম, যেখানে যাব সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা, রামলালা করে পাগল হয়ে গেলাম! রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদ্‌তাম!" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"প্রেমাভক্তিতে দুটী জিনিষ থাকে—অহংতা আর মমতা। যশোদা ভাবতেন, আমি কৃষ্ণকে সেবা না কল্লে, আমি না দেখ্‌লে গোপালকে কে দেখ্‌বে! তাহলে গোপালের অসুখ কর্ব্বে! কৃষ্ণকে ভগবান্ বলে যশোদার বোধ ছিল না।' এর নাম অহংতা। আর মমতা,—আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্লেন,—মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন! যশোদা বল্লেন,—ওরে তোদের চিন্তামণি

> নয়, আমার গোপাল,—কেমন আছে জিজ্ঞাসা কচ্চি! চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল! গোপীদের এত মমতা যে, পাছে কিছু আঘাত লাগে বলে, তাদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকৃত! গোপীরা ও বল্‌ছে—কোথায় প্রাণ বল্লভ! আমার হৃদয় বল্লভ! ঈশ্বর বোধ নাই! যেমন ছোট ছেলেরা দেখেছি বলে,—আমার বাবা! যদি কেউ বলে,—'না, তোর বাবা নয়',—তাহলে বল্‌বে,—'না, আমার বাবা!' (ক)

বাৎসল্যভাব সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কিরূপ অহংতা ও মমতার ভাব আসিয়াছিল, তাহা রামলালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার বর্ণনা হইতে বোধ হয়, যেন ভগবান্ সত্য সত্যই তিন চারি বৎসরের বালক রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন, খেলা করিতেছেন, আব্‌দার করিতেছেন! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত মলিনবুদ্ধি জীবের কি করিয়া ইহা বিশ্বাস হয় যে, ঈশ্বর দেহধারণ করিয়া ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন? দেহাত্মবুদ্ধিহীন বিষয়াসক্তিশূন্য, অহংজ্ঞানবিরহিত শুদ্ধমন, প্রেমের শরীর ধারণ করিয়া যখন ভাবরাজ্যে বিচরণ করে, তখন তাহার কিরূপ অনুভব হয়, কে বলিবে? শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী ভক্তিতে ভগবান্ আকৃষ্ট হইয়া যে, তাঁহার প্রেমের চক্ষে প্রত্যক্ষ হইবেন, তাঁহার সঙ্গে লীলাবিলাস করিবেন,—ইহা যে পরম সত্য, একথা তিনিই বলিতে পারেন, যিনি এই প্রেম সম্ভোগ করিয়াছেন।

মধুরভাব সাধন।

মধুর ভাবের ভিতর শান্ত দাস্যাদি সকল ভাবই আছে। সাধ্বী স্ত্রী নিজ স্বামী যেরূপই হউন, তাঁহাকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া জানেন। স্বামীসেবায় তিনি চিরদাসী, পরামর্শদানে প্রিয়তম সখা, যত্নে স্নেহময়ী মাতা। তিনি স্বামীর সুখেই সুখী, স্বামীর প্রীতির জন্য জীবন ধারণ করেন। স্ত্রীর এই সর্ব্বতোমুখী ভালবাসা সর্ব্ববিধ ভালবাসার শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রেমের উচ্চতম ভাব। মধুরভাব স্ত্রীপুরুষের এই উচ্চতম ভাবের উপর প্রতিষ্টিত। স্ত্রীপুরুষের অন্তরে এই প্রেমের ভাব প্রবল হইয়া নীচগামী হইলে,—দেহসুখে মুগ্ধ হইলে, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানের লোপ হয়, তাহারা উন্মত্তবৎ, পিশাচবৎ ব্যবহার করিতে থাকে। আবার এই প্রেম, মধুরভাবে ঈশ্বরাভিমুখী হইলে, মানুষের নিম্ন প্রকৃতি, দুর্ব্বার কামাদি কুপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়।

ভগবান্‌ই আমাদের একমাত্র প্রেমের পাত্র। ভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইলে, যাহা সর্ব্ববিধ ভালবাসার সমষ্টি, যাহা প্রেমের সর্ব্বোচ্চভাব, সেই মধুরভাব তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে। ভগবান্‌ই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভালবাসার লক্ষ্য। আমাদের মধুরভাবের পাত্রও তিনি। মধুরভাবে ভগবান্‌কে স্বামীভাবে চিন্তা করিতে হয়। মানুষের চক্ষু, সুন্দর বস্তু দেখিতে চায়, তাহার মন সৌন্দর্য্য ভালবাসে। ভগবান্ পরম সুন্দর,—তিনি সৌন্দর্য্যস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—"যে, ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ

হয়!" ভগবান্‌কে পতিভাবে গ্রহণ করিয়া প্রেমিক ভক্ত তাঁহার অনুপম রূপমাধুরীতে ডুবিয়া যান; ভক্তের প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান্‌ই তাহার মনপ্রাণ হরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা,—"ঈশ্বর দর্শন হলে রমণসুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়!" ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া, ভক্ত মানবীয় ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হন। সাধারণ মানব এই প্রেমের ভাষা বুঝিতে পারে না; উহা তাহাকে অনিত্য ও দুঃখের মূল ইন্দ্রিয়সুখের ভাবই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবানের জন্য মধুরভাবে প্রেমোন্মত্ততা উপস্থিত হইলে মানুষের দেহবোধ লুপ্ত হয়, কামাদি রিপু নিষ্কলঙ্ক প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে, স্ত্রী-পুরুষাদি ভেদজ্ঞান দূর হইয়া দেশকাল ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া ভক্ত ভগবানের অমৃতময়ী নিত্য-লীলারস সম্ভোগ করিতে থাকেন।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধীয় মধুরভাবে ভগবৎপ্রেমিক সন্তুষ্ট থাকেন না। "স্বামী স্ত্রীর প্রেম ও তাঁহার নিকট তত উন্মাদ কর নহে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। ভক্তেরা পরকীয়া প্রেমের ভাব গ্রহন করিয়া থাকেন। কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা লক্ষ্য নহে। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায় ততই উগ্রভাব ধারণ করে। সেই জন্য ভক্তেরা গোপীপ্রেম কল্পনা করেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহাদের পিতা মাতা স্বামী কাহারই বাধা মানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে উন্মত্ত হইয়া, সমুদায় ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, জগতের সব বন্ধন, সকল কর্ত্তব্য, ইহার সকল সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া আসিতেন। প্রিয়তমের অধরামৃত পান করিবার জন্য কাতর হইয়া বলিতেন,—"হেবীর! তোমার সুরতবর্দ্ধন, শোক-নাশন,

নাদিত-বেণু-সুচুম্বিত, মানুষের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছা নাশক, যে অধরামৃত তাহা আমাদের দান কর।"* প্রিয়তমের সেই চুম্বন, তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়! মানুষকে দেবতা করে! ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদায় প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যায়! ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা! মানুষ! মানুষ! তুমি ঈশ্বর প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার? যেখানে কাম সেখানে কি রাম থাকিতে পারেন? আলো আঁধার কখন এক সঙ্গে থাকিতে পারে?"†

গোপীপ্রেম বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

> "রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিন গুণই আছে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধসত্ত্ব বই আর কিছু নাই। সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হয় তা হলে রাধিকার কাছে শেখা যায়। সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন কর্‌বার জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 'আধার' আর তিনি নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়'—নিজের রস আস্বাদন কর্ত্তে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ কর্ত্তে।"

* শ্রীমদ্ভাগবত, রাসপঞ্চাধ্যায়।
† ভক্তিযোগ, স্বামীবিবেকানন্দ।

"শ্রীমতীর মহাভাব হতো। সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বল্‌ত—কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি, ওঁর দেহমধ্যে, এখন কৃষ্ণ বিলাস কচ্চেন। ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জল্‌টা নড়ে, তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। আহা! গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁজে শুকিয়ে যেত —জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত! কখন কখন তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্‌লে কেউ টের পায় না। আহা! সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি কারু হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোলআনা অনুরাগ নয়—পাঁচসিকে পাঁচ আনা! এর নাম প্রেমোন্মাদ! ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়ে ছিল,—কৃষ্ণে অনুরাগ! শ্রীমতী যখন বল্লেন,—আমি কৃষ্ণময় দেখ্‌ছি; সখীরা বল্লে,—কৈ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি কি প্রলাপ বক্‌চো? শ্রীমতী বল্লেন,—সখী! অনুরাগ অঞ্জন চোখে মাখো তা হলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। শ্রীমতীর মহাভাব! গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না—কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় না।" (ক)

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্য অত হয় না। যদি খোঁচ্ ধর যে তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের মত টান হবে? তা শুন্‌লেও সে টান হয়—"না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।"

"প্রেমোন্মাদ হলে স্বর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল,—আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে! তৃণ দেখে বলে,—শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে! মেঘ দেখে,—নীলবসন দেখে—চিত্রপট দেখে শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো! তিনি এসব দেখে উন্মত্তের ন্যায় কোথায় কৃষ্ণ! বলে ব্যাকুল হতেন। শ্রীমতীর প্রেম—কৃষ্ণ সুখে সুখী,—তুমি সুখে থাক আমার যাই হোক্! গোপীদের এই বড় উচ্চভাব!" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মধুর ভাব সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"কি অবস্থা গেছে! হর গৌরী ভাবে কত দিন ছিলাম। আবার কত দিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে থাকৃতাম—ঐরূপ সর্ব্বদা দর্শন হতো। কখন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর্ত্তাম; সীতার ভাবে রাম রাম কর্ত্তাম। সীতারামকে রাত দিন চিন্তা কর্ত্তাম, আর সীতারাম রূপ দর্শন হতো।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাবীরের ভাবে দাস্যভাব সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-মাতা যশোদা তাঁহার বাৎসল্যভাব সাধনের আদর্শ। আর পাতিব্রত্যের চরমাদর্শ রামগতপ্রাণা সীতাদেবী তাঁহার শুদ্ধসতীত্বময় মধুরভাবের অবলম্বন হইয়াছিলেন। পুরাণমতের সাধন কালে চিদানন্দময় রামরূপ তাঁহার নানা ভাববিলাসের বস্তু হইয়াছিল। 'কোথায় রাম' 'কোথায় রাম' বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কখন দাস্যভাবে, কখন বাৎসল্যভাবে, কখন মধুরভাবে, সুমধুর রামরস আস্বাদনে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি সাধনার প্রথমেই সীতামূর্ত্তি দর্শন করেন—রাম চিন্তায় উন্মাদিনী! সীতাদেবীর এই প্রেমোন্মত্ত ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রামদর্শনের জন্য তাঁহাকে অস্থির করিলে, তিনি জগৎ ভুলিয়া যাইতেন, দেহবোধ লুপ্ত হইত, কেবল দুই চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা অবিরল বিগলিত হইতে থাকিত। এইরূপ বিমল মধুরভাবে তন্ময় হইলে, তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইতেন আর শ্রীরামচন্দ্রের চিদ্ঘনরূপ তাঁহার ভাবচক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দে পূর্ণ করিত।

শুনা যায় সীতাদেবীর দিব্য দর্শনের ন্যায় তিনি শ্রীমতী রাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, শ্রীমতী রাধিকার চম্পক পুষ্পের ন্যায় শ্রীঅঙ্গের কান্তি, পরিধানে নীল বসন, মস্তকে কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম অনুপম শ্রীমুখের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীরাধিকার ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য লোপ হইত। এই মহাভাবাবস্থার একটী অনুভব তিনি

বলিয়াছিলেন,—"মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্য্যন্ত-মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটী ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণসুখ বোধ হয়।" মানুষের ভাবে মানুষের ভাষায় এই প্রেমানন্দের বর্ণনা হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জীবের পক্ষে এসকল কথার মর্ম্ম অবোধগম্য। তিনি সেইজন্য বলিতেন —"জীবের এসব শুন্‌তে নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবাবস্থার অনুভূতি সকল বুঝাইয়া দিতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার অভিনয়ে যে মধুর-ভাব-রসের অবতারণা হইয়াছিল, তাহাই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গে পূর্ণরূপে বিকশিত এবং এক্ষণে সেই প্রেমরস আস্বাদন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ। বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী প্রেমময়ী শ্রীরাধার ন্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাবে অবস্থান সময়ে তাঁহাতে কিরূপ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইয়াছিল ও প্রেমাস্পদের অদর্শনে কিরূপ বিরহাগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিল, আমরা পরে তাহা জানিতে পারিব।

মধুরভাব সাধন সময় শ্রীরামকৃষ্ণের হরগৌরীভাবে ও পুরুষ প্রকৃতিভাবে সাধনার কথা, এবং তাঁহার আর ও নানাভাবের সাধনা, তিনি আভাসে বলিয়াছিলেন মাত্র। সে সকলের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা নাই। তিনি বলিতেন,—

> "ভগবান্‌কে জান্‌তে গেলে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা কর্ত্তে হয়। পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতি ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়,—সখীভাব, দাসীভাব মাতৃভাব। তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।

প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কথনও মনে করে 'তুমি পদ্ম আমি অলি'। কথনও 'তুমি সচ্চিদানন্দ সাগর আমি মীন'। প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে, 'আমি তোমার নৃত্যকী'—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্য গীত করে। বলরাম কথনও সখার ভাবে থাক্‌তেন, কথন ও বা মনে কর্ত্তেন আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকম তাঁর সেবা কর্ত্তেন।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের সখীভাবে বিশেষ সাধনার কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে। তাঁহার সকল সাধনার বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই; তিনি এইমাত্র বলিতেন যে, আঠারটী ভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণমতে সাধন কালে, অনেক সময় তাঁহার দেহজ্ঞান থাকিত না। আহারে রুচি, চক্ষে নিদ্রা অপগত হইয়াছিল। দেহ শীর্ণ। দিবারাত্র পঞ্চবটীতে উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেন। এসময় তাঁহার এরূপ গাত্রদাহ হইয়াছিল যে তাহা কিছুতেই নিবারিত হইত না। সময় সময় দিবারাত্র জ্ঞান ও লুপ্ত হইত। বাহ্যজগৎ স্বপ্ন দৃষ্টের ন্যায় মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে যখন কাঁদ্‌তাম,—লোকের ভিড় হতো। কিন্তু আমি দেখ্‌তাম্ জীব জন্তু মানুষ যেন সব পটে আঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা ভয় কিছুই হতো না।" এ সময় তাঁহার অনুভূতিতে কেবল ভাব রাজ্যের অস্তিত্বই বর্ত্তমান। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া অন্তরে প্রেমের বস্তুকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইলে তাঁহার ভাবসমাধি উপস্থিত হইত এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন রূপ

প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি আত্মহারা হইতেন। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে, তখন তাহার সকল জ্বালা শান্তি হয়, সকল সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম্মক্ষয় হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাক্‌তাম,—আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম,—মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। আরও কত কি, তা কি বল্‌বো! আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! "ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!" (ক)

তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন,—মা-ই একরূপে রাম একরূপে সীতা হয়ে আছেন; একরূপে শ্রীকৃষ্ণ, একরূপে শ্রীরাধা হয়ে আছেন। তিনি পুরাণমতে সাধন করিয়া নানা সাকার ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিলেন। অবশেষে তিনি মাকে নির্ব্বিশেষে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "যখন বাইস্ তেইস্ বছর বয়স, (১২৬৪—৬৫ সাল) কালী ঘরে বল্লে,—তুই কি অক্ষর হতে চাস্? অক্ষর মানে জানি না,—হলধারীকে জিজ্ঞাসা কল্লাম। হলধারী বল্লে,—ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা।" (ক)

মাকে 'অক্ষর' রূপে দর্শন করিবার সময় তাঁহার কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেন। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে কিরূপ তাঁহার, অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন হইয়াছিল, তাঁহার নিজমুখের সরল কথায়, সেই অলৌকিক ব্যাপার লিখিত হইল।

"মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দ্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। "প্রসুপ্ত ভূজগাকারা আধারপদ্ম বাসিনী ভক্তি কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হন। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে চৈতন্য হয় না, ভগবান্ দর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না।

"সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। ইড়া পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী। সুষুম্নার মধ্যে ছয়টী পদ্ম আছে—চিন্ময়। সর্ব্ব নীচে মূলাধার, তারপর সাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে, চৈতন্য হলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে, হৃদয়ের মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ গুহ্য নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হয়ে জ্যোতিঃ দেখে আর বলে, —একি! একি! বিশুদ্ধচক্রে মন উঠ্‌লে, কেবল ঈশ্বরীয় কথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের

স্থান কণ্ঠ—ষোড়শদল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে তার সাম্‌নে বিষয় কথা, কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে ভারি কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুন্‌লে সে সেখান থেকে উঠে যায়। তার পর ষষ্ঠভূমি—আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া যায় না। তার পর সপ্তম ভূমি—সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রায় সচ্চিদানন্দ শিব আছেন, তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন—শিব শক্তির মিলন।”

ব্যাকুল হলে তবে কুণ্ডলিনী জাগেন। আমার এই অবস্থা যখন হলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো। এ অতি গুহ্য কথা! দেখ্‌লাম ঠিক আমার মতন বাইশ, তেইশ বছরের ছোকরা সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ কর্ত্তে লাগলো! প্রথমে গুহ্য লিঙ্গ নাভি। চতুর্দ্দল ষড়দল দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—উর্দ্ধমুখ হলো! হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর, দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম উর্দ্ধমুখ হলো—আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম

প্রস্ফুটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা!" (ক)

কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া সহস্রার গতা হইলে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ইহা সবিকল্প বা চেতন-সমাধি। এই চেতন সমাধিতে তাঁহার 'আমি' জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সমাধির ভঙ্গের পর তাঁহার যে 'অবস্থা' হইয়াছিল, তাহাতে ভগবান্‌কে আর সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় রূপে দেখিতে পান নাই; শান্ত দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের আধার পরম প্রেমাস্পদরূপে ও দর্শন করেন নাই; কিন্তু মা,—এই সব হয়েছেন, এই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তুমি মা, আমি ছেলে,—এই দ্বৈতভাবাবস্থা অতিক্রম করিয়া, এখন তিনি দেখিলেন,—মা পূর্ণ, তিনি অংশ; তাঁহার মা,—সর্ব্বভূতে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। পুরাণমতে সাধন করিয়া তিনি ঈশ্বরকে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় ভাবেই দর্শন করিলেন। তাঁহার পুরাণমতের সাধনা সম্পূর্ণ হইল।

বিবাহ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ ও পুরাণমতের সাধনার বিবরণ যেরূপ বর্ণিত হইল, তাঁহার অন্যান্য জীবনাখ্যানের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার উক্তি অনুসারে ইহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। সকল চরিত গ্রন্থে, প্রথম প্রেমোন্মাদের সময়, তাঁহার ৺কালীপূজা ও শক্তি সাধনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাব উক্তি অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, তিনি বলিতেন—"তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন ; প্রথম পুরাণমতের, তার পর তন্ত্র মতের।" তিনি প্রথমেই পঞ্চবটীতে পুরাণ মতের সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিবার সময় তাঁহার প্রথম প্রেমোন্মাদ হওয়াতে স্বভাবতঃই পুরাণমতের সাধনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তাঁহার আর একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে, একজন পাগল এসেছিল—পূর্ণজ্ঞানী। লোকে বল্লে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার একজন। একপায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি, আর একটী ভাঁড় আবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গিয়ে মত্ত হয়ে স্তব কর্ত্তে লাগ্‌লো।

মন্দির কেঁপে গিয়েছিল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে—কুকুর কিছু বলে নাই। আমি হলধারীর কাছে যখন এসব কথা শুনলাম আমার বুক গুর্ গুর্ কর্ত্তে লাগলো। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আমি হৃদের গলা ধরে বল্লাম, ওরে হৃদে, আমারও কি এই দশা হবে! আমরা দেখ্‌তে গেলাম। আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক এলে পাগলামি।" (ক)

তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, যখন জ্ঞানীপাগল কালীবাড়ীতে আসিয়াছিল,—১২৬৩ সালের কোন সময়ে—তখন তাঁহার উন্মাদ অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি তখনও পূজা কার্য্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নাই। শুনা যায়, পাঁচ ছয় মাস পূজা করিতে না করিতে তাঁহার প্রেমোন্মাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, তিনি ১২৬৩ সালের জন্মাষ্টমীর সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ঐ সালের মাঘ বা ফাল্গুন মাসে তিনি জ্ঞানীপাগলকে কালীবাড়ীতে দেখিতে পান। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার প্রায় এক বৎসর ৺কালীর পূজা করিয়া তখন কয়েক মাস মাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন। তাঁহার উক্ত কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সেই সময় হলধারী কালীঘরে পূজা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায়ই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। অতএব প্রেমোন্মাদের পূর্ব্বে যে তাঁহাকে কালী ঘরে পূজা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহারই কথা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি। রাণী

রাসমণির মন্দিরের বরাদ্দ হইতেও আমরা এই কথার সমর্থন পাই। 'কথামৃত' হইতে আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাণী রাসমণির বরাদ্দ।*

সন ১২৬৫ সাল।

শ্রীশ্রীকালী—শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য্য—৫৲; কাপড়—৩ থান ৪৷৷৹

শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৫৲; কাপড়—৩ থান ৪৷৷৹

পরিচারক—শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায়—৩৷৷৹; ফুল তুলিতে হয়। খোরাকী—সিদ্ধ চাউল—/৷৷৹; ডাল—/৷৷৹ পোয়া; পাতা—২ থান; তামাক—১ ছটাক, কাষ্ঠ—/২৷৷৹।

বরাদ্দে দৃষ্ট হইবে যে, ১২৬৫ সালে রামতারক চট্টোপাধ্যায় (হলধারী) ৺কালীমাতার পূজক ও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতেছেন বলিয়া লিখিত আছে। যদিও এই হিসাবে ১২৬৫ সালের বিষয় মাত্র দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহা যে কোন নূতন বন্দোবস্ত নয় এবং রামকুমারের ১২৬৩ সালে দেহত্যাগের পর হইতে উক্ত ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কতদিন পুরাণমতে সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমোন্মাদ অবস্থা কতদিন ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ১২৬৪ সালের কোন সময় হইতেই যে তিনি নিত্য পূজাদি কার্য্যে অনেকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয়। কারণ

* From Deed of Endowment executed by Rani Rashmani, 18th February 1861.

রাণী রাসমণির পূর্ব্বোল্লিখিত বরাদ্দ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি ১২৬৫ সালে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পূজায় নিয়মিত নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এ সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ লইয়াই তিনি বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার এই অবস্থার পর, কেবল ঈশ্বরের কথা শুন্‌বার জন্য ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় আধ্যাত্ম (রামায়ণ, কোথায় মহাভারত, খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে আধ্যাত্ম শুনতে যেতাম। সাধু এসেছে শুন্‌লে দেখ্‌তে যেতাম।"

তাঁহার এই সকল কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেখানে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, সাধু সমাগম, শাস্ত্র পাঠ, কথকতা বা যাত্রা সঙ্কীর্ত্তন হইত তিনি শুনিতে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে এঁড়েদহে কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল এবং এই সূত্রে উভয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। শুনা যায়, কৃষ্ণকিশোর ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি ও কৃষ্ণকিশোরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির কথা অনেক সময় বলিতেন। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের ন্যায় দুই চারি জন সূক্ষ্মদর্শী ব্যতীত দক্ষিণেশ্বর আলমবাজার বরাহনগর প্রভৃতি স্থানের সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্তই স্থির করিয়াছিল। এ সময় প্রকৃত সাধক ও ভক্ত পাইলে তিনি যেমন প্রীত হইতেন, কাহারও ভিতর কপটতা ও ধর্ম্মের ভাণ দেখিলে, ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া

বিরক্তি প্রকাশ করিতে ভীত হইতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"উন্মাদ অবস্থায় লোক্‌কে ঠিক্ ঠিক্ কথা, হক্‌কথা বল্‌তাম। কারুকে মান্‌তাম না। বড়লোক দেখ্‌লে ভয় হতো না। সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখ্‌লাম জয়মুখুয্যে জপ্ কচ্চে, কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম। একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলো। পূজার সময় আস্‌তো আর দুই একটা গান গাইতে বল্‌তো। গান গাচ্চি—দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্চে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইলো। হলধারীকে বল্লাম—দাদা, একি স্বভাব হলো! কি উপায় করি! তখন মাকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ও স্বভাব গেলো।" (ক

শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা এবং সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় ও ঈশ্বরের কথায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া স্বজনগণ তাঁহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি কোন রূপ অনভিমত প্রকাশ করেন নাই। সেজন্য ১২৬৫ সালের শেষ ভাগে আত্মীয়বর্গ বিবাহ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দেশে লইয়া আসিলেন। দেশের সকলেই শুনিয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উন্মাদাবস্থা হইয়াছে। এখন তাঁহার মুখে কেবল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বুঝিতে পারিল যে, ঈশ্বরানুরাগই তাঁহার ভাবান্তরের কারণ। তিনি বলিয়াছিলেন—

"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে, চিনে শাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বল্লাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়্‌তে যাই! তখন চিনে বল্‌লে, ওরে, তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে যখন ধূলা ওড়ে, তখন আমগাছ, তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।" (ক)

গদাধর গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেরই অতিশয় প্রিয়। তাঁহার বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইল। যাহাতে তাঁহার বিবাহকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তাঁহার মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বর নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মাদের কথা প্রচার হওয়াতে কেহই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অগ্রসর হইল না। অবশেষে তিনি স্বয়ং জয়রামবাটী নামক গ্রামে পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,— 'সেইখানে গ্যাখগে, মেয়ে হাতে কুটো বেঁধে রয়েছে।" তিন বৎসর পূর্ব্বে সিওড় গ্রামে যে কৌতুকাবহ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি কি সেই দৈবব্যাপার ফলবতী হইবার সম্ভাবনা এখন দেখিতে পাইলেন? যাহা হউক, কামারপুকুরের দুইক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুহিতা শ্রীসারদামণি দেবীর সহিত ১৮৬৬ সালের প্রথমেই তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল; শ্রীসারদা দেবীর বয়স, পাঁচবৎসর অতীত। শ্রীসারদাদেবীর জন্ম, ১৭৭৫

শক ৮ই পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। কুল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ রাঢ়ী-শ্রেণী, খড়দহ মেল, স্বভাব, হইলেও লৌকিক প্রথানুসারে তাঁহাদের বংশে পণ দিয়া কন্যাগ্রহণ করিতে হয়। শুনা যায়, শ্রীরাম-কৃষ্ণের বিবাহে ও পণ লাগিয়াছিল।

বিবাহের অনুমান আট নয় মাস পর শ্রীরামকৃষ্ণ কুলপ্রথা পালনের জন্য, 'নববধ্বাগমন' "উপলক্ষে একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এ সময় শ্রীসারদাদেবীর ছয়বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"শ্বশুর বাড়ী গেলাম। সেখানে খুব সঙ্কীর্ত্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুর্য্যের বাপ এরা সব এলো। খুব সঙ্কীর্ত্তন।"

সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে ভগবৎভাবে বিভোর স্বামীর ভাবোন্মত্ততা, বালিকার সরল সুকোমল চিত্তে দিব্য-স্বপ্নের ন্যায় অঙ্কিত থাকিবারই সম্ভাবনা। স্বামী সম্বন্ধে অপর কোন ভাব, সংসার জ্ঞানশূন্য বালিকার অন্তরে এখন কি করিয়া স্থান পাইতে পারে? দেশাচার বশতঃ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ হয় বলিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ সময় শ্রীসারদাদেবীর বয়স কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর মাত্র হইলেও, সামাজিক প্রথানুসরণ করিয়া তাঁহার শ্বশুরালয় কামারপুকুরে দ্বিরাগমন অর্থাৎ পত্নীভাবে প্রথম স্বামী সকাশে আগমন, যাহা ব্যবহারিক ভাবে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গণ্য, তাঁহার এয়োদশ বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল। তৎকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে বেদমতে সাধন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—যাঁহার প্রেমোন্মাদেয় অবস্থা, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় যাঁহার মনোমধ্যে ক্ষণকাল ও

স্থান পায় না, বিবাহরূপ মায়ার বন্ধনে সেই মন কেন আবদ্ধ হইল? আমরা বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই তিনি বাল্যভাবের বশে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সরলশুদ্ধহৃদয়ের প্রেরণায়। তিনি অনুভব করিতেন, অন্তরে কে একজন তাঁহাকে সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে; বিচার করিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে হয় না। তাঁহার বাল্যকালের মনোভাব একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"এতো ভেবে ছিলাম, বিয়ে করবো, শ্বশুরবাড়ী যাবো, সাধ আহ্লাদ করবো, কি হয়ে গেল!" (ক

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সরল বাল্যভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন। তাঁহার সরলমনে কোনরূপ পাটোয়ারিবুদ্ধির নামগন্ধ ছিল না। বিষয়াসক্ত লোকের পক্ষে তাঁহার মনের প্রকৃতভাব বুঝা কঠিন। যদিও তিনি বাল্যভাবের উদারবুদ্ধির প্রেরণায় বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন ও ইহার অপর এক কারণ। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেন,—"সংস্কারের জন্য বিবাহ কর্ত্তে হয়।"

স্মৃতিশাস্ত্রে আছে,—"বৈদিক পুণ্যকার্য্যদ্বারা দ্বিজাতিগণের গর্ভাধানাদি সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকালে ও পরকালে পবিত্রতা বিধান করে। গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদির সংস্কারদ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজন্য পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে।" * পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

* মনু সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬-২৭ শ্লোক।

"রেখারদ্বারা চিত্র আঁকিয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে রং দিলে যেমন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেইরূপ যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক সংস্কার করিলে ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুট হয়।" *

জীব পিতামাতার শুক্রশোণিতযোগে গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সংসর্গজন্য, তাহার দেহমনে দোষ আশ্রয় করে। দশবিধসংস্কার দ্বারা সেই দোষের স্খালন হইয়া থাকে। যেরূপ সংস্কার করিলে গৃহাদির শ্রীবৃদ্ধি হয় ও স্থায়িত্ব ঘটে, সেইরূপ বিধিপূর্ব্বক সংস্কার করিলে মানুষের দেহমনের মলিনতা দূর হইয়া উৎকর্ষ সাধন হয়। এই সকল সংস্কার কার্য্যে দেবতা ও পিতৃগণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আকর্ষণের জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। অভ্যুদয় বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধও বলে। সকল বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের এই দশবিধ সংস্কার অবশ্য পালনীয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণ কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করেন নাই; শাস্ত্রবিধির প্রকৃতমর্ম্ম তাঁহার জীবনে স্ফুটতর ভাবে প্রকাশিত দেখা যায়।

কিন্তু তাঁহার বিবাহসংস্কারের অন্যরূপ বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল, ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবার পর। তাঁহার উক্তি :—

> "আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখ্‌তে পারে, বাক্সর ভিতর রাখ্‌তে পারে, জলের ভিতর ও রাখতে পারে, সোনার কিছু হয় না।

* পরাশর সংহিতা, অষ্টম অধ্যায় ২৩ শ্লোক।

কাঁচা মন সংসারে রাখ্‌তে গেলে, মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞানলাভ করে তবে সংসারে থাকৃতে হয়। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটা যেন দুধ। জলে দুধে রাখ্‌লে মিশে এক হয়ে যায়; আর খাঁটিদুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পাত্‌তে হয়। দই পেতে মাখ্‌ন তুল্‌তে হয়। মাখন্‌ তুলে জলের উপর রাখ্‌লে আর জলে মিশ্‌বে না। নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাকৃবে। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখ্‌ন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসার-জলের উপর রাখ্‌লে নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌বে।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যে অপূর্ব্ব আদর্শচরিত্র বিকশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই মহাশিক্ষা লাভ করি যে, মানুষ বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া ভগবান্‌ লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। জ্ঞান ভক্তি লাভ করিবার পর সংসারে প্রবেশ করিলে, মানুষ সংসারের অনিত্য সুখে আর মুগ্ধ হয় না। দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যেও ধৈর্য্য ধারণ ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। সে তখন বিদ্যারসংসার করিবার উপযুক্ত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

তাঁকে জেনে সংসার কল্লে বিবাহিতস্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন,—তাঁর সেবা দুজনে করে। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী বোধ করে ও সেবা করে। ছেলেদের খাওয়ায়

যেন গোপালকে খাওয়াচ্চে। তবে এরূপটী হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া উচিত। দুই জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে তা হলেই এটী সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই; না হলে সর্ব্বদা অমিল হয়। অ্যাক জনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয় তা হলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে! এমন লোকের হাতে পড়েছি! একদিনের জন্য সুখ হলো না! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পার্‌লুম না পর্‌তে পেলুম না বাছাদের পরাতে পার্‌লুম, না একখানা গয়না!—তুমি আমায় কি সুখে রেখেছ! কেবল চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর কচ্চেন। ও সব পাগলামি ছাড়ো।"

"জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাক্‌তে হয়। ভগবান্‌কে লাভ করে থাক্‌তে হয়। তখন কলঙ্কসাগরে ভাসে কলঙ্ক না লাগে গায়। আর তখন পাঁকাল মাছের মত থাক্‌তে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার—কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান্।" (ক)

বিজ্ঞানালোকদীপ্ত স্বতন্ত্রতাপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের বিবাহ, ইন্দ্রিয় বিলাস ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্য আইনানুযায়ী চুক্তি। খ্রীষ্টসমাজের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি,—সুখে বা দুঃখে, ঐশ্বর্য্যে বা দারিদ্র্যে, রোগে বা স্বাস্থ্যে আমরণ যেন না আমাদের বিচ্ছেদ হয়,—উচ্চভাব সংযুক্ত হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহার পালনে উক্ত

সমাজের উপেক্ষাই দেখা যায়। হিন্দুসমাজে পরিণয়সংস্কারে ধর্ম্ম প্রজা এবং সম্পত্তির জন্য সঙ্কল্প করিয়া, দারপরিগ্রহরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণান্তর বিশ্বদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতে হয়—"হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক, তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর, বৃহস্পতি তোমার চিত্ত আমার প্রতি বিশেষরূপে নিযুক্ত করুন। তুমি আমার সহচারিণী হও, আমি তোমার সখা হইলাম। আমার সহিত তোমার যে সৌখ্য সংস্থাপিত হইল কেহ যেন ছিন্ন করিতে না পারেন।" *

হিন্দু সমাজের ঈদৃশ উচ্চতর বিবাহব্রত পালনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের বিলাস নয় কিন্তু দেহসুখ ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভগবানের ভক্তভাবে মিলিত হইবে এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত তাঁহারই সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

বিবাহের পর যখন তাঁহার জ্ঞানোন্মাদ হইল, তাঁহার প্রথম চিন্তা হইয়াছিল—পরিবার। তাঁহার মনে হইল,—

> "পরিবারও এইরূপ খাবে দাবে থাক্‌বে। সংসার আর কেমন করে হবে? গলায় পৈতে পরিয়ে দ্যায়, আবার খুলে খুলে পড়ে যায়, সাম্‌লাতে পারি না।" (ক)

জ্ঞানোন্মাদ শান্তভাব ধারণ করিবার পর, তাঁহার পাঁচ বৎসরের বালকবৎ অবস্থা হইয়াছিল। স্ত্রীমাত্রকেই মার এক একটী রূপ দেখিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে, শ্রীসারদাদেবী তাঁহার

* বিবাহের পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন মন্ত্র।

সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে, তিনি ঐহিক ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "একদিন ভাবে রয়েছি, জিজ্ঞাসা কল্লে—'আমি তোমার কে?' আমি বল্লাম—আনন্দময়ী!" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ। তাঁহার সংসার বিস্তার সংসার। বাল্যকালে পিতা ও মাতাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী মনে করিয়া পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছেন; যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রীকে আনন্দময়ী মাতৃজ্ঞানে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ কামগন্ধহীন প্রেমানন্দের উপভোগ। তাঁহার সংসার ভক্ত ও ভগবানের লীলাভূমি। জগৎকে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যুন্নত আদর্শ প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই কি তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন?

তন্ত্রমতের সাধন।

সম্ভবতঃ বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে, ১২৬৬ সালের শেষে, শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা বলিয়াছি, রামকুমারের মৃত্যুর পর হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃব্যপুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায় (হলধারী) 'কালীঘরে' পূজা করিতেছিলেন। রামতারক শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৺কালীর পূজায় বলিদান দিতে হয় বলিয়া, বৈষ্ণবমতাবলম্বী হলধারী সানুরাগে পূজা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পর, তাঁহাকে 'কালীঘরে' পূজা করিতে অনুমতি দিয়া, আপনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় আগমন করিলেন।

প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ৺দেবীর পূজায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কোন শক্তিসাধকের নিকট শ্রীশ্রীভবতারিণীর সম্মুখে কালীমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় গুরু সন্নিধানে মন্ত্র শ্রবণ মাত্র, তাঁহার ভাবসমাধি হইয়াছিল, এবং ভাবাবস্থায় তিনি দেবীর প্রতিমার পার্শ্বে বরাভয়করা দেবীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণের ৺কালীপ্রতিমা পূজা অপূর্ব্ব জীবন্ত পূজা। তাঁহার পূজাকার্য্য বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতিমাপূজা মিথ্যা কল্পনা নয়। তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ী

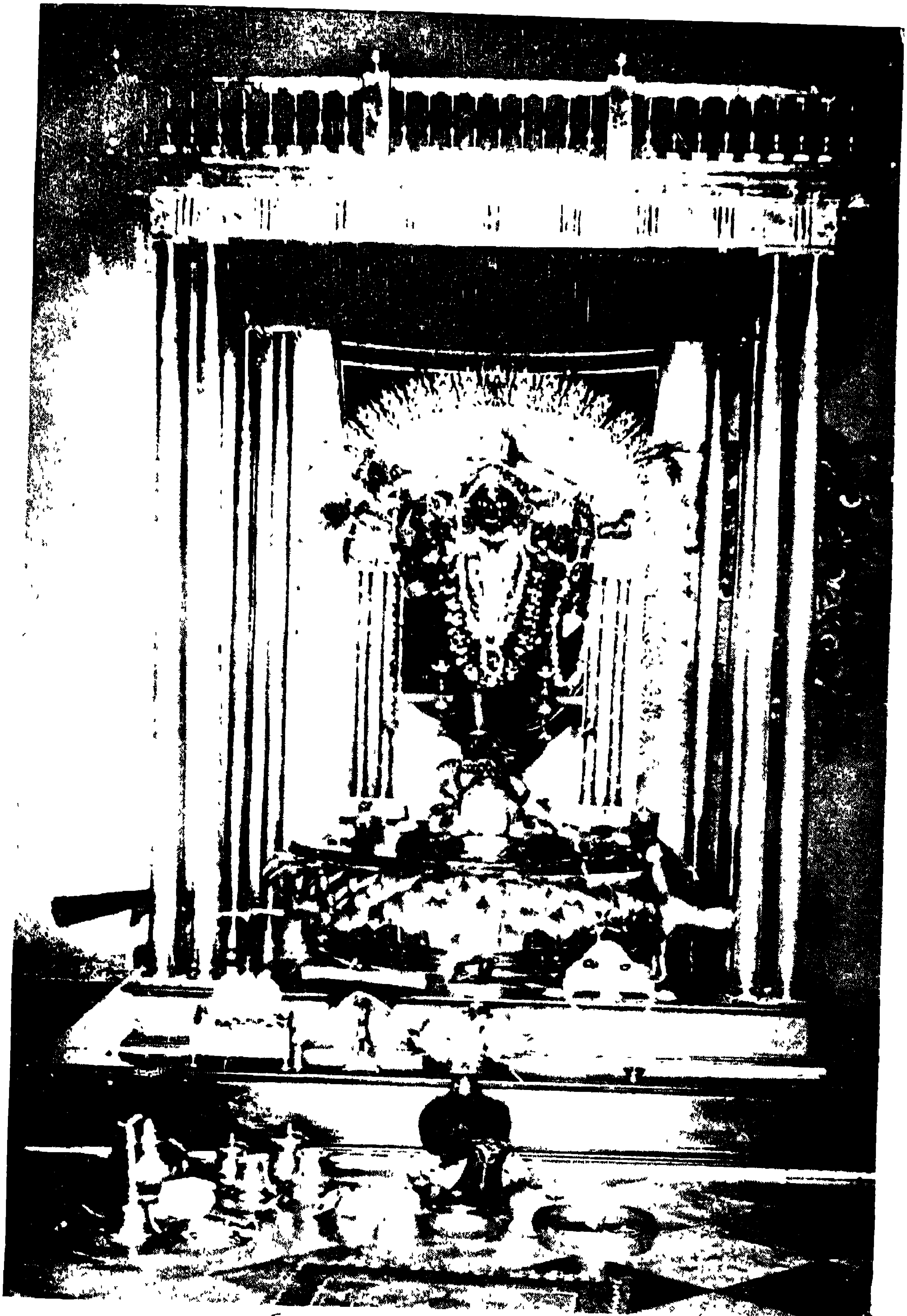

দক্ষিণেশ্বরের ৬ শ্রীশ্রীকালীমাতা

(শ্রীশ্রীভবতারিণী)

পূজা করিলে সাধকের অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। অসভ্য বা সভ্য কোন সমাজের লোকেই ভ্রান্তি বা অজ্ঞান বশতঃ নিজেদের মনগড়া মিথ্যা কল্পনা করিয়া কোন কিছু পূজা করে না। হিন্দুর প্রতিমাপূজা কেবল খড় কাঠ মাটি প্রস্তরের পূজা নয়। প্রতিমায় ভগবানের পূজা, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"মাটির প্রতিমা পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে। তিনি অন্তর্যামী,—তিনি জানেন যে প্রতিমা পূজাতে তাঁকেই ডাকা হচ্চে। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন।"

"যেমন শোলার আতা দেখ্‌লে সত্যকার আতা মনে পড়ে, সেইরূপ প্রতিমা দেখ্‌লে সেই চিন্ময়ী ঈশ্বরীরই উদ্দীপন হয়। প্রতিমা মার চিন্ময়রূপেরই প্রতিরূপ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখ্‌লে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে সত্যের উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখ্‌লে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। প্রতিমায় ভগবানের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব মান্‌তে হয়। প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটী জিনিষের দরকার। প্রথম পূজারির ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। পূজার সময় প্রতিমাকে কাঠ মাটি বলে জ্ঞান থাক্‌লে কাঠ মাটিরই পূজা হয়। ঈশ্বর বোধ থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।"

"প্রতিমাপূজায় দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে অস্তি, ভাতি আর প্রিয়, সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তিনি ছাড়া কোন জিনিষ নাই। তিনিই এই সব হয়েছেন। কোন কোন জিনিষে বেশী প্রকাশ। সুলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাকবে, গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাকবে তাহলে ভগবানের পূজা হয়।"

"আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলে কতদিন? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস হয়। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বরলাভ হলে আর প্রতিমা পূজায় কি দরকার?"

"আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন,—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম,—সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না!" (ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা মহাসত্য যে, ভক্তের অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপন করিবার জন্য তাহার মানসিক প্রকৃতির অনুরূপ নানাবিধ আলম্বন ঈশ্বরই কল্পনা করেন, এবং সাধকের ভক্তির আকর্ষণে প্রতিমাদিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার ভক্তিপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনমুখ এক করে, ভক্তিভাবে ব্যাকুলঅন্তরে ভগবান্‌কে প্রতিমাদিতে পূজা করিলে, তিনি যে সাক্ষাৎকার হন ও ভক্তের অভীষ্টপূর্ণ করেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি,—

"তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর

রূপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা, নানারূপে দর্শন দ্যান। তিনি যে ভক্তবৎসল! ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে সেইরূপে তিনি দ্যাখা দ্যান!" (ক)

শাস্ত্রের বিধি অনুসারে পূজা করিতে হইলে, প্রথমে সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে, নিজ শক্তি অনুসারে, কিন্তু বিত্তশাঠ্য প্রকাশ না করিয়া, শুদ্ধাচারে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। পূজার স্থানে, আসনে, জলে, সমস্ত পূজার দ্রব্যে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিবার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ। নিজের অপবিত্র দেহ মনের সংস্কারসকল ভস্মীভূত হইয়া নূতন দেবদেহ গঠিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা, অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি, দেবপূজার প্রধান অনুষ্ঠান। শাস্ত্র বলেন দেবতা হইয়া দেবপূজা করিবে। পূজার সময় মনকে অন্য সর্ব্ববিষয়চিন্তা পরিশূন্য ও কেবল দেবভাবে ভাবিত করিয়া দেবপূজা করিতে হইবে। এই ভাবে দেবপূজা করিলে সাধক অবিলম্বে অদ্বৈতভাবে উপনীত হন। ইষ্টমূর্ত্তিতে সমাহিত চিত্ত হইয়া এবং তাঁহাকে হৃদয়পীঠে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবভাবেপরিশুদ্ধ প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি উৎসর্গ করাকে মানষ পূজা বলে। আর প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব অনুভব ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দেবভাবপূর্ণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অন্নাদি প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনকে বাহ্যপূজা বলে। মনের একাগ্রতা ও ভক্তিই ইহার মূল। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ভক্তিপূর্ব্বক যে আমাকে পত্র পুষ্প ফল বা জল যাহা কিছু অর্পণ করে সেই শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি

গ্রহণ করিয়া থাকি।" * ভগবৎগুণগান, তাঁহার নিকট জ্ঞান ভক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা, তাঁহার দর্শনলাভের জন্য কাতরতা, এই সকল কর্ম্ম ভগবানের কৃপালাভ করিবার সাধনস্বরূপ। এই সমস্ত নিষ্কামভাবে করিতে হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কুন্তিনন্দন! তুমি যে কার্য্য কর, যে হোম কর, যে দান কর, ও যে তপস্যা কর সেই সকলই আমাতে অর্পণ কর। এই প্রকার কর্ম্ম করিতে করিতে শুভাশুভ ফলের হেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। এই প্রকারে সন্ন্যাসযোগে যুক্তাত্মা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, দেহ পতিত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" †

আমরা বলিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ৺কালীপ্রতিমার জীবন্তপূজা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তিনি স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক স্বয়ং বিল্বপত্র দূর্ব্বা ও পুষ্পচয়ন করিয়া স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া মাকে মনের মত করিয়া সাজাইতেন। যখন পূজা করিতে বসিতেন তাঁহার ভক্তির মত্ততা ও তন্ময়ভাব দেখিয়া অপরলোক নিকটে যাইতে সাহস করিত না। তাঁহার একাগ্রতা এরূপ গভীর হইত যে, ভূতশুদ্ধি করিবার কালে তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেন, কুণ্ডলিনী স্বতঃই জাগরিতা হইয়া সহস্রার গত হইতেছেন এবং তাঁহার নিজ দেহের পরিবর্ত্তে বর্ণময়ী মাতৃকাদেহ উজ্জ্বলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। পূজা করিবার সময় দেবীরভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে,

---

* গীতা নবম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক।

† গীতা নবম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক।

অনেক সময় পুষ্প চন্দনাদি প্রতিমার পাদপদ্মে না দিয়া নিজের মস্তকে প্রদান করিতেন। মার নামগুণগান তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ। গান গাহিয়া মাকে শুনাইতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত। ভোগ নিবেদন পূর্ব্বক মাকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এরূপ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেন, যেন মা প্রকৃতই আহার করিতেছেন। কিছুদিন এইরূপে পূজা করিয়া তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল, যেন সকল বস্তুতেই তাঁহার মার সত্তা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে—এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব! তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো। ফুল তুল্‌চি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটী ফুলের তোড়া—সম্মুখে বিরাট পূজা হয়ে গেছে! সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর ফুলের তোড়া শোভা কচ্ছে! সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন কর্ত্তে লাগ্‌লাম,—পূজা উঠে গেল। এই বেল গাছ—বেল পাতা তুল্‌তে আস্‌তাম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল,—দেখ্‌লাম, গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো! দূর্ব্বা তুল্‌তে গিয়ে দেখি আর সে রকম করে তুল্‌তে পারি না। তখন রোক্ করে তুল্‌তে গেলাম।" (ক)

ক্রমে তাঁহার পূজা জপ ধ্যান প্রগাঢ় হইতে লাগিল ও

সময়ে সময়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান হইতে লাগিলেন। পূজা করিতে বসিয়া বহুকাল অতীত । গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া স্থাণুবৎ অচলভাবে বসিয়া থাকেন। ধ্যানের সময় কিরূপ অনুভব হইত তাহা বলিয়াছেন,—

"গভীর ধ্যানে ব্যাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সাম্‌নে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না; বাহিরে পড়ে থাকে। মন বহির্মুখ থাকে না,—যেন বারবাড়ীর কপাট ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়,—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—বাহিরে পড়ে থাকবে। ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে আমার কত কি দর্শন হতো।"

তিনি জপের বিষয় এইরূপ বলিতেন,—

"জপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। এক মনে নাম কর্ত্তে কর্ত্তে, জপ কর্ত্তে কর্ত্তে, তাঁর রূপ দর্শন হয়, —তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। যেমন গঙ্গার গর্ভে ডুবান বাহাদুরি কাঠ আছে,—শিকল দিয়ে বাঁধা। ডুব মেরে সেই শিকলের এক এক পাব্ ধরে ধরে গেলে শেষে বাহাদুরি কাঠকে স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ কর্ত্তে কর্ত্তে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।" (ক)

পূজার সময় ধ্যান জপ করিতে করিতে অহরহঃ তাঁহার ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হইতে লাগিল। আরতির সময় প্রতিমায় ঈশ্বরীয় দিব্য আবির্ভাব দেখিয়া, ভাবোন্মত্ত হইতে লাগিলেন,—

আরতি আর শেষ হয় না! মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আরক্তবর্ণ, চক্ষে দিব্যদৃষ্টি, অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ষণে বুক ভাসিয়া যাইতেছে! একদিন পূজাকালে এই প্রকার গভীর আবেশে সহসা তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। তাঁহার কি দিব্যদর্শন লাভ হইয়াছিল তিনি এইরূপ বলিতেন,—

> "ঈশ্বর দর্শন কল্লে কর্ম্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা কর্ত্তাম্, হঠাৎ মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মাই সব হয়েছেন! দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময়! কোশাকুশী চিন্ময়! ঘরের চৌকাট চিন্ময়! মারবেল পাথর চিন্ময়! মানুষ জীব জন্তু সব চিন্ময়! ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচ্চিদানন্দ রসে! কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোক্‌কে দেখ্‌লাম; কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বল্‌ জ্বল্‌ কচ্চে দেখ্‌লাম। তখন উন্মত্তের ন্যায় পুষ্পবর্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌লাম! যা দেখি তাই পূজা করি!" (ক)

আমরা দেখিয়াছি প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্য তাঁহার কিরূপ প্রাণের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। কি উপায়ে ভগবান্ লাভ হইতে পারে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহাকে সাধনপথ দেখাইয়া দিবার কেহই ছিল না। তাঁহার সরলহৃদয়ে যাহা উদয় হইত তিনি তাহাই করিতেন। তিনি একান্তে দিবারাত্র বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া মাকে কেবল ডাকিয়াছিলেন। মার দর্শন পাইবার জন্য তাঁহার

প্রাণ কিরূপ অস্থির হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতে কিরূপ আর্ত্তনাদ উঠিত আমরা দেখিয়াছি। একমাত্র প্রাণের ব্যাকুলতায় অবশেষে তিনি মার প্রত্যক্ষদর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে নানাবিধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধনা করিতে করিতে বিবিধ ঈশ্বরীয়রূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু এতদিন মাকে তিনি দূর হইতেই দর্শন করিতেছিলেন। এত দিন দেখিতেছিলেন যে, মা আর তিনি ভিন্ন। তাঁহার মা,—তিনি ছেলে। এতদিন মাকে নানারূপে দেখিলেন—কখন রাম, কখন শিব কখন শ্রীকৃষ্ণ কখন বা সীতা গৌরী রাধারূপে, আবার কখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র অন্তর্যামী রূপে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এবার মা, তাঁহাকে স্বয়ং দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বাহিরে জড়জীবরূপে বর্ত্তমান। মা, তাঁহাকে দেখাইলেন যে, জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব তিনিই হইয়াছেন। সবই তাঁহারই এক একটী রূপ! সমস্ত বস্তুই তাঁহার চিন্ময়ী মা! এবার সেই সর্ব্বশক্তিময়ী তাঁহাকে বিশ্বরূপে দেখা দিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে মা, নিজ শক্তিতে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন! তিনি দেখিলেন.—জগৎ শক্তিময়, সকলেরই ভিতর মার শক্তি 'জ্বল জ্বল কচ্চে!' এইরূপ সর্ব্বভূতে মহাশক্তির অধিষ্ঠান অদ্বৈতভাবে প্রত্যক্ষ করাই, তন্ত্রের শক্তিপূজার চরম ফল।

মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া তাঁহার পুনর্ব্বার প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। তিনি আর পূজা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এই অবস্থায় বোধ হচ্চে, ঠিক দেখ্‌ছি, তিনিই সব হয়েছেন। ত্যজ্য গ্রাহ্য থাকে না। যখন এই অবস্থা হলো তখন মা কালীকে পূজা কর্ত্তে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না।" (ক)

তাঁহার বৈধপূজাকর্ম্ম চিরদিনের মত মা উঠাইয়া দিলেন। শাস্ত্রমতে দেবভাবে ভাবিত হইয়া প্রতিমাপূজা তাঁহার সিদ্ধ হইল। এখন তিনি সাক্ষাৎ দেখিলেন যে, পূজার দ্রব্যও তাঁহার চিন্ময়ী মা, তাঁহার অন্তরে সেই চিন্ময়ী মা, তাঁহার সম্মুখে চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমা, —কে আর কাহাকে পূজা করিবে! তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন—"যাহার দ্বারা হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা ব্রহ্ম, হবন দ্রব্যও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয় তাহাও ব্রহ্ম, হবন ক্রিয়াও ব্রহ্ম, এবং যে হবন করিতেছে সেও ব্রহ্ম।" *

নিয়মিত পূজা করিতে তিনি ক্রমশঃ অক্ষম হইলেন। কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ দেখিত যে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিনি আর পূজা করেন না। সময়ে অসময়ে তিনি কালীঘরে আগমন করেন। পূজার কোন নিয়ম নাই। প্রতিমার নিকট কখন ধ্যানমগ্ন হইয়া জড়বৎ উপবিষ্ট; কখন কেবল চামরই ব্যাজন করেন; কখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাহিতে থাকেন, কখন প্রতিমার সহিত সজীবদেবী জ্ঞানে কথা কন, ছোট ছেলের মত আব্দার করেন; কখন বা দেবীর পূজার পুষ্পমাল্য আপনার কণ্ঠে ধারণ করিয়া চন্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করেন। একদিন দেবীকে ভোগ নিবেদন না করিয়া, উপস্থিত একটী বিড়ালকে সেই ভোগ খাইতে

* গীতা, চতুর্থ অধ্যায় ২৪ শ্লোক।

দিলেন। মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারী এই সকল উন্মত্তের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিরক্তভাবে মথুর বাবুর নিকট সংবাদ দিলেন, যে, কালীমন্দিরে ৺কালীমাতার পূজা ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা সমস্তই নষ্ট হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—

> "আমি বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়ে ছিলাম। দেখ্লাম মাই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্য্যন্ত! তখন খাজাঞ্চী সেজ বাবুকে চিঠি লিখ্লে যে, ভট্চাজ্জি মশাই ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজ বাবু আমার অবস্থা বুঝতো। পত্রের উত্তরে লিখ্লে, উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো না। তাঁকে লাভ কল্লে এই গুলি ঠিক দেখা যায়—তিনিই জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন! বিচার করে অ্যাক্ রকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দ্যান, তখন আর অ্যাক্ রকম দ্যাখা যায়।" (ক)

তিনি এক সময় বলিয়া ছিলেন যে, 'কালীঘরে' শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা তিনি ছয় মাস মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি পূর্ব্বক পূজা পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার নিজের স্বেচ্ছানুরূপ মার পূজার বিরাম হয় নাই। তাঁহার দ্বারা নিত্যপূজা অসম্ভব দেখিয়া মথুর বাবু হৃদয়কে ৺কালীমাতার পূজায় নিযুক্ত করিলেন, এবং চিকিৎসা দ্বারা উন্মাদ অবস্থার উপশম হইতে পারে বিবেচনায় কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার সাধারণ উন্মাদরোগ স্থির করিয়া তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে

কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। শুনা যায়, কোন দিবস তিনি হৃদয়ের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তথায় পূর্ব্ববঙ্গের অপর এক জন কবিরাজ তাঁহার পীড়ার লক্ষণ সকল দেখিয়া যোগজব্যাধি বলিয়া অনুমান করেন এবং সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা ইহা আরোগ্য হইবে না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অবশেষে মথুর বাবু ও অন্যান্য সকলে তাঁহার উন্মাদের এক কারণ সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয়ের পরামর্শে একদিন এক বারবিলাসিনীকে আনাইয়া তাঁহার ঘরে প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমার এই অবস্থার পর আমাকে বিড়বার জন্য, আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন বেশ্যা এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি মা, মা, করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লাম—দাদা দেখ্‌বে এস, ঘরে কে এসেছে। হলধারী আর আর সব লোক্‌কে বলে দিলাম" (ক)

যদিও বারাঙ্গনার আকর্ষণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই কিন্তু এরূপ ঘৃণিত পরীক্ষা তাঁহাকে বিশেষ চিন্তাকুল করিয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির বীজ অন্তরে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও পতনের সম্ভাবনা। অবিদ্যারূপিণী কামিনীর মোহিনীমায়া হইতে সাবধান হইবার জন্য তিনি বলিতেছেন :—

"ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না? কামিনীকাঞ্চন মাঝে আড়াল আছে বলে। কামিনীকাঞ্চন এই দুটী ঈশ্বরের

পথে বিঘ্ন—ঈশ্বরকে দেখ্‌তে দ্যায় না। মেয়েমানুষের আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দ্যায়—কিসে পতন হয় পুরুষ জান্‌তে পারে না। এই কামিনীকাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ। যে কামিনীকাঞ্চনের সুখ ত্যাগ করেছে ঈশ্বর তার অতি নিকট।”

“কামিনীকাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়া দ্যায়। কামিনীকাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তারজন্য পরের দাসত্ব কর্ত্তে হয়,—স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মত কাজ কর্ত্তে পার না। দ্যাখ অত সব পাশকরা পণ্ডিত, পরের চাকরী স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছে। মনিবের দুবেলা লাথি খায়। এর কারণ কেবল কামিনী! বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোলবার যো নাই। তাই অত অপমান, অত দাসত্বের যন্ত্রণা!”

“কামিনীকাঞ্চনই মায়া। স্ত্রী মায়ারূপিণী! যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝ্‌তে পারে না। ওর ভিতর অনেকদিন থাক্‌লে হুঁস চলে যায়। যাকে ভূতে পায় সে জান্‌তে পারে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে! সে ভাবে আমি বেশ আছি! অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের কি মোহিনী শক্তি! তারা পুরুষগুলকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দ্যায়। বড় বাবুর হাতে অনেক কর্ম্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বল্লে—গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম্ম হবে। গোলাপী বড় বাবুর রক্ষিত বেশ্যা!

কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করে। এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে।"

কামিনীকাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকি রইল কি? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ!"

কামিনীর মোহিনীশক্তিদ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বরপথ হইতে বিমুখ করিবার জন্য সকলের চেষ্টা দেখিয়া, মন হইতে কামিনীর প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটনের জন্য, তাঁহার প্রাণে উৎকট জ্বালা উপস্থিত হইল। চিদানন্দময়ী মাকে কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"এই অবস্থায় মা, মা, বলে কাঁদ্‌তাম, কেঁদে কেঁদে বলতাম্,— মা! রক্ষা কর, মা! আমায় নিখাদ কর, মা! যেন সৎ থেকে অসৎএ মন না যায়।" (ক)

দুর্জ্জয় কাম রিপুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ কতদূর দুরূহ তাহা বলিতেছেন,—

"কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয়মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদ্‌তে লাগলাম। বল্লাম, মা! যদি তা হয় তা হলে গলায় ছুরি দেব!"

ঈশ্বরেচ্ছায় এই সময় এক ভৈরবীবেশধারিণী ব্রাহ্মণী কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভৈরবী প্রৌঢ়াবয়স্কা ও ব্রহ্ম-চারিণী। কেহ বলেন তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে আসিয়া, কালীবাড়ীর নিকট দেবমণ্ডলের ঘাটে একটী ঘরে আসন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মন্দিরে আসিয়া দর্শনাদি

করিয়া যাইতেন। ব্রহ্মচারিণীর পূর্ব্বনিবাস ও বংশাদি পরিচয় কিছুই জানা নাই। এই মাত্র শুনা যায় যে, তিনি তন্ত্রোক্ত সাধনায় বিশেষ পারদর্শিনী এবং বৈষ্ণবতন্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থাদিতে সুশিক্ষিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল বিদুষী নন,—"ব্রাহ্মণী বিদ্যার সাক্ষাৎমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সরস্বতী।" শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় হইবার পর, ভৈরবী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এক অলৌকিক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময় তাঁহার হৃদয় যে অভিনব উদ্বেগে অস্থির হইতেছিল, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তন্ত্রমতে সাধনা করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি দীক্ষা গুরুর ন্যায় তাঁহাকে সাধন পথে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সাধন করিবেন কিনা শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মন্দিরে গমন করিলেন। এবং মার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কামিনীর আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, তাঁহার তন্ত্রমতের সাধনা আরম্ভ হইল।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে, তখন তাঁহার অন্তরে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি কোথায়? তাঁহার তন্ত্রের সাধন কি জন্য? আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি সরল শুদ্ধহৃদয়ের পরিচালনে সকল কার্য্য করিতেন; বুদ্ধির প্রেরণায়, যুক্তি বিচার করিয়া কোন কিছু করিতেন না। বাল্যভাবের উত্তেজনায় যেমন শূদ্রের নিকট উপনয়নকালে ভিক্ষা লইয়াছিলেন, তাহারই প্রবর্ত্তনায় প্রেমোন্মাদ অবস্থায় বিবাহ করিতে অসম্মত হন নাই এবং এখন তাহারই

প্রেরণায় তন্ত্রের সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনি বালকস্বভাবে মার কাছে ছুটিয়া গেলেন মাকে জিজ্ঞাসা করিতে—সাধন করিবেন কিনা। মা, তাঁহাকে সাধন করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যুক্তি বিচার এইস্থানেই শেষ হইল। কিন্তু মানববুদ্ধির অগোচর ঈশ্বরেচ্ছার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে অজ্ঞানান্ধ মানব কি করিয়া সক্ষম হইবে? মনে হয়, সেই সর্ব্বভাবময়ী মহামায়ার ইচ্ছায়, তাঁহার ভিতর দিয়া যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অভিনব ভাবসাধন, জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, তাঁহার তন্ত্রমতের সাধনার তাহাই গূঢ় রহস্য!

হিন্দুশাস্ত্র মতে বর্ত্তমান সমাজে যুগধর্ম্মানুযায়ী কলির প্রাধান্য। এখন ঘোর কলিকাল। মানুষ একালে কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে অনুরক্ত। তন্ত্রে কলিকালের অপরাপর লক্ষণের মধ্যে যাহা বিশেষরূপে প্রবল, তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"যৎকালে দেখিবে যে মনুষ্যগণ কামমোহিত ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু মিত্র প্রভৃতির বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তখনই বুঝিবে যে কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যৎকালে ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ সামান্য ধনলোভে অন্ধ হইয়া, পরস্পর বিবাদ কলহ ও প্রহার পর্য্যন্ত করিবে তখনই জানিবে যে কলি সাতিশয় প্রবল হইয়াছে। যখন দেখিবে প্রকাশ্যরূপে মদ্যমাংস ভক্ষণ করিলেও কেহ নিন্দা বা দণ্ড প্রদান করিবে না, অথচ সকলে গূঢ়রূপে সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন বিবেচনা করিবে যে প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। *

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস ৫২ ৫৪, ৫৫ শ্লোক।

এই সকল মদ্যমাংসপরায়ণ, কামিনীকাঞ্চনাসক্ত ও কেবল দেহসুখে নিরত জীবের মোক্ষলাভের উপায় কি? তন্ত্র বলেন,—"তন্ত্রোক্ত পথ যেমন সুখভোগ ও মোক্ষ এই উভয়বিধ ফল প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেরূপ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও মোক্ষের সাধক অন্য কোন পথ নাই।" *

তন্ত্রমতের সাধক বলেন,—

"তন্ত্র ভোগের বস্তুর সঙ্গে সাধনার যোগ করিয়া, ভোগবাসনার নিবৃত্তি করিবার উপদেশ দেন। ভোগাসক্তি নিবৃত্তি হইলেই দিব্যভাব উপস্থিত হয় এবং মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে—"যিনি বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত, তিনি কখন মোক্ষফল প্রাপ্ত হন না; এবং যিনি মোক্ষফলাকাঙ্ক্ষী তিনি সর্ব্বসময়ই বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। পরন্তু, যিনি তন্ত্রোক্তবিধান অনুসারে দেবী পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহার ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত।" †

সংসারসুখাসক্ত মানব যে সকল ভোগ্যবস্তু লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছে, যাহা মোক্ষপথের একান্ত বিরোধী, তন্ত্রে তাহাই গ্রহণ করিয়া, সেই সকল ভোগসুখ ত্যাগ করিবার জন্য সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—"হে আদ্যে! শক্তি পূজায় বিহিত মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিলে তাহা অভিচারস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণঘাতক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৪র্থ উল্লাস ২০ শ্লোক।

† মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের টিকায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন

তাহাতে কোন ক্রমেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না ; প্রত্যুত পদে পদে বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে। প্রস্তরের উপর শস্যবপন করিলে যেমন তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজাতেও কোনরূপ ফলোদয় হয় না।"*

পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধনার লৌকিকযুক্তি তান্ত্রিক কুলাচার সাধকগণ এইরূপ প্রদান করেন—

"শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"যে কালকূট বিষ দ্বারা সকলেরই জীবন সংহার হয়, চিকিৎসক সেই কালকূট বিষ প্রয়োগ করিয়াই রোগীর জীবন রক্ষা করেন।" অস্মদ্দেশে ও সাধারণ প্রবাদ আছে যে, "বিষস্য বিষমৌষধম্" এবং 'বিষে বিষক্ষয়'। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, এই জগতী তলে কোন্ দ্রব্য দ্বারা মনুষ্য ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, পাপে মগ্ন, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, অকালে কালগ্রস্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন, নিতান্ত অপদার্থ ও সকলের হেয় হয়? ইহার মধ্যে প্রথম মদ্য ও দ্বিতীয় রমণী। মাংস মৎস্য এবং মুদ্রা অর্থাৎ মুড়ি ছোলাভাজা প্রভৃতি উপদংশ (চাট্) সমুদয় তাহার সহকারী। এই পঞ্চতত্ত্ব সংসাররূপ দুশ্চিকিৎস্য ভীষণ রোগের নিদান। মদ্যাদির প্রভাবে মনুষ্য মনুষ্যত্ব বিহীন ও অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে। মদ্য বা রমণীর এতদূর মোহিনীশক্তি যে পরম ধার্ম্মিক সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। এ স্থলে শিব বিষপ্রয়োগ দ্বারাই বিষনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শিবের এই চিকিৎসা অব্যর্থ ও আশু ফলদায়ক।

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পঞ্চমোল্লাস ২২, ২৩, ২৪ শ্লোক।

যাহার মদ্যপিপাসা ও পরনারী-সঙ্গম-প্রবৃত্তি থাকে, এই চিকিৎসার অল্পসময় মধ্যেই তাহা বিদূরিত হইয়া যায়; পরন্তু চিকিৎসক (গুরু) পাকা হওয়া আবশ্যক। বিষ প্রয়োগ করিবার সময় কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেই রোগী মারা যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য শিব বলিয়াছেন, খড়্গের উপর দিয়া গমন করা এবং ব্যাঘ্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করা অপেক্ষাও কুলাচার পথ অতীব কঠিন। আমরা পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে একটী লৌকিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম মাত্র; কিন্তু এ বিষয়ে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সাধন বিষয়ে উক্ত পঞ্চতত্ত্ব সকলের পক্ষেই অপরিহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ সেই আধ্যাত্মিক যুক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। আমরা দেখিতেছি, অনেকে কৌল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; অথচ কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত মাতাল বা লম্পট দেখা যায়। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি কৌল নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি মাতাল বা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টদেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ্য ভাবে প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গমহাপ্রভু নিত্যানন্দমহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রকৃত কৌলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। "ভোগ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা কথনই ভোগ লালসা নিবৃত্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেরূপ অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; উপভোগ দ্বারা ভোগ লালসাও সেইরূপ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কদাপি নিবৃত্ত হয় না।" * এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য

* মনুসংহিতা

বলিয়াই স্বীকার করি। বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিতেছে না; কিন্তু বৈদ্য যে বিষ প্রয়োগ করেন, তাহার ভিতর এরূপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না; প্রত্যুত তদ্বারা শরীরস্থ বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। গুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মদ্যাদিরূপ বিষদ্বারা সংসার বিষ হরণ করেন, তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ আছে। *

যে মহাশক্তির আরাধনা করিয়া কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি মন হইতে ত্যাগ হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই লাভ হইয়া থাকে তাঁহার স্বরূপ কি? সর্ব্বজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রমান অপৌরুষেয় বেদে স্বয়ং বাগ্‌দেবী পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া বলিতেছেন—

১। আমিই রুদ্র ও বসুগণের সহিত এবং আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের সহিত তাদাত্মভাবে বিচরণ করি। আমিই মিত্র এবং বরুণ উভয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এবং ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করিতেছি। অর্থাৎ শুক্তিকায় রজতের ন্যায়, আমাতেই সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ অবস্থিত। শুক্তিকাকে যেরূপ ভ্রম বশতঃ রজত বলিয়া মনে করে, সেইরূপ আমাকে না জানিয়া রুদ্রাদিদেবগণ সত্য বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আমা ভিন্ন জগতে কোনও পদার্থ নাই। রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ আমারই রূপভেদ। ইহাই মর্ম্মার্থ।

২। আমিই পূজাহীনও ব্রতহীনগণের বিনাশকারী সোমকে (চন্দ্রকে), ত্বষ্টাকে (বিশ্বকর্ম্মাকে) পূষাকে ও ভগকে ভরণ

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের টীকায়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।

করি। যে যজমান সোমরস অভিষব করে অর্থাৎ যে ভক্তিরস যুক্ত, এবং দেবতার উদ্দেশে শোভনহবিঃ অর্পণ করে, তাহার জন্য যাগফল রূপ ধন অমিই ধারণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমিই কর্ম্মফলদাত্রী।

৩। আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী এবং উপাসকগণের কর্ম্ম ফলরূপ ধনদাত্রী। যে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করণীয়, তাঁহাকে আমি স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছি। অতএব আমি যজ্ঞার্হগণের মধ্যে প্রথমা এবং বহুভাবে প্রপঞ্চাত্মরূপে অবস্থিতা। আমি বহু প্রাণীকে জীবভাবে আত্মাতে প্রবেশ করাইয়া থাকি। আমাকে দেবগণ বহুস্থানে স্থিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে বৈশ্বরূপে অবস্থান করাতে দেবগণ যাহা যাহা করে, তাহা আমাকেই করিয়া থাকে। ইহাই মন্ত্রার্থ।

৪। যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ভোক্তৃশক্তিরূপা যে আমি, আমারই সাহায্যে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে অবলোকন করে, যে শ্বাসোচ্ছ্বাসরূপ ব্যাপার সাধন করে, যে কথিত বাক্য শ্রবণ করে, ইহারা সকলেই মদীয় তৎ তৎ শক্তির প্রভাবে উক্ত কার্য্য-সকল করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমাকে অবগত নহে, তাহারা মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানরহিত হওয়াতে সংসারে হীনদশা প্রাপ্ত হয়। হে সুধী! আমি যাহা বলিব তাহা কেবল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঈদৃশ ব্রহ্মাত্মক বস্তুর বিষয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি।

৫। আমি স্বয়ং এই ব্রহ্মাত্মক বস্তুর বিষয় উপদেশ দিতেছি। এই বস্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত। যে যে

পুরুষকে আমি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই পুরুষকে সর্ব্বপ্রধান করিয়া থাকি। তাহাকে স্রষ্টা (ব্রহ্মা) তাহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষি এবং তাহাকে শোভনপ্রজ্ঞ করিয়া থাকি।

৬। ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ্টা, হিংসক অসুরকে বধ করিবার জন্য, রুদ্রের ধনুকের জ্যা আমি আরোপ করিয়া দিয়াছিলাম। আমিই স্তোতৃজনের নিমিত্ত শক্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তর্যামীরূপে আমিই প্রবিষ্ট হইয়াছি।

৭। পরমাত্মার পরমকারণভূত মস্তকে, আমিই দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাতে আকাশাদি কার্য্যসকল তন্তুতে পটের ন্যায় অভেদসম্বন্ধে অবস্থান করিতেছে। ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তির মধ্যে যে চৈতন্য ব্রহ্ম, তাহাই আমার কারণ। যে হেতু আমি এইরূপ, সেই হেতু সমস্ত প্রাণিবর্গে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। আরও দূরবর্ত্তী স্বর্লোক অর্থাৎ কৃৎস্ন বিকারজাত জগৎ, কারণভূত মায়াত্মক মদীয় দেহের দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকি।

৮। আমিই সমস্ত ভূতবর্গকে কারণরূপে উৎপাদন করিয়া স্বেচ্ছায়, পরকর্তৃক অপ্রেরিত হইয়া, বায়ুর ন্যায় প্রবর্ত্তিত হই। আকাশের উপরিভাগে এবং এই পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাতের উপরিভাগে বর্ত্তমানা, অসঙ্গ উদাসীন কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যরূপা আমি, মহিমাদ্বারা সর্ব্ব জগতের আত্মারূপে সম্ভূতা হই।*

পুরাণে উক্ত আছে, ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করিতেছেন,—

"তুমিই দেবগণের হবির্দান মন্ত্র স্বাহা, পিতৃগণের হবির্দান

* ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত, পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মন্ত্র স্বধা এবং যজ্ঞের হবির্দান মন্ত্র বোষট্। তুমিই অমৃত। হে নিত্যে! হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত এই ত্রিবিধ মাত্রাযুক্ত স্বরবর্ণ, তুমিই, আবার যাহার উচ্চারণ হয় না, সেই অর্দ্ধমাত্রা ব্যঞ্জন বর্ণও তুমি। তুমিই গায়ত্রী। তুমি সকলেরই মাতৃস্বরূপা। তুমিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছ। সৃষ্টি পালন ও লয় সমস্তই তোমা হইতে হইতেছে। তুমি সৃষ্টি স্বরূপা, স্থিতি স্বরূপা ও সংহার স্বরূপা। তুমি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহ মহাদেবশক্তি ও মহা অসুরশক্তি। সত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ আশ্রয় করিয়া তুমিই সকলের কারণ। তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি দারুণ মোহরাত্রি। তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই হ্রী, তুমিই তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপিণী। লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি শান্তিসুখ বিধায়িনী ও ক্ষমা তুমিই। খড়্গ শূলাদি অস্ত্রধারিণী তোমার ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি, আবার অতি সুন্দর পরমানন্দময়ীরূপ তোমারই। তুমি পরাপর সকলেরই পরম নিয়ন্ত্রী। সদসৎ যাহা কিছু বিদ্যমান সকল বস্তুরই তুমি শক্তি। সুতরাং তোমার স্তুতি কি করিব!" *

তন্ত্রে সদাশিব ভগবতীকে বলিতেছেন,—

"হে দেবী! যিনি পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম তাঁহার সহিত একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎ ও নিত্য সম্বন্ধ। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন। সুতরাং তুমিই নিখিল জীবের জননী। মহত্তত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এই চরাচর সমুদয় জগৎ তোমা কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত এবং তোমারই অধীন। তুমিই সকলের আদ্যা; সমুদয় বিদ্যা তোমা

* মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য।

হইতে উৎপন্ন; ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং আমিও তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জানিতেছ কিন্তু কেহই তোমাকে জানিতে পারে না। তুমি সর্ব্বশক্তি স্বরূপা, তোমার শরীর সর্ব্বদেবময়। তুমি সূক্ষ্মা নিরাকারা অব্যক্তস্বরূপা, আবার তুমিই স্থূলা সাকারা ও ব্যক্তস্বরূপা, সুতরাং তোমার এই স্বরূপ পরিজ্ঞানে কে সমর্থ? উপাসকদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবগণের সংহারের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানাবিধ আকার পরিগ্রহ করিয়া থাক।" *

বেদ পুরাণ ও তন্ত্র মতে আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী। তিনি মহামায়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বন্ধন ও মুক্তির উভয়ের কারণ তিনি। তিনি নিরাকারা এবং সাকারা। সাধকের জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

আদ্যাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, —

"ব্রহ্মজ্ঞানী বলে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। বিচার কর্ত্তে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তি ও স্বপ্নবৎ অবস্তু।"

"কিন্তু হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। আমি ধ্যান কচ্চি, চিন্তা কচ্চি, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি দুট বলে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুট। পূর্ণ জ্ঞানে অভেদ। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটীকে মানতে হয়।

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মান্‌লেই দাহিকাশক্তি মান্‌তে হয়—দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নি বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না, আবার সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না। আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা ভাবা যায় না, আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।”

“আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কচ্চেন। তাঁরই আর একটী নাম কালী। কালী নানা ভাবে লীলা কচ্চেন। তিনি মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশান-কালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ কচ্ছিলেন। শ্যামাকালী অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ী তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী দুর্ভিক্ষ. ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা কর্ত্তে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। শব শিবা ডাকিনী যোগিনী মধ্যে ও শ্মশানের উপর থাকেন; রুধিরধারা গলায় মুণ্ডমালা কটিতে নরহস্তের কটিবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রাখেন।”

"সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই আবার থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভির' কথা। মাকড়্সা আর তার জাল। মাকড়্সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধার আধেয় দুই।"

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী,—একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ কচ্চেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, পুরুষ বলি। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ।"

"ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। শক্তি না মান্লে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়—আমি তুমি, ঘর বাড়ী, পরিবার সব মিথ্যা হয়ে যায়। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে, কাটামই হয় না, সুন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমা ও হয় না।"

"যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম-শক্তি শক্তি-ব্রহ্ম—অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী! যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার রূপ ও মান্তে হয়। কালীরূপ চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে, সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার পর দেখ্তে পায় যে সেইরূপ অখণ্ডে লীন

হয়ে গেল। যিনি অখণ্ডসচ্চিদানন্দ তিনিই কালী। কালী—“সাকার আকার, নিরাকারা।”

“এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ। আদ্যাশক্তিই এই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি জগতের মা, তিনি জগৎ সৃষ্টি কচ্চেন, পালন কচ্চেন, তিনি তাঁর ছেলেদের রক্ষা কচ্চেন, আর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যা চায় তাই দ্যান। যত স্ত্রীলোক সকলে সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী স্ত্রীরূপ রয়েছেন। যা কিছু দেখ্‌ছ সব তাঁরই শক্তি। কোন খানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যাশক্তি: তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন সেখানে বেশী শক্তি। তিনি আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি বই আর কিছুই নাই।”

“বন্ধন আর মুক্তি; এই দুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই, ঐ সংসারী জীব মুক্ত হয়ে যায়। তিনি ভব-বন্ধনের বন্ধন-হারিণী-তারিণী।”

“তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার যো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি কর্ত্তে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—নচেৎ নয়।”

“আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার লীলা। তাঁর শক্তিতে

অবতার। অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।"

কামিনীকাঞ্চন রূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য শক্তির সাধনা কিরূপে করিতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দ্যায়। মায়া আবরণ স্বরূপ। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দ্যায় না। মহা-মায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে,—মা! পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে!"

"তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী মার শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর্ত্তে হয়। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কচ্চেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দর্শন হয়। বাহিরে পড়ে থাক্‌লে বাহিরের জিনিষ কেবল দেখা যায়। সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জান্‌তে পারা যায় না। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।"

"শক্তিই জগতের মূলাধারা। সেই আদ্যাশক্তির ভিতর বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যা মুগ্ধ করে। অবিদ্যা যা থেকে কামিনীকাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি দয়া জ্ঞান প্রেম,—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন কর্ত্তে হবে। তাই শক্তিপূজা পদ্ধতি। তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজা করা হয়,—

দাসীভাব, সখীভাব, সন্তানভাব, বীরভাব। বীরভাব,—অর্থাৎ রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা। আমার তিন ভাব—, সন্তানভাব দাসীভাব আর সখীভাব।" ক)

ইহাই তন্ত্রমতে শক্তি সাধনার সার তত্ত্ব।

তন্ত্রোক্ত বিষয় সকল বহু আগম ডামর জামল ও তন্ত্রে লিখিত আছে। এ সকলের সংখ্যা করা যায় না। এরূপ প্রসিদ্ধি যে, কেবল বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বদেশে ৬৪ খানি তন্ত্র প্রচলিত; আগমাদি অন্যান্য শাস্ত্র কত আছে নির্ণীত হয় নাই। জনশ্রুতি এরূপ যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে এই ৬৪ খানি তন্ত্রের সকল সাধনা করাইয়াছিলেন। তন্ত্রে দুই ভাবের সাধনা আছে,—পশুভাব ও বীরভাব। বৈদিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক আচার অবলম্বন করিয়া শক্তিপূজাকে পশুভাবে সাধন বলে। মদ্যমাংসাদি পঞ্চ-ম-কার লইয়া তন্ত্রোক্ত সাধনা বীরভাবের সাধনা। বীরভাবের সাধনা আবার বামাচার সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে। বামাচারে পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণে কোনরূপ নিয়ম ও বিচার নাই। বামাচার তন্ত্রে মদ্যপানের বিধান,—পুনঃ পুনঃ পান করিয়া মহী-তলে পতিত হইয়া উঠিয়া আবার পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। বিশেষতঃ—"মদিরা পানে ও মৈথুনে জাতি বিচারের প্রয়োজন নাই,"—এই তন্ত্রোক্তবিধি বামাচারী সাধকদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত। এককালে কপট ধর্ম্মসাধনার কুহকে ভুলিয়া, ঘোর বামাচারের আবর্ত্তে ডুবিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে পৈশাচিক বীভৎস কদাচারের স্রোত বহিয়াছিল। সে সময় সাধনের উদ্দেশ্য,—উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, স্তম্ভন মোহন মারণাদি অভিচারে

সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য, ভৈরব ভৈরবী ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত বেতালাদির পূজা। যখন বৌদ্ধ পালরাজগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টির সহিত বামাচারের প্রচলন। হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের সঙ্গে সিদ্ধান্তাচারের উৎপত্তি এবং পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিয়া গ্রহণ করিবার উপদেশ। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিয়ম হইল,—"ব্রাহ্মণ কর্তৃক মহাদেবীকে কখনই মদ্য প্রদত্ত হইবে না। কোন ব্রাহ্মণ বামাচার কামনায় মদ্যমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না।"* বামাচারে জাতি নির্ব্বিশেষে পঞ্চমতত্ত্ব গ্রহণের স্থানে, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যাদি নবকন্যা গ্রহণ করিবার নিয়ম হইল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণীগ্রহণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পক্ষে নিষেধ। অবশেষে কুলাচারে পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণের বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতত্ত্ব সুরাপানের নিয়ম,—"কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্যসম্বন্ধি গন্ধগ্রহণ রূপ মদ্যপানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ কুলস্ত্রীগণের মদ্যের গন্ধমাত্র স্বীকার করিলেই সুধাপান করা সিদ্ধ হইবে। গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্র পর্য্যন্ত মদ্যপান বিহিত হইয়াছে। কারণ অতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়। যে পরিমাণে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পর্য্যন্তই পান করিতে পারিবে। তদতিরিক্ত পান, পশু পান তুল্য। যাহার সুরাপানে ভ্রান্তি জন্মে এবং যে ব্যক্তি শক্তিসাধকের কার্য্যে ঘৃণা বোধ করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরূপে বলে যে 'আমি আদ্যাকালীকে ভজনা করি?"+

* শ্রীক্রম।

+ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ষষ্ঠ উল্লাস ১৯৪—১৫৭ শ্লোক।

কুলাচারে শেষতত্ত্ব কি নিয়মে পালন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—"মহেশ্বরী! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িবে সুতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে কোনপ্রকার দোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই।" গৃহস্থের পক্ষে আরও বিশেষ নিয়ম কথিত হইয়াছে,—"কলি প্রবল হইলে, যে সমুদয় গৃহস্থ একমাত্র গৃহকার্য্যেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিবে, তাহাদের পক্ষে আদ্যতত্ত্বের (মদ্যের) প্রতিনিধি স্বরূপ মধুর-ত্রয় বিধান করিতে হইবে। দুগ্ধ চিনি ও মধু এই তিন দ্রব্যের নাম মধুর-ত্রয়। এই মধুরত্রয় মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে।" শক্তি গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদিগের পক্ষে কুলাচারের বিধান —"কলিসম্ভূত মানবদিগের মন স্বভাবতঃই কাম দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত। সেই সামান্য বুদ্ধি মানবগণ শক্তিকে ইষ্টদেবতা স্বরূপ বিবেচনা করিতে পারিবে না। পার্ব্বতী! অতএব কলিযুগের তাদৃশ লোকদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের প্রতিনিধি স্থলে, দেবীর চরণ কমল ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করা বিধেয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র মতের সাধনায় বীরভাবে সাধন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার সন্তান ভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকৃতো। খুব কারণ কর্ত্তো। আমার সন্তান ভাব শুনে শেষে জিদ্—জিদ্ করে বল্‌তে লাগলো—স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন কেন মান্‌বে না? শিবের কলম মান্‌বে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের

সাধন আছে—বীরভাবের ও সাধন আছে। আমি বল্লাম,—কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছু ভাল লাগে না—আমার সন্তান ভাব।” (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানভাবে তন্ত্রের সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শক্তি সাধনায় স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অপরদিকে তাঁহার প্রকাশ্য উপদেশ যে, পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধনা, সাধারণ জীবের পক্ষে নিঃসন্দেহ পাতিত্য জনক। মদ্য ও স্ত্রীলোকাদি পঞ্চতত্ত্ব লইয়া ভৈরবীচক্রের সাধনা সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,—“এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞসাধক ব্যতিরেকে অন্য কাহার অধিকার নাই। যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যাঁহারা শান্ত এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে নিরত, যাঁহারা বিকার রহিত ও বিকল্প রহিত, যাঁহারা দয়াশীল ও দৃঢ়ব্রত, যাঁহারা সত্যসঙ্কল্প ও ব্রাহ্ম তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞে! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাঁহারা এই চরাচর জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন সেই সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষদিগেরই এই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে। এই তত্ত্বচক্রের মধ্যে সমুদয়ই ব্রহ্মময় এইরূপ ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই চক্রের প্রকৃত অধিকারী।” বামাচারের কদাচার উচ্ছেদের নিমিত্ত কুলাচার তন্ত্রের এই সতেজ উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

“বীরভাব ভাল না। নেড়া নেড়ীদের ভৈরব ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা, আর রমণের

দ্বারা প্রসন্ন করা। এভাবে প্রায়ই পতন আছে। ঠিক ঠিক সাধনা কর্ত্তে পারে না, ধর্ম্মের নাম করে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। কাশীতে যখন আমি গেলাম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান কর্ত্তে বল্লে। আমি বল্লাম—মা! আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগ্‌লো। আমি মনে কল্লাম এইবার বুঝি জপ ধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে! আমার ভয় হতে লাগ্‌লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটী গঙ্গারধারে হয়েছিল। ওসব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন আর পতন প্রায়ই হয়।" (ক)

"সহজানন্দ হলে, অম্‌নি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়! ঠিক যেন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়! (ক)

তিনি সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্য তন্ত্রের সাধনা, বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—

"মোকদ্দমা জিত্‌বো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, এই জন্য সাধনা? এ ভারি হীন বুদ্ধির কথা! লোক সিদ্ধাইয়ের জন্য পঞ্চ-ম-কার তন্ত্র মতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন বুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন,—ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটা সিদ্ধি থাক্‌লে তোমার একটু শক্তি বাড়্‌তে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই থাক্‌লে মায়া যায় না। মায়া থেকে আবার

অহঙ্কার আসে। কি হীন বুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকদ্দমা যেতা! যারা হীন বুদ্ধি তারাই সিদ্ধাই চায়। ব্যায়রাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া এই সব। যারা অতি নীচুঘর তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।"

"সিদ্ধাই থাকা এক মহা গোল। ন্যাংটা * আমায় শিখালে;—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বল্লে, ঝড় থেমে যাক্। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পাল ভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা, আর জাহাজ টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক মারা যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেলো আবার নরকও হলো।"

"একটী সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল আর সেই জন্য অহঙ্কারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটী লোক ভাল ছিল, আর তার তপস্যাও ছিল। ভগবান্ ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বল্লেন, মহারাজ, শুনেছি তোমার খুব সিদ্ধাই হয়েছে। সাধু খাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটী বল্লেন, আচ্ছা মহারাজ,

* রামকৃষ্ণ তাঁহার বেদান্তের গুরু তোতাপুরীকে ন্যাংটা বলিতেন।

আপনি মনে কল্লে এই হাতীটাকে মেরে ফেল্‌তে পারেন ? সাধু বল্লেন, 'হ্যাসা হোনে শক্তা'। এই বলে ধূলো পড়ে হাতীটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটফট্ করে মরে গেল। এখন যে সাধুটা এসেছে সে বল্লে, আপনার কি শক্তি! হাতীটাকে মেরে—ফেল্লেন! সে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তখন ও সাধুটা বল্লে, আচ্ছা, হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন ? সে বল্লে, "ওভি হোনে শক্তা হ্যায়।' এই বলে আবার যাই ধূলো পড়ে দিলে অমনি হাতীটা ধড়মড় করে উঠে পড়্‌লো। তখন এ সাধুটা বল্লে, আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে হাতী মার্‌লেন আর হাতী বাঁচালেন আপনার কি হলো ? নিজের কি উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবান্‌কে পেলেন ? এই বলে সাধুটী অন্তর্দ্ধান হলেন।"

"যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বল্লে—মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। আমার বালকের স্বভাব। কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বল্লাম, মা! হৃদে বল্‌ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অম্‌নি দেখিয়ে দিলে,—সাম্‌নে এসে পেছুন ফিরে উবু হয়ে বস্‌লো—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স, ধামা পোঁদ, কালা পেড়ে কাপড় পরা, কাপড় তুলে ভড়্ ভড়্ করে হাগ্‌ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে

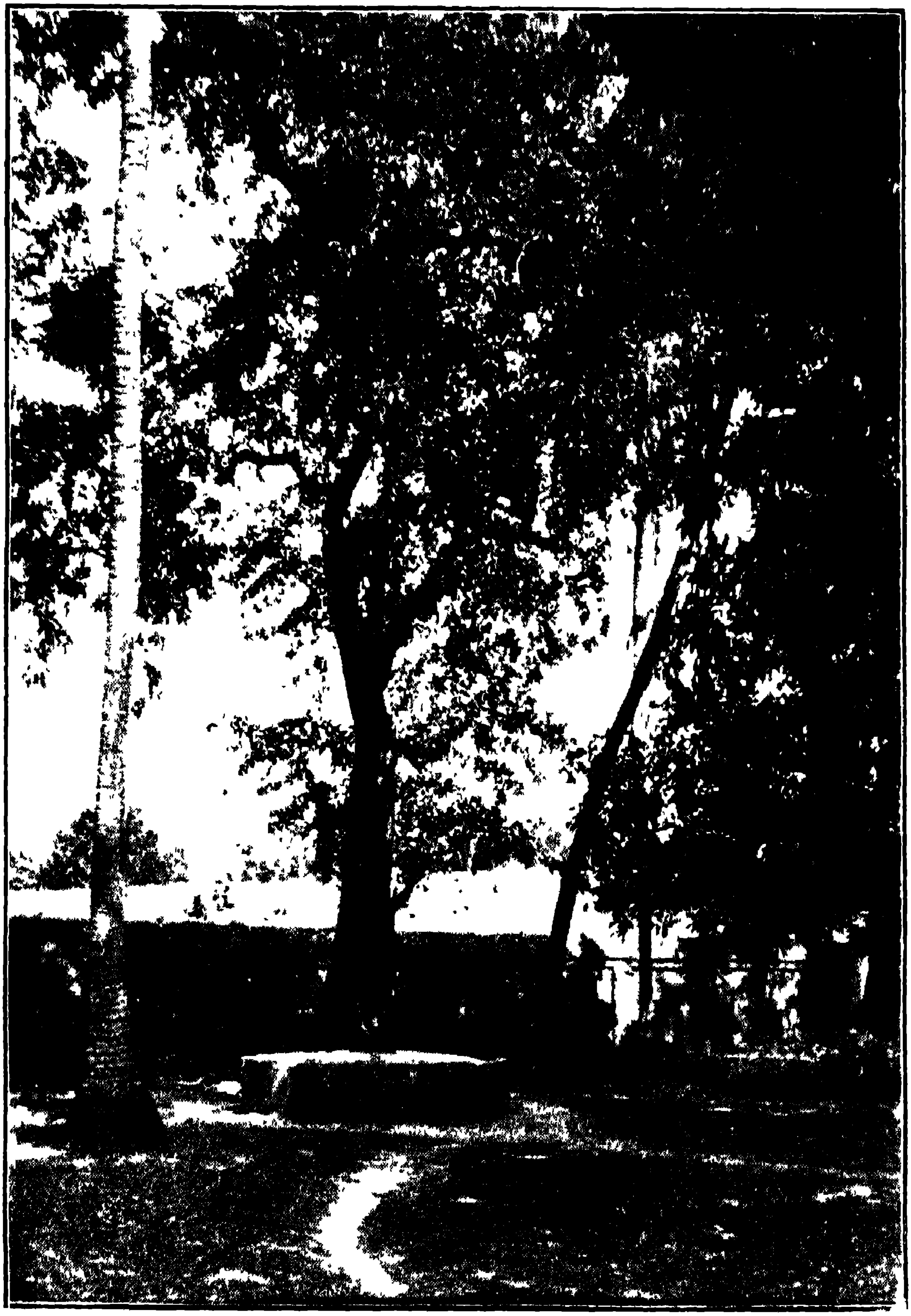

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রমতের সাধন স্থান বেলতলা

বক্‌লাম, আর বল্লাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হলো!" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতের সাধনার আরম্ভেই মাতৃভাবে কুমারী পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা,—

"কুমারী পূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটী রূপ। শুদ্ধা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ। দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হলো, কিছুদিন পরে একটী ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধুনা দেওয়া হল, অমনি সমাধিস্থ! কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, আর ধারা পড়তে লাগ্‌লো। আমি তখন টাকা দিয়ে প্রণাম করে বল্লাম,—মা! আমার হবে? তা বল্লে, হাঁ।" (ক)

কালীবাড়ীর উদ্যানের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, বিল্ববৃক্ষের তলে শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রমতে সাধনার স্থান। ইহার পার্শ্বেই কোম্পানীর বারুদখানা।

তিনি বলিতেন,—

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে, আবার আনন্দাসন,—বামনী সব যোগাড় কর্ত্তো।" (ক)

শবাসন, চিতাসন বা মুণ্ডাসন ইহার কোন একটী আসনে বসিয়া সাধনা করিলে সহজে সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া তন্ত্রে এই তিন প্রকার আসনের প্রসিদ্ধি আছে। মুণ্ডাসন আবার, একমুণ্ডী

শ্রীমুণ্ডী পঞ্চমুণ্ডী ও শতমুণ্ডী হয়। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, শৃগাল মুণ্ড বানর মুণ্ড সর্প মুণ্ড ও দুইটী চণ্ডালের মুণ্ড ব্যবহার হয়। কোনরূপ মুণ্ডাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর বেদী প্রস্তত পূর্ব্বক তন্ত্রের বিধানোক্ত বিশেষবারে ও কালে ইষ্টদেবতার যথা নিয়ম পূজা ধ্যান ও পুরশ্চরণপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে অবিলম্বে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন ব্রাহ্মণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক সাধনায় নিষ্ঠা ও ভক্তি সমন্বিত চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যান, সিদ্ধিলাভের প্রধান অবলম্বন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানের সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সে সময় ধ্যানে দেখ্‌তে পেতাম সত্য সত্য একজন শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাকৃতো। ভয় দেখালে,—যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ি আমায় মারবে! ঠিক মন না হলে বুক্ যাবে!" (ক.

ধ্যান করিবার সময় তাঁহার এইরূপ অলৌকিক দর্শনের মর্ম্ম অবধারণ করা কঠিন। শূলধারী পুরুষ কি তাঁহার অন্তরের শুদ্ধসংস্কারসমূহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেছিল? যাহা হউক, অকম্পিত দৃঢ় একাগ্রতা অবলম্বনে যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার দেহ অচল অটল স্থাবরবৎ অবস্থান করিত। বাহ্যজগতের কোনরূপ অনুভব তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। তিনি বলিতেন,—

"ধ্যানে এরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না,

শোনাও যায় না, স্পর্শ বোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায় জান্‌তে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জান্‌তে পারে না। ধ্যান যে ঠিক্ হচ্চে তার লক্ষণ আছে। একটী লক্ষণ মাথায় পাখী বস্‌বে জড় মনে করে!” (ক)

এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথাগুলি তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন। সাধন সময় তাঁহার ধ্যান কালীন লোকে অদ্ভুত দর্শন করিয়াছিল যে, ধ্যাননিমগ্ন স্থাণুবৎ অবস্থিত তাঁহার মস্তকের উপর প্রকৃতই কাক বসিয়া রহিয়াছে, চটক চঞ্চুদ্বারা জটাবদ্ধ কেশের ভিতর আহারের সন্ধান করিতেছে! ধ্যানের সময় তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা আরও বিস্ময় কর। উপরে একটী দর্শনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আর একটী দর্শনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

“সাধনার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে আমি আরও কত কি দেখ্‌তাম। বেলতলায় ধ্যান কচ্চি পাপপুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগ্‌লো। লড়ায়ের গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণসুখ, নানা রকম শক্তি এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকৃতে লাগলাম। বড় গুহ্য কথা! মা দেখা দিলেন, তখন আমি বল্লাম, মা! ওকে কেটে ফেলো! মার সেইরূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ মনে পড়্‌ছে। চাউনিনে যেন জগৎটা নড়্‌ছে!” (ক)

তাঁহার এই কথায় বোধ হয়, যেন পূর্ব্বোক্ত শূলধারী পুরুষের বিপরীত ভাবের মূর্ত্তি এই পাপপুরুষ, যাহা সকলেরই অন্তরে অবিদ্যা

সংস্কাররূপে বর্ত্তমান, তাহাই যেন দেহবান্ হইয়া তাঁহাকে সাধন পথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইতেছিল।

তন্ত্রে পাপপুরুষের বর্ণনা এরূপ আছে,—পাপপুরুষের নিবাস-স্থান মানুষের বামকুক্ষি; তাহার ব্রহ্মহত্যা মস্তক; স্বর্ণস্তেয় বাহুদ্বয়; সুরাপান হৃদয়; গুরুদার গমন কটিদ্বয়; উক্ত মহাপাতক-সংসর্গী পাদদ্বয়; পাতক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ; উপপাতক রোম সকল। রক্তশ্মশ্রু, লোচন বিহীন, খড়্গ চর্ম্ম ধারী, ক্রোধযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ। পাপপুরুষকে এইরূপে চিন্তা করিয়া তাহাকে নিজ দেহের সহিত মূলাধারোত্থিত বহ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে।"

তন্ত্রে দেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধ করিবার ক্রিয়াযোগকে ভূতশুদ্ধি বলে। অবিশুদ্ধ দেহে ও অপবিত্র মনে যে সকল পাপের সংস্কার বর্ত্তমান, সেই সমস্ত পাপসংস্কার জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করাই ভূতশুদ্ধির অর্থ। পাপের সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া দেহ মন শুদ্ধ হইলে তবে দেবপূজায় অধিকার হয়। এইজন্য পূজার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। আমাদের দেহমনে যে সকল পাপের সংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহার সমষ্টিই পাপপুরুষ বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পাপের সঞ্চিতসংস্কারই আমাদিগকে শুভকার্য্য হইতে বিচলিত করে, আর প্রলোভন দেখাইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ মানবজ্ঞানে পাপপুরুষ বলিয়া কোন সত্তাবান্ জীব নাই, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় পাপকার্য্য হইতে উৎপন্ন মনের বেগ বা সংস্কার মাত্র। তন্ত্রে সেই পাপ সংস্কারকে রূপক যোগে দেহবান্ পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় দেখা যাইতেছে যে, সমাধি

অবস্থায় দিব্যজ্ঞানচক্ষে শাস্ত্রের কল্পনা জীবন্ত সাকার রূপে প্রত্যক্ষ হয়। অথবা দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সাকাররূপ হইতেই শাস্ত্রে আকার কল্পিত হইয়াছে। অগ্রে সাকাররূপে অতীন্দ্রিয় সত্যদর্শন, পরে মানবভাষায় তাহারই বর্ণনা শাস্ত্র করিয়াছেন। এইরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা দিব্য সজীব দেহধারী, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে তাহাই সত্তাশূন্য গুণমাত্র বাচক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রত্যক্ষবস্তু যেমন সত্য, দিব্য প্রাতিভজ্ঞানে প্রত্যক্ষপদার্থ ততোধিক নিঃসংশয় সত্য প্রতীত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিগণ ঈদৃশ সজীব সাকারভাবে অলৌকিকতত্ত্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও এরূপ সজীব আকারে শ্রুতির বর্ণনা—পরমাত্মা ও জীবাত্মার একবৃক্ষে সংযুক্ত হইয়া পক্ষীরূপে অবস্থিতি, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আধ্যাত্মিক সত্যসকল মহাপুরুষদিগের মানসচক্ষে ঈদৃক্ অপূর্ব্ব নিয়মে আবির্ভূত হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য যে পাপপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রলোভিত করিতেছিল, তাহাই খ্রীষ্টকে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিল এবং বুদ্ধদেবকে তাহাই সংসারসুখের মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের পাপপুরুষ, খ্রীষ্টের সয়তান এবং বুদ্ধদেবের মার একই তত্ত্ব। তিন মহাপুরুষই দিব্যচক্ষে ইহাকে জীবন্ত দেহধারী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনকালে যে সকল অপূর্ব্ব দর্শন প্রত্যক্ষ করেন, তাহা মানসিক বিকার বা কল্পনা নয়, তাহার প্রত্যেকটী গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সুদৃঢ় সোপান। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধক সহজেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মন হইতে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি কিরূপে তাঁহার সাধনকালে নির্ম্মূল হইয়াছিল তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

> "আমি বেলতলায় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে প্রত্যক্ষ দেখ্‌লাম, সাম্‌নে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুজন মেয়ে মানুষ,—তাদের একজনকার ফাঁদি নৎ। মন্‌কে জিজ্ঞাসা কল্লাম্—মন তুই এসব কিছু ভোগ কর্ত্তে চাস্? সন্দেশ দেখ্‌লাম—গু, মেয়েদের ভিতর বার সব দেখ্‌তে পাচ্চি, যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিষ বার থেকে দেখা যায়,—নাড়ী ভুঁড়ি, বিষ্ঠা মূত্র, হাড় মাংস, ক্রিমি কফ নাল এই সব! মন কিছুই চাইলে না। তাঁর পাদপদ্মে মন রইল।" (ক)

বিবেকজ্ঞান উদয় হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। বৈরাগ্য না আসিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। কামিনীকাঞ্চন মন হইতে সম্পূর্ণ ত্যাগ হইলে পর, তবে সাধনে সিদ্ধ হইতে পারা যায়।

তন্ত্র মতে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবে সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাবে বিশেষ সাধনের তত্ত্ব, শিবলিঙ্গ পূজার ভাবের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত। রামায়ণাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে দেবমন্দিরে বেদী বা তদ্রূপ কোন আকারের দেবতার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু দেবমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। যখন দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রথম লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। লিঙ্গপূজার প্রকৃত ভাব—শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

> "শিবলিঙ্গের পূজা,—মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে,—ঠাকুর দেখো, যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়ে, মাতৃস্থান দিয়ে আর যেন আস্‌তে না হয়।" (ক)

ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার উক্তি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া শক্তিকে ভাবা যায় না, শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।" তিনি মণি আর মণির জ্যোতিঃ উপমা দিতেন। মণিকে ছাড়িয়া মণির জ্যোতিঃ ভাবা যায় না, আবার জ্যোতিঃ ছাড়িয়া মণিও ভাবা যায় না। বস্তু ছাড়িয়া বস্তুর গুণ ভাবিবার যো নাই। কারণ বস্তু ও গুণ বিভিন্ন সত্তা নহে—একই সত্তা। তবে ভাবিতে গেলে ও বুঝিতে গেলে, ব্রহ্ম ও শক্তি ভেদ দৃষ্টি করিয়া ভাবিতে ও বুঝিতে হয়। তাহা না হইলে নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্মসত্তা পরিণাম দোষ দুষ্ট হইয়া পড়ে। সেই জন্য, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হইলেও জগৎ-সৃষ্টি বুঝিতে গেলে ব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়। দ্বিদল চণকের উপমা লইয়া ব্রহ্মও শক্তির সংযোগে কিরূপে জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে

শাস্ত্র তাহা ব্যাখ্যা করেন। এই ব্রহ্ম ও শক্তির সংযোগ—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, ভগবানের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থূলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সাধনকালে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> মা, আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন দেখালেন,—চতুর্দ্দিকে শিব আর শক্তি,—শিব শক্তির রমণ। মানুষ জীব জন্তু তরু লতা সকলের ভিতরই সেই শিব আর শক্তি—পুরুষ আর প্রকৃতি—এদের রমণ।" (ক)

শিব আর শক্তিময় এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কারণ শিব ও শক্তির সংযোগ। শিব স্বরূপ পিতা ও শক্তি স্বরূপা মাতার ভিতর দিয়া, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টি প্রবাহ চালাইতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"মহৎ ও ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ যে আমার যোনি, তাহাতে আমি সর্ব্বভূতের জন্মের কারণস্বরূপ বীজ দ্বারা, গর্ভের আধান করি। হে ভারত! তাহারাই ফলে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" *

সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহান্ সৃষ্টিতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে জীবোৎপত্তির পিতৃস্থান ও মাতৃস্থান স্বরূপ। পিতৃস্থান ও মাতৃস্থানের দর্শনে ও কথনে সাধারণ জীবের মনে লজ্জাকর অশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে সাক্ষাৎ জগতের পিতা ও জগতের মাতার আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন হইল

* গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

যে, প্রত্যেক পুরুষ-চিহ্ন শিবস্বরূপ, এবং প্রত্যেক স্ত্রী-চিহ্ন তাঁহার জননী স্বরূপা—তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার উক্তি,—

"মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন,—সর্ব্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী,—যিনি জন্মস্থান।" (ক)

মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে, তাঁহার জননী সর্ব্ববিধ জন্মস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের কথায় বলিয়াছেন,—

"যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখ্‌লাম,—কুকুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম!" (ক)

তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের শেষ কথা,—

"সমস্ত স্ত্রীযোনি আমি মাতৃযোনি মনে করি, স্ত্রীলোকের স্তন, মাতৃস্তন মনে হয়! কুমারীদের এনে তখন পূজা কর্ত্তাম। দেখ্‌তাম সাক্ষাৎ মা!" (ক)

স্ত্রীলোক মাত্রেই মার এক একটী রূপ তিনি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে দর্শন এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যখন ব্রাহ্মণী বীরাচারের শেষ সাধন আনন্দাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে আহ্বান করিলেন, তিনি চক্রমধ্যে অবস্থিত ভৈরব ও ভৈরবীর শেষক্রিয়া পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মাতৃভাবে সাধন করিয়া মায়ারূপা কামিনীর মোহময়ী আকর্ষণ হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে সাধারণ সমক্ষে ভৈরবী পূজা করিয়া, তিনি মাতৃভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিলেন।

সমস্ত স্ত্রী-চিহ্ন যেমন তাঁহার চক্ষে শক্তিমূর্ত্তি, সমস্ত পুরুষ চিহ্ন ও তিনি সাক্ষাৎ শিবরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন ফুল চন্দন দিয়ে পূজা না কল্লে থাকতে পারতাম না। যখন উন্মাদ হলো শিবলিঙ্গ বোধে নিজ লিঙ্গ পূজা কর্ত্তাম,—জীবন্ত লিঙ্গ পূজা! একটী আবার মুক্তা পরান হতো। এখন আর পারি না।" (ক)

তন্ত্রমতে শক্তিপূজা বিশেষাকার যন্ত্রে ও বিশেষ মন্ত্রে করিতে হয়। কারণ, যন্ত্র দেবতার দেহস্বরূপ ও মন্ত্র দেবতার আত্মা স্বরূপ। দেহ ও আত্মায় যে সম্বন্ধ, যন্ত্রে ও দেবতার মন্ত্রে সেই সম্বন্ধ। কোন আধারে শক্তির দেহরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আঁকিয়া, তাহাতে বিশেষ মন্ত্রে শক্তির আবাহনপূর্ব্বক পূজা তন্ত্রের বিধান। তিনি বলিতেন,—

> "যন্ত্র ব্রহ্মযোনি,—তাঁরই পূজা ও ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে। অতি গুহ্য কথা,—বেলতলায় দর্শন হতো, লক্ লক্ কর্ত্তো!" (ক)

তন্ত্রে বিশ্ব প্রসবিনী জগজ্জননীর পূজা যেরূপ তাঁহার দেহরূপ ত্রিকোণ যন্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, সত্যই কি তাহা চিন্ময় দিব্যরূপে দর্শন করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মযোনি দর্শন তাহাই প্রতিপন্ন করে। অথবা যেরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মযোনির প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেই, তন্ত্রে ত্রিকোণ যন্ত্র কল্পিত। তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তন্ত্রের শক্তিপূজা মাতৃভাবে ব্রহ্মযোনির পূজা। তিনি এই ভাবেই শক্তি সাধনা করিয়াছিলেন। যখন সকল স্ত্রীযোনি

ব্রহ্মযোনি বলিয়া সাধকের প্রত্যক্ষ ধারণা হয়, তখনই সাধক কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রের বিভিন্ন শক্তি মূর্ত্তির বিভিন্ন মন্ত্র ও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ণে আবির্ভূত হইত। বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় এই সকল তন্ত্রের মন্ত্র ও যে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রমাণিত হয়।

কিরূপ অদ্ভুত পূজা জপ ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তিনি মাতৃভাবে শক্তির আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমরা উপরে তাহার ক্ষীণভাব মাত্র দিতে সক্ষম হইয়াছি। কারণ, তাঁহার তন্ত্রের সাধন ব্যাপার অধিকাংশ অজ্ঞাত। সে সময় তাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা হইয়াছিল তাহাতে কোন বিষয় পূর্ব্বাপর স্মরণ থাকাও দুরূহ। তিনি বলিতেন,—

> "আমার উন্মাদ অবস্থা! নারায়ণশাস্ত্রী এসে দেখ্‌লে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বল্লে,—ওহ, উন্মত্ত হ্যায়!" (ক)

সুতরাং জীবনান্তকর কঠোর তপস্যার ফলে কিরূপে তিনি শুচি অশুচি বোধ, ঘৃণা লজ্জা ভয় অভিমান প্রভৃতি অষ্টপাশ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন লাভ করেন, সে সম্বন্ধে অল্প-মাত্রই জানিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি, যখন তিনি মার আদেশে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন সংসারের কামিনীকাঞ্চনের সুখ মান যশ প্রভুত্বের লালসা, অনিমাদি সিদ্ধির প্রলোভন কিছুই তাঁহার মনে উঠে নাই। মার কাছে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল,—নিষ্কাম, অমলা অহেতুকী শুদ্ধাভক্তি। কিন্তু এই শুদ্ধা-

ভক্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে বীভৎস পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে ও শরীর কণ্টকিত হয়।
তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বেদ পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা বলেছে করো না—অনাচার হবে, তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে। তন্ত্রের সাধনা তামসিক সাধনা। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই। তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালী! কি তুই দেখা দিবিনি,—এই গলায় ছুরি দেব যদি না দেখা দিস্।"

"আমাকে কঠোর সাধন কর্ত্তে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাক্‌তাম,—মা! দেখা দাও, বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত!"

"কি অবস্থা গেছে! আমি মা বল্‌তে বল্‌তে সমাধিস্থ হতাম। মুখ কর্ত্তাম আকাশ পাতাল জোড়া আর মা! বল্‌তাম—যেন মাকে পাক্‌ড়ে আন্‌ছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়্ হড়্ করে টেনে আনা! গানে আছে,—

"এবার কালী তোমায় খাব! (তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।)
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটর একটা করে যাব।"

"উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল! এই ব্যাকুলতা!"

ঈদৃশ তীব্র ব্যাকুলতায় ও কঠোর তপস্তায় মার দর্শনলাভে ভগ-

মনোরথ হওয়াতে একদিন মোহাচ্ছন্ন ও আশাশূন্য হৃদয়ে প্রাণ-ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, এবং উন্মত্তভাবে কালীঘরে পশুবলির খাঁড়া গ্রহণ করিবামাত্র দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। এইরূপ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় তাঁহার দুইদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার মুখের ঊর্দ্ধমাঢ়ী হইতে মাঝে মাঝে এরূপ রক্তস্রাব হইত যে, তাহা কিছুতেই বন্ধ হইত না। কিয়ৎকাল শোণিত বাহির হইয়া, আপনিই নিবৃত্তি হইত। তিনি বলিতেন,—"রক্তের রং ঠিক শিমপাতা নিংড়ান রসের মত কালবর্ণ।"

ক্রমশঃ তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানোন্মাদের অবস্থা উপস্থিত হইল। তিনি দেহজ্ঞান পরিশূন্য হইলেন এবং সুখ দুঃখ শুচি অশুচি প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে দূর হইয়া গেল। তিনি ঘৃণা লজ্জা ও ভয় শূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "সে অবস্থায় শিবাণীর উচ্ছিষ্ট সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে, তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই,—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার! কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম আর নিজেও খেতাম। সর্ব্বং বিষ্ণু ময়ং জগৎ!" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি তন্ত্রোক্ত শিবাবলি দিয়াছিলেন। তন্ত্রে শিবাবলির এরূপ বর্ণনা আছে। "সাধক সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে শিবারূপিণী দেবীকে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেন। প্রথমতঃ কালী! কালী! এই বলিয়া আহ্বান করিলে শিবারূপিণী দেবী

উমা সপরিবারে পশুরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ বলি দ্রব্য ভোজন করিয়া শিবা ঈশানকোণে আসিয়া মুখ তুলিয়া সুস্বরে ধ্বনি করিলে সাধকের মঙ্গল হইবে; নতুবা অমঙ্গল জানিবে। সর্ব্বদা অন্নদান করিয়া শিবাকে পরিতুষ্ট করা সাধকের কর্ত্তব্য।" *

শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ নিঃশঙ্কোচে রাত্রে দেবী প্রসাদ ভাবিয়া জঙ্গল মধ্যে পতিত শিবার উচ্ছিষ্ট আহার ও কুক্কুরের সহ ভোজন ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার গভীর মর্ম্ম অবধারণ করা যায়; মন সম্পূর্ণ ভয়শূন্য না হইলে কেহ এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এবং পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান ভিন্ন মন ও ভয়শূন্য হয় না। যিনি সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া, 'সর্ব্বং বিষ্ণু ময়ং জগৎ', প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তিনিই অদ্বৈতজ্ঞানে স্থিত হইয়া এরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম। কারণ, যখন এক স্বস্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু অনুভব করা যায় না, তখন মৃত্যুভয় বা বিপদাশঙ্কা আর কোথা হইতে উপস্থিত হইবে?

তন্ত্রের সাধনা করিয়া তিনি কিরূপ ঘৃণা লজ্জা ও শুচি অশুচি বোধ শূন্য, বীভৎসকর্ম্মী অঘোরীবৎ হইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটী কার্য্যে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন,—

> "আগে এমন অবস্থা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়া পোড়ার যে গন্ধ আস্‌তো সেই গন্ধ নাক্ দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগ্‌তো!" (ক)

শুনা যায়, নরকপাল মধ্যে মাংসাদি রাঁধিয়া জগদম্বাকে তর্পণ

---

* কুলচূড়ামণি

পূর্ব্বক তিনি সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন! এবং ব্রাহ্মণীর অনুজ্ঞায় একদিন গলিত আম মহামাংস তর্পণান্তে জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে তাঁহার কোনরূপ মনোবিকার হয় নাই। কালীবাড়ীর জনসাধারণ যে স্থানে নিত্য বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করে, স্বহস্তে সেই-স্থান পরিষ্কার এবং সদ্য ত্যক্ত বিষ্ঠা জিহ্বাগ্রে গ্রহণ তাঁহার নির্ব্বিকারত্বের চরম পরিচয়!

অদ্বৈতজ্ঞানে তাঁহার ভেদবুদ্ধি কিরূপ তিরোহিত হইয়াছিল তিনি তাহা নিজমুখে বলিয়াছেন,—

> "একদিন দেখালে, বিষ্ঠামূত্র, অন্নব্যঞ্জন, সবরকম খাবার জিনিষ,—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটী আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ কল্লে,—যেন জিহ্বা লক্ লক্ কর্ত্তে কর্ত্তে সব জিনিষ একবার আস্বাদ কল্লে,—বিষ্ঠা মূত্র সব আস্বাদ কল্লে। দেখালে সব এক—অভেদ।" (ক)

ভেদজ্ঞান নিবারক এই অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরের অহঙ্কার জাত্যাভিমান কিরূপ নির্ম্মূল হইয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়াছেন,—

> "কি অবস্থাই গেছে! এখানে খেতুম না, বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে কি এঁড়েদয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে পড়তাম। আবার পড়তাম অবেলায়। গিয়ে বসতাম,—মুখে কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে কেবল বলতাম,—আমি এখানে খাবো। আর কোন কথা নাই।"

"আলমবাজারে রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতাম। আবার কখন দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ী যেতাম। তাদের বাড়ী খেতাম বটে, কিন্তু ভাল লাগ্‌তো না,—কেমন আঁস্‌টে গন্ধ।"

"সেই অবস্থায় জাতি বিচার কিছু থাক্‌তো না। একজন নীচ জাত, তার মাগ আমাকে শাক রেঁধে পাঠাত আমি খেতাম।"

"কালী বাড়ীতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতে একটু একটু খেলাম, আর তাদের পাতা মাথায় ঠেকালাম। হলধারী তখন আমায় বল্লে,—'তুই করছিস্ কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলে পিলের বিয়ে হবে কেমন করে?' আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বল্লাম, তবে রে শ্যালা, তুমি না গীতা বেদান্ত পড়? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলে পিলে হবে তুমি ঠাউরেছ? তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্‌তে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থের নিকট অন্নভিক্ষা, নীচবর্ণের খাদ্যগ্রহণ এবং কাঙ্গালীর উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন, আধুনিক কালের অন্তরে বিদ্বেষানল ও মুখে সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের মৌখিক উদারতা নয়। জাত্যাভিমান উচ্ছেদ করিয়া যথার্থ সমদর্শন কাহাকে বলে তাহাই

দেখাইয়াছেন। শত শত যুগ ধরিয়া ভারতের দরিদ্র পতিত নীচ-বর্ণ চিরকাল শ্রেষ্ঠের অবজ্ঞাভাজন, অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত। তাহাদের উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তাহারা আশ্রয়হীন, বিদ্যাহীন, ধর্ম্মহীন। কে তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য চিন্তা করিয়া থাকে? কিন্তু এই দরিদ্র মূর্খ ব্রাহ্মণ মহাপ্রসাদজ্ঞানে দিন দুঃখী কাঙ্গালীর উচ্ছিষ্ট মস্তকে ধারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকল মানুষে শিবরূপে সেই এক চৈতন্য বর্ত্তমান। কিন্তু যখন দেখা যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও নিজেকে হীনেরও হীন মনে করিয়া গভীর রজনীতে সংমার্জ্জনী হস্তে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছেন, নীচাধম হাড়িরও মলত্যাগস্থান স্বহস্তে ধৌত করিয়া স্বীয় দীর্ঘ কেশ দ্বারা তাহা মুছিতেছেন, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—জগতে এরূপ অদ্ভুত সেবাধর্ম্মের দৃষ্টান্ত কখন কি দেখা গিয়াছে? সমাজের শিরোভূষণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মলমূত্র স্বহস্তে স্থানান্তরিত করিয়া দেখাইলেন যে, বৈদিক সমাজের অধঃপতনের মহাকারণ, সমাজ-গত ও ব্যক্তিগত ঘৃণা দ্বেষ ঈর্ষা ও অসূয়ারূপ মহাপাতকের প্রায়-শ্চিত্ত, একমাত্র জাতি বর্ণ উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে,—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।'

শুচি অশুচি বোধ, ঘৃণা লজ্জা ভয় জাত্যাভিমান প্রভৃতি সমস্ত অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহার মন এখন কেবল সচ্চিদানন্দ-ময়ী মাতার শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে বাহিরে এখন একমাত্র মাতৃ সত্তা বিদ্যমান। কিন্তু তিনি বিচার বা জ্ঞানপথে এই অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হন নাই। অহেতুকী

শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের ভিতর দিয়াই গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবে চারিদিকে হল্‌দে দ্যাখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটী বোধ হয়। মাতালের বেশী নেশা হলে বলে 'আমিই কালী।' গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—'আমিই কৃষ্ণ।' তাঁকে রাত দিন চিন্তা কল্লে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকপরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।" (ক)

এ সময় মহাভাবে তিনি প্রায়ই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। যখনই তাঁহার চিন্ময়ী মাতৃদর্শন লাভ হইত তখনই তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কখন এরূপ কম্প হইত যে তিন চারিজনে চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কখন দেহ বিবর্ণ, কখন জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকেন, কখন বা অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়। কালীবাড়ীর সকলেই এসকল লক্ষণ তাঁহার উন্মত্ততার উপসর্গ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার তন্ত্র সাধনার গুরু দিব্যদৃষ্টি সম্পন্না ব্রাহ্মণী কেবল বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা সহজ উন্মত্ততা নয়, ইহা প্রেমোন্মাদ। ভক্তি শাস্ত্রে ইহাকে মহাভাবের অবস্থা বলে। অশ্রু কম্পাদি তাঁহার রোগের উপসর্গ নয়, এই সকল লক্ষণ সাধারণ জীবের অপ্রাপ্য মহাভাবের বাহ্য নিদর্শন, অষ্টসাত্ত্বিক

ভাব। বৈষ্ণব শাস্ত্রে একমাত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে এই মহাভাবের কথা বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে অহরহঃ মহাভাবে নিমগ্ন দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরাবির্ভাব হইয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলেন এবং একথা তিনি সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ ও করিয়াছিলেন। সাধারণে এই মহাভাবের অবস্থা কি করিয়া বুঝিবে? যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা প্রেমাভক্তির উৎস খুলিয়া যায়, তিনিই সেই প্রেমমদিরা পান করিয়া আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হন, তাঁহার দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, জগৎজ্ঞান ও বিলুপ্ত হয়, তিনি প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া মাতালের মত পাগলের মত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায়, প্রেমাস্পদের নাম শুনিবা মাত্র বা তাঁহার সংসর্গের কোন বস্তু দেখিবা মাত্র, উদ্দীপন হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন; দেহে স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, স্বরভেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, কম্প, সুখ দুঃখ বোধশূন্যতা রূপ অষ্ট সাত্বিকভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। আবার যখনই তিনি ক্ষণ মাত্র প্রেমাস্পদের অভাব অনুভব করেন, তাঁহার স্মরণ পথ হইতে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ও তিনি অদর্শন হন, তখনই বিরহ রূপ তীব্র অন্তর্জ্বালা আসিয়া দেহ মন দগ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু সে বিরহানলের ভিতর ও প্রেমের মধুর স্মৃতি বিরাজ করিতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাভাব ও বিরহাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"সে অবস্থার পরে আনন্দ ও যেমন, আগে যন্ত্রণা ও তেমনি। মহাভাব,—ঈশ্বরের ভাব। এই দেহ মনকে

১৪

তোলপাড়্ করে দ্যায়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে, ঘর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে চুরে যায়।”

“ঈশ্বরের বিরহ অগ্নি সামান্য নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় বসে থাক্‌তেন, ঐ অবস্থা হলে, এই রকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্‌সা পোড়া হয়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম,—নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁস হলে, বামনী আমায় ধরে স্নান কর্ত্তে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছিলো। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল সে সব মাটি পুড়ে গিছিল!”

“যখন এই অবস্থা আস্‌তো শির ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় কর্ত্তাম। কিন্তু তার পর খুব আনন্দ।” (ক)

তন্ত্রের সাধনার শেষ হইতেই তিনি মহাভাবে প্রায়ই বাহ্য চেতনা শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় বিরহ জনিত গাত্রদাহ তাঁহার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার উপশম হয় নাই। পরে ব্রাহ্মণীর বিশেষ শুশ্রূষায় তিনি এই উপসর্গ হইতে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের আবেশ যেমন প্রবল হইতে লাগিল, তাঁহার জ্ঞানোন্মাদাবস্থা ও ক্রমে ক্রমে শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং তিনি পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে

লাগিলেন। তাঁহার বাল্যভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে এক অদ্ভুত দর্শনের কথা তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন,—

"একজন ন্যাংটো সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তো। তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্‌কিমি কর্ত্তাম। তখন খুব হাস্‌তাম। এ ন্যাংটো মূর্ত্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত.—পরমহংস মূর্ত্তি, বালকের ন্যায়।" (ক)

এই বালকবৎ পরমহংস মূর্ত্তি তাঁহাকে যেন বুঝাইয়া দিল যে, তিনি তখন বালকবৎ পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এখন তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইতে লাগিল। কে তাঁহাকে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে? বালক মনে করে যে তাহার মা সব জানেন। তিনি মার কাছে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আব্দার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বল্লাম,—আমি মুখ্যু তুমি আমাকে জানিয়ে দাও, বেদ বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। পুরাণ তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বট-তলায় দেখ্‌লাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে, তারপর কত হাসি। খেলার ছলে আঙ্গুল মট্‌কান হলো। তারপর কথা!—কথা কয়েছে। তিন দিন করে কেঁদেছি, আর

বেদ পুরাণ তন্ত্রে—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।" (ক

মার কৃপায় সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার আর জ্ঞানের অভাব রহিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দ্যাখনা আমি তো মুখ্যু, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? ও দেশে ধান মাপে, রামে রাম, রামে রাম, এই সব বল্‌তে বল্‌তে। একজন মাপে আর ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় পেছনে আর একজন রাশ ঠেলে দ্যায়। তার কর্ম্ম ঐ—ফুরোলেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি পেছন থেকে তাঁর জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দ্যান। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।"

এখন হইতে তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া যাহা ব্যক্ত হইতে লাগিল, তাহা বাগ্‌বাদিনীরই বেদবাণী—মার অক্ষয় ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি।

তন্ত্রমতের সাধনা করিবার সময় তাঁহার কতবিধ অবস্থা হইয়াছিল এবং কিরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। তিনি নিজমুখে সেই সকল অবস্থার কথা যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে সে সব হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানীর চারটী অবস্থার কথা আছে,—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। ঈশ্বর দর্শন হলে পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। যার ঈশ্বর

দর্শন হয়েছে সে বালকের ন্যায় ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার কখন পাগলের মত ব্যবহার করে,—কভু হাসে, কভু কাঁদে। এই বাবুর মত সাজগোজ আবার খানিক পরে ন্যাংটো, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে,—তাই উন্মাদবৎ। কখনও জড়ের ন্যায় চুপ্‌-করে বসে থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না,—কর্ম্মত্যাগ হয়। পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটী লক্ষণ,—পিশাচ-বৎ। খাওয়া দাওয়ার বিচার নাই। শুচি অশুচির বিচার নাই। শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান।" (ক)

আমরা দেখিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণের এ সকল অবস্থাই হইয়াছিল। এখন তাঁহার বালকবৎ ত্রিগুণাতীত পরমহংসাবস্থা। তাঁহার নানারূপ দিব্যদর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো। কখন দেখ্‌তাম, জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ; কখন চারিদিকে যেন পারার হ্রদ, ঝক্ ঝক্ কচ্চে। আবার কখন রূপা-গলার মত দেখ্‌তাম। কখন দেখ্‌তাম রংমশালের আলো যেন জ্বল্‌ছে।"

"আবার দেখালে তিনিই জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। উঃ কি অবস্থাতেই রেখেছে! একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢেঁকির পাট্‌। একদিক নীচু হয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ তখন দেখ্‌ছি তিনি। আবার বাহিরের জগতে মন এলে তখনও দেখ্‌ছি তিনি!"

"আর একদিন দেখালেন,—নৃমুণ্ড স্তূপাকার, পর্ব্বতাকার আর কিছুই নাই। আমি তার মধ্যে একলা বসে!"

"কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে গায়ে হোমাগ্নি জ্বেলে দিলে। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে কাঁটা পোড়ান! এই সব সাক্ষাৎ দর্শন হতো।" (ক)

বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে, আধ্যাত্মিক সত্য সকল যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক ঐতিহাসিক সত্যও যে তৎসঙ্গে তাঁহার উপলব্ধি হইত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সীতা রাধিকা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র যে কেবল কবি কল্পনা নয়, পরন্তু সে সকলের ভিতর ও যে ঐতিহাসিক সত্য গুপ্ত রহিয়াছে ইহা তাঁহার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

তন্ত্রের মহাসাধনা সম্পূর্ণ হইলে, অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির সহিত তাঁহার দেহে এক দিব্য কান্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রুতিতে উক্ত আছে, জাবালা সত্যকাম, আচার্য্যের আজ্ঞা পালন করিয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সে সময় গুরুরূপী বৃষভ, অগ্নি, হংস ও মদ্‌গু (পানকৌড়ী পাখী) এই চারি জনের নিকট চতুষ্পাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন,—

"সত্যকাম! ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি" সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মবিদের ন্যায় জ্যোতিষ্মান দেখিতেছি! কো নু ত্বানুশশাসেতি? সোম্য! তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা কে?"

জ্ঞান ও প্রেমের দিব্যালোক যদ্যপি অন্তরে উদ্ভাসিত হয়

বাহিরের জড়দেহ তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, দেহ ইন্দ্রিয়াদি উজ্জ্বল করিয়া সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"যখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জ্বল্ জ্বল্ কর্ত্তো,—বুক লাল হয়ে যেত। তখন বল্লাম,—মা! বাহিরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ! তা না হলে, লোক জ্বালাতন কর্ত্তো—লোকের ভিড় লেগে যেত—সেরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস

তন্ত্রমতের সাধনা শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের বালকবৎ অবস্থা হইয়াছিল। এসময় সামান্য উদ্দীপনা হইলেই তিনি মহাভাবে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকিতেন। বালকের ন্যায় নিজের দেহরক্ষা করিতে তাঁহাকে অসমর্থ দেখিয়া, বিশেষতঃ ভাবাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, মথুর বাবু তাঁহাকে জানবাজারে নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার সেবার ভার তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জগদম্বা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ভক্তিমতী জগদম্বা নিজের শয়ন কক্ষে আপনার নিকট তাঁহাকে শয়ন করাইতেন এবং তাঁহার স্নানাহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের মধ্যে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে নিজ বাল্যকালের স্মৃতি জাগরিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে স্ত্রীভাবে ভাবান্বিত করিল। স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্তঃপুরে বাস করিবার অভিলাষ বুঝিয়া শ্রীমতী জগদম্বা তাঁহাকে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা করিয়া দিলেন। তিনি বলিতেন,—

"প্রায় হুঁস থাকত না। সেজবাবু জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিন কতক রাখ্‌লে। দেখ্‌তে লাগ্‌লাম সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা কর্ত্তোনা,—যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে

কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াতে যেতাম।" (ক)

স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত হইয়া থাকিবার সময়, তাঁহার মানসিক প্রকৃতি ও কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ স্ত্রীলোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার উপরোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, পুরাণ মতে সাধন করিবার সময় তিনি মধুরভাব সাধন করিয়াছিলেন। এখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তিনি সখীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সখীভাবের সাধনা, শ্রীমতী রাধিকার অষ্টসখীদিগের মধুরভাবের অনুরূপ সাধনা নয়। ইহা তাঁহার দাসী ভাবের সাধনা। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমি সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। বলতাম আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী। ওগো দাসীরা আমায় তোমরা দাসী কর,—আমি গরব করে চলে যাব বলতে বলতে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী।" (ক

সুতরাং বুঝাযাইতেছে যে, তিনি এই সময় আপনাকে মার দাসী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিতেন,—

"আমি মার দাসীভাবে সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। নিজে দাসীভাবে রইলাম,—পুরুষের দাসী।" (ক)

তাঁহার এই সকল কথা হইতে বোধ হয় যে, তাঁহার স্ত্রীভাবে সাধনার মূল উদ্দেশ্য—স্ত্রীভাব আশ্রয় করিয়া সখীভাবে ও দাসীভাবে ভগবানের সেবা। কিন্তু তাঁহার সখীভাবে সাধনার আর

ও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। পুরাণ মতে সাধনার সময় তিনি দেখাইয়াছেন যে, শান্ত দাস্যাদি যে কোন একটী ভাব আশ্রয় করিয়া, আরাধনা করিলে ভগবানের দর্শন লাভ হয়। সুতরাং এখন সখী ও দাসীভাবে পুনর্ব্বার ভগবৎ আরাধনার বিশেষ কোন হেতু বুঝিতে পারা যায় না। মধুরভাব সাধন করিবার সময়, স্ত্রীবেশ ধারণ না করিয়া ও তাঁহাকে স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া সাধনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি রাধা ভাবে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কর্ত্তাম। আমি আপনাকে পু (পুরুষ) বল্‌তে পারিনা।" প্রকৃতি ভাব তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। সম্পূর্ণ প্রকৃতি ভাবেই তিনি মধুর ভাব সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহার স্ত্রীভাবে সাধন পৌরাণিক ভক্তি পথের কোন নূতন ভাবসাধন নয়। ইহা তাঁহার শক্তি সাধনার অপর এক বিশেষ ভাব। তিনি বলিয়াছেন যে, শক্তি সাধনা তিনি তিন ভাবে করিয়াছিলেন,—"আমার তিন ভাব,—সন্তান ভাব, দাসী ভাব আর সখীভাব।" পূর্ব্বে তিনি সন্তানভাবে তন্ত্রমতে সাধনা করিয়াছেন। এখন তিনি দাসীভাবে ও সখীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীবেশে সাধনার উদ্দেশ্য তিনি এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,—

> "আরোপ কল্লে ভাব বদ্‌লে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ কল্লে ক্রমে কামাদিরিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।' (ক)

স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে সাধনার কারণ, তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

> "জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ কর্ত্তে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়ে মানুষের কাপড় গয়না পর্‌তাম, ওড়না গায়ে দিতাম, ওড়না গায়ে দিয়ে আরত্তি কর্ত্তাম।" ক)

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের এ সময়ের সাধনা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে সিদ্ধ হইবার জন্য নহে। কিন্তু কি উপায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি ত্যাগ হইতে পারে, কামিনীকাঞ্চন ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য।

তাঁহাকে অন্তঃপুরে সকলে কিরূপ পাঁচ বৎসরের বালকের মত মনে করিত তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন—

> "সেজ বাবু আর সেজ গিন্নি যে ঘরে শুত সেই ঘরেই আমি শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটার মতন আমায় যত্ন কর্ত্তো। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজ বাবু বল্‌তো— বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাও? আমি বল্লাম পাই।" (ক)

আপনার সহজ বাল্যভাবের সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন,—

> "আমার বালকের অবস্থা আজ বলে নয়। সেজো বাবুকে হাত দেখাতাম, বল্‌তাম,—হ্যাঁগা, আমার কি অসুখ করেছে?"

"সেজ গিন্নি সেজো বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল,—যদি কোথাও যাও, ভট্‌চাযি্য মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো, আমায় নীচে বসালে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে,—চল্‌ বাবা, চল বাবা গাড়ীতে উঠ্‌বে চলো। সেজো গিন্নি জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি ঠিক ঐ সব কথা বল্লাম। আমি বল্লাম,—দ্যাখোগা, একটী বাড়ীতে আমরা গেলাম। উঁনি আমায় নীচে বসালে, উপরে আপনি গেল। আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে,—চল বাবা চল বাবা। সেজ গিন্নি যা হয় বুঝে নিলে।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তিনি সখীভাবে দুই বৎসর ছিলেন, (১২৬৮—১২৬৯) এবং অধিকাংশ সময়ই রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীতে থাকিতেন। সেই সময় পূজা ও উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান মথুরবাবু তাঁহার পরামর্শ না লইয়া সম্পন্ন করিতেন না। শারদীয়া মহাপূজার সময় যখন কারিকর প্রতিমা গঠন করিত, তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিতেন কিরূপে দেবচক্ষু আঁকিতে হয়। শ্রীশ্রীকালী প্রতিমা নির্ম্মাণ হইলে, মার দেহের বর্ণ কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন,—"আমি মার রং এই ঘাস ফুলের মত নীল বর্ণ দেখিয়াছি।" প্রতিমা কিরূপে সাজাইতে হইবে নৈবেদ্যাদি উপচার কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহা "বাবা" না দেখাইয়া দিলে মথুরবাবুর মনোমত হইত না। তিনি নিজে স্ত্রীবেশে সাজিয়া এবং অন্তঃপুরের অপর সকল স্ত্রীগণে বেষ্টিত হইয়া দেবীকে চামর ব্যজন করিতেন। কিন্তু

প্রায় কোন সময়ই তাঁহার ভাবোন্মত্ততার বিরতি হইত না। তাঁহার ভাবাবস্থার প্রেমানন্দ সন্দর্শন করিয়া মথুরবাবুর ও ভাবাবেশে থাকিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তিনি বলিতেন,—

> "সেজ বাবুর ভাব হলো। সর্ব্বদাই মাতালের মতন থাকে। কোনও কাজ কর্ত্তে পারে না। তখন সবাই বলে, এরকম হলে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্‌চাষ্যি নিশ্চয় কোন তুক্ করেছে।" (ক)

যদিও ভাবসমাধি অবস্থায় সতর্কভাবে রক্ষা করিবার জন্যই মথুরবাবু অতিশয় সাবধানে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। একদিন তিনি ভাবাবস্থায় কোন নিভৃত স্থানে মাটিতে পতিত রহিয়াছেন, একজন ভৃত্য গুল দিয়া তামাক সাজিয়া দ্রুত যাইতে অসাবধানে তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে একটী জ্বলন্ত গুল পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে চামড়া পোড়া গন্ধ পাইয়া মথুর বাবু অনুসন্ধান করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। মার নাম শ্রবণান্তে চেতনা সম্পাদন হইলে, তিনি পৃষ্ঠে তীব্র জ্বালা অনুভব করাতে মথুরবাবু সভয়ে দেখিলেন যে, সেই জ্বলন্তগুল পৃষ্ঠের চর্ম্ম পোড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে! গুল বাহির করিয়া দিবার পর সেই ক্ষত লইয়া তিনি বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন। আর এক দিনের ঘটনা তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন,—

"কালীঘাটের চন্দ্র হালদার সেজ বাবুর কাছে প্রায়

আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাব্‌তো আমি ঢং করে ঐ রকম করে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগ্‌লো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বল্লে, সেজ বাবুকে বলে দেওয়া যাক্‌। আমি বারণ কল্লাম।” (ক)

“কামিনীকাঞ্চনে একটুও আসক্তি থাক্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।” শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাই বারংবার উক্তি। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও অনাসক্তভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের চিত্তশুদ্ধ হইয়া যায়। সখীভাব সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয়তা লাভের জন্য প্রাচীনকালের ধর্ম্ম শিক্ষক ঋষিগণ সমাজে বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় উপনীত বালককে উদ্দেশ করিয়া লিখিত আছে—“মনুষ্যের দশ ইন্দ্রিয়ের প্রাণস্বরূপ মনকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করাযায়। ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইতেই মানুষ দূষিত হয়। আর ইহাদের সংযম করিতে পারিলে সকল সিদ্ধিই নিশ্চয় লাভ হয়। কাম্য বিষয় সকল উপভোগ করিলে কখন কামনার শান্তি হয় না, পরন্তু, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার বৃদ্ধিই হইতে থাকে। কিন্তু বিষয় ভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা ও দুষ্কর। সেইজন্য জ্ঞান-বিচার দ্বারা তাহাদিগকে ক্রমে উপশান্ত করিতে হয়। বেদ বল, দান বল, যজ্ঞ নিয়ম তপস্যাদি যে কোন পুণ্যকার্য্য বল, বিষয় ভোগাসক্ত

ব্যক্তিকে কখনই সিদ্ধি দিতে পারে না। ইন্দ্রিয় কার্য্য সকল অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক কিছুতেই যাহার হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন করিতে পারে না তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। জল-পাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলে, যেমন তাহা জলপূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হয়, ইন্দ্রিয়গণের একটীর দুর্ব্বলতায় পরমজ্ঞান যে প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়া থাকে। সেই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, মনকে সংযত করিয়া, দেহকে পীড়া না দিয়া, লোকে সমুদয় পুরুষার্থ সাধন করিবে।"

বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিমিত্ত এইরূপ বিধান—"মধুমাংস ভোজন, গন্ধদ্রব্য ও মাল্যাদি ধারণ, বেশ ভূষার দ্বারা দেহের শোভাবর্দ্ধন, কাম ক্রোধ লোভ, নৃত্যগীত অক্ষাদি ক্রীড়া, দেশবার্ত্তা অন্বেষণ, মিথ্যা কথন এবং প্রাণিহিংসা ও পরের অনিষ্টাচরণ কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও ব্রহ্মচারীর একান্ত নিষেধ। সংসারে দেহধর্ম্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত। সেজন্য মাতা, ভগিনী কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এত-দূর বলবান যে জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

গৃহস্থাশ্রমীর ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মনুষ্য পুত্রবান্ হয় ও পিতৃলোকদিগের নিকট অঋণী হয়। সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রই ধর্ম্মোৎপন্ন পুত্র, অপর সন্তানেরা কামজ মাত্র।" ইন্দ্রিয় পরবশ ব্যক্তির স্বার্থ ও পরমার্থ উভয়ই নষ্ট হয় ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের শিক্ষা।

বিজিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র মতের

সাধন করেন। সংসার বন্ধনের হেতু অবিদ্যারূপা কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তিনি মাতৃভাবে সাধন করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সংসারীর পক্ষে এরূপ সাধন অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্য দুর্ব্বলাধিকারীকে প্রথমে জ্ঞান ভক্তিলাভ করিয়া সংসার করিতে তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ। তাঁহার উক্তি,—

> "ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আস্‌বে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুণি লাগ্‌বে। যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী পুরুষের দেহ সুখের দিকে কি মন থাকৃতে পারে?

তাঁহার সখীভাবের সাধন হইতে বুঝা যায় যে, পুরুষ যদি আপনাকে স্ত্রীভাবে নিরীক্ষণ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোককে পুরুষের ভোগ্যবস্তু, কামিনী ও রমণীভাবে দৃষ্টি না করিয়া আপনার মাতা বা ভগিনী ভাবেই দেখিতে পায়; আর এরূপ ভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার ইন্দ্রির দমন আপনিই হইয়া যায়। যতক্ষণ পুরুষ স্ত্রীলোককে নিজের ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গ করে, ততক্ষণ দেহসুখের নিমিত্ত অনিত্য কামজ ভালবাসা ও তাহার জন্য অশেষ দুঃখভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু তাহাদিগকে মাতা বা ভগিনী মনে করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিলে, তাহারাই ভগবানে ভক্তি লাভ করিবার সহায় হয়। স্ত্রীজাতিকে এইরূপ প্রীতির সহিত দর্শন করিবার উপায়, আপনাতে স্ত্রীভাবের আরোপ। তিনি বলিতেন,—

"শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা। ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন। কৃষ্ণ রাস-মণ্ডলে গেলেন, কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন, তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতি ভাব না হলে প্রকৃতি সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতি ভাব হলে, তবে রাস তবে সম্ভোগ।" (ক)

হিন্দু সমাজে সেবা ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রেই আছে যে, বাল্যকালে কন্যা পিতা কর্ত্তৃক পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া। দুহিতা পিতামাতার নিকট ধর্ম্মানুশাসন ও পতি সেবা শিক্ষা করিবে। যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে তাঁহার সহিত বনে যাইতে নিষেধ করিলেন, সীতাদেবী উত্তর করিয়াছিলেন,—"স্বামী সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, তাঁহার পদতলে থাকাই স্ত্রীলোকের সমস্ত স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ; তাঁহার পদসেবা করাই তাহার পক্ষে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি অপেক্ষাও সুখকর। অতএব তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে গ্রহণ কর; স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক যথা শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছি, তোমাকে আর এখন আমাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না।" *

যৌবনে স্বামী কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া তাঁহার নিকট জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা ও কায়মনোবাক্যে পতিসেবা ও গৃহ কার্য্যে অনুরক্ত থাকাই তাহার ধর্ম্ম। পাণি গ্রহণ মন্ত্রে বিবাহার্থী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—হে কন্যে! অর্যমা ভগ সবিতা

---

* রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ২৭ সর্গ।

ও পুরন্ধ্রী তোমাকে গার্হস্থ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমায় সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করিবে। আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি। হে বধূ! অক্রোধ-নেত্রা ও অপতিঘাতিনী হও, পশুগণের প্রতি হিতকারিণী হও, সহৃদয়া বুদ্ধিমতী হও, তুমি বীর প্রসবিনী হও, দেবকামা হও, আমাদের ও আমাদের আত্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণ কারিণী হও। হে কন্যে! প্রজাপতি আমাদের পুত্র পৌত্রাদি প্রদান করুন, অর্য্যমা আমরণ আমাদিগকে মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণ সম্পন্না হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ কর, আমাদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি মঙ্গল কারিণী হও। হে বধূ! তুমি শ্বশুরের নিকট বাসিনী হও, শাশুড়ীর নিকট বাসিনী হও, ননদের নিকট বাসিনী হও এবং দেবরাদির নিকট বাসিনী হও।" *

অতএব হিন্দু সমাজে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সেবাধর্ম্ম শিক্ষা এবং বিবাহ সংস্কার হইলে আমরণ সতীত্ব ধর্ম্ম পালন ও সকলের সেবাভার গ্রহণ তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীভাব সম্পূর্ণ সেবার ভাব। স্ত্রীমূর্ত্তি সেবার মূর্ত্তি। এই সেবার মূর্ত্তি আপনার প্রতি আরোপ করিয়া দাসীভাবে ভগবানের সেবা শ্রীরামকৃষ্ণের সখীভাব সাধনার মর্ম্ম। ইহার ফল জিতেন্দ্রিয়তা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি লাভ।

* বৈদিক পাণিগ্রহণ মন্ত্র

বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধর্ম্মহীনতা সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। জিতেন্দ্রিয় না হইলে ধর্ম্মোপদেশ ধারণা হয়না, ভগবানে ভক্তি লাভ ত দূরের কথা। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ওজঃহীন দুর্ব্বল মস্তিষ্ক—ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার তাহার সামর্থ্য কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"একজন চৈতন্য দেবকে বল্লে,—এদের এত উপদেশ দেন তেমন উন্নতি কর্ত্তে পাচ্চেনা কেন? তিনি বল্লেন,—এরা যোষিৎসঙ্গ করে সব অপব্যয় করে, তাই ধারণা কর্ত্তে পারে না। ফুটো কলসীতে জল রাখ্‌লে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

"তাঁকে পেতে গেলে বীর্য্য ধারণ কর্ত্তে হয়। শুকদেবাদি ঊর্দ্ধরেতা। এদের রেতঃপাত কখন হয় নাই: আর এক আছে ধৈর্য্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্য্য ধারণ। বার বৎসর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধানাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ হতে থাকে; সব জান্‌তে পারে। বীর্য্যপাতে বল ক্ষয় হয়।" (ক)

ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা এবং তাহার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা একযোগে না হইলে সকল শিক্ষাই বৃথা হয়। বর্ত্তমান কালধর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন যৌবনের পূর্ব্ব হইতে একান্ত প্রয়োজন। যুবকেরা যতদিন জ্ঞান ভক্তি লাভ না করে, সদসৎ বিচারশীল না হয় ততদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে স্ত্রীলোকের নিকট থাকিতে বা

বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে সাবধান করিতেন। তিনি নিজ ভক্ত সম্প্রদায় গঠন করিবার সময় যুবক ভক্তদিগকে কিরূপ জিতেন্দ্রিয়তা ও সদসৎ বিচারশীলতা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান অবশ্য করণীয়, ইহা তাঁহার অভিমত। একদিন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণের ঘরে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী হইতে; কেন না, তাঁহার চক্ষে ব্রজ গোপীকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাভক্তি লাভ করিবার এরূপ দ্বিতীয় শুদ্ধাপাত্র আর নাই। স্ত্রীলোকের বালিকাকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান তাঁহার কতদূর অভিলষিত, তাহা ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণীকে নিজের দীক্ষাগুরু করিয়া নিশ্চয়রূপে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং স্বকীয় পত্নী শ্রীসারদাদেবীকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, বিবাহের আর এক উচ্চতম, পবিত্রতম আদর্শ আছে,—তাহা কামের মধ্য দিয়া দেহের মিলন নয়, কিন্তু প্রেমের ভিতর দিয়া আত্মার মিলন!

বিবাহিতের ও ইন্দ্রিয় সংযম বিশেষ প্রয়োজন। জিতেন্দ্রিয়তার উপর যে বিবাহিত জীবনের ভিত্তি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা বিবাহিতা কন্যাকে প্রথম তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থানের নিয়ম হইতে বুঝা যায়। * কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। সমাজের এই নিন্দিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"দুট ফুল ফেলে শুদ্ধ করে নিয়ে, ভগবতী-স্বরূপা স্ত্রী, পুরুষের ধর্ম্মলাভের সঙ্গী না হয়ে,

* সামবেদীয় বিবাহ পদ্ধতি

সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র হয়েছে!" সকল অবস্থায় পুরুষের সংযতেন্দ্রিয়তা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রে সংসারের সকল কার্য্যই ব্রহ্মচর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিবার বিধি। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

"দুই একটী ছেলে হলে স্ত্রী পুরুষে দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বে। আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়,—ছেলে পুলে আর না হয়।"

"তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে স্ত্রীকে ধর্ম্ম উপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ কর্‌বে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্ত্তমানে তার খাবার যোগাড় করে রাখ্‌তে হবে।" (ক)

যাহারা দুর্ব্বল, দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম, যাহাদের পক্ষে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন, তাহাদিগকে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিতে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহার এই সকল উক্তি। কোনরূপে ভগবানে ভক্তিলাভ করিতে পারিলে, কামিনীকাঞ্চনাসক্তি একেবারে দূর হইয়া যায়। তখন মানুষ যে সংসার করে তাহা বিদ্যার সংসার।

ভারতীয় আর্য্যসমাজে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন চিরদিন স্ত্রীলোকেই করিয়া আসিতেছে; বর্ত্তমান যুগে পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম লুপ্ত প্রায়। কিন্তু আর্য্য বিধবার ধর্ম্মনিষ্ঠার নিদর্শন, ব্রহ্মচর্য্য এখনও অটুট। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভাবে সাধন কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা জ্ঞাপক নহে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ও সহানুভূতির পরিচয় নিঃসংশয় প্রতিপাদন করে। আমরা দেখিয়াছি, এই অপূর্ব্ব সহানুভূতি ছিল বলিয়াই তিনি

বাল্যকালে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীলোকের ভিতর থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সহানুভূতির জন্যই তিনি তান্ত্রিক মহা কঠিন সাধনায় স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এই সহানুভূতির নিমিত্ত এখন তাঁহার স্ত্রীভাবে সাধনা। আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ ও দাসীভাবে সাধন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ভগবৎ সেবানুরাগী হইলে সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মপালন করিয়াও কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই ভগবানে জ্ঞান ভক্তিলাভ হইতে পারে।

সাধনা সম্পূর্ণ হইলে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তিনি এইরূপ বলিতেন,—

> "স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্‌লে অসুখ হয়, যেখানে ঠ্যাকে সেখানটা ঝন্ ঝন্ করে, যেন শিঙ্গি মাছের কাঁটা বিঁধ্‌লো।"
>
> "এরা কামিনীকাঞ্চন না হলে চলে না বল্‌ছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না। মেয়েদের গায়ে হাত লাগ্‌লে হাত আড়ষ্ট ঝন্ ঝন করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।" (ক)

তাঁহার আর এক মহা সাধনা আমরা এই সময় দেখিতে পাই। সাধনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীভাব আরোপ করিলে যেমন কামিনীর আসক্তি মন হইতে সরিয়া যায়, সদসৎ

বিচার করিলে কাঞ্চনের আসক্তি হইতেও মন সেইরূপ দূরে থাকিতে পারে। বিষয়াসক্তির মূল মন হইতে উৎপাটন করিবার জন্য তাঁহার সদসৎ বিচার পথের সাধনও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! সংসারী লোক যাহাকে জগতে একমাত্র সার বস্তু মনে করে, যাহা পাইবার জন্য এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা করিতে মানুষ পশ্চাৎপদ হয়, বিষয়াসক্তির কারণীভূত সেই কাঞ্চন লালসা অন্তর হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনের ধারণা-শক্তি ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বিচার করিয়া মনকে তিনি বুঝাইলেন যে, টাকা ও মাটি এক পদার্থ। অমনি মন ধারণা করিল যে, টাকাতে ও মাটিতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। এবং তৎক্ষণাৎ অর্থের মোহিনী আবরণ ও তাঁহার মন হইতে চিরদিনের মত উদ্ঘাটিত হইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, হস্তের দ্বারা টাকা স্পর্শ করিবার শক্তিও তাঁহার বিলুপ্ত হইল! তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি মাটিই টাকা, সোনা মাটি মাটিই সোনা, এই বলে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে মাটি ও টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম।"

তিনি যেমন দুই মুষ্টির মধ্যে মাটি ও টাকা লইয়া, ঐ কথা বার বার বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, তখনি তাঁহার মানস চক্ষে উভয়ই সমান বলিয়া ধারণা হইল। তাঁহার কথা,—"টাকা ছুঁলে, হাতে কল্লে, হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়!" পরিশেষে তাঁহার দৈহিক অবস্থা এরূপ হইল যে কোন ধাতু নির্ম্মিত বস্তুও স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

"হ্যাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্চে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিষে হাত দিবার যো নাই। একবার একটা বাটীতে হাত দিছিলাম, তা হাতে শিঙি মাছের কাঁটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন ঝন্ কর্ত্তে লাগলো। গাড়ু না ছুঁলে নয় তাই মনে কল্লাম গামছাখানা ঢাকা দিয়ে তুল্‌তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি অমনি হাতটা ঝন ঝন কন্ কন্ কর্ত্তে লাগলো—খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা কল্লাম,—মা! অমন কর্ম্ম কর্‌বো না, মা' এবার মাপ করো।" (ক)

বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ দূর হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্বচক্ষে তাঁহার কাঞ্চন স্পর্শে দেহের বিকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারেন নাই!

কামিনীকাঞ্চনাসক্তি ভগবানের পথে মহা বিঘ্ন স্বরূপ। স্ত্রীলোকের প্রতি ও অর্থের প্রতি লালসা পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি সকলকে সদসৎ বিচার করিতে বলিতেন। তাঁহার উক্তি,—

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনীকাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্‌বার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার—বস্তু বিচার। এই দেখ টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেতেই বা কিসৎ

আছে। বিচার কর,—সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্ব্বী মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?" (ক)

সদুপায়ে ও শুদ্ধভাবে অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"দেহ ও মনের শুদ্ধিকর সমুদয় পদার্থের মধ্যে অর্থ-শৌচই পরম শৌচ। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জ্জনে শুচি তিনিই প্রকৃত শুচি। অর্থ শুদ্ধি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিলে শুচি হয় না।"

"যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়, অথবা অভাব পক্ষে অল্প মাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময় এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। প্রাণ যাত্রা চলিয়া যায় এই লক্ষ্য রাখিয়া, শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয় বর্ণ বিহিত অগর্হিত কর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে। প্রাকৃত জনের ন্যায় জীবিকার দায়ে মিথ্যা কথা কহিয়া ও তোষামোদ করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবে না। মিথ্যা আত্মগুণ খ্যাপন পরিত্যাগ করিয়া, সরল ও শুদ্ধ বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবিকা যাপন করিবেন। সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধন উপার্জ্জন চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন, যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ।"

কাঞ্চনাসক্ত সংসারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

বস্তু "যার অর্থ আছে অর্থের সদ্ব্যবহার করা তার উচিত।

ঠাকুর সেবা, সাধুভক্তের সেবা, সম্মুখে কেউ গরিব পড়্‌লে তার উপকার করা,—এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য টাকা নয়, দেহের সুখের জন্য টাকা নয়, লোক মান্যের জন্য টাকা নয়।"

"অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবানের সেবা। বেশী উপায়ের চেষ্টা কর্‌বে কিন্তু সদুপায়ে,—উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নয়—ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকায় যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।"

"সংসারে টাকার দরকার বটে কিন্তু ও গুলোর জন্য অত ভেবনা। যাঁরা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে, যারা তাঁর ভক্ত ও শরণাগত তারা ও সব অত ভাবেনা—যত্র আয় তত্র ব্যয়। একদিক থেকে টাকা আসে আর একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়—এর নাম যদৃচ্ছালাভ, গীতায় আছে। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, ঈশ্বরের সেবা সাধুভক্তের সেবা করে তাতে দোষ নাই।" (ক)

বিষয়ের উপভোগ দ্বারা ভোগ বাসনা কখন তৃপ্তি হয় না। আর ভোগ বাসনার প্রতি বৈরাগ্য না হইলে ভগবান্ লাভ ও হয় না। কিন্তু ভোগ বাসনা ত্যাগ হইবার পূর্ব্বে বিষয় উপভোগের ও প্রয়োজন। সুখের আশায় বিষয় উপভোগ করিতে করিতে, যখন সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগই হইতে থাকে, তখনই বিষয় বিরাগ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ বিষয় ভোগের বাসনা অন্তরে থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করিবেই। ভোগসুখে অতৃপ্ত ব্যক্তিকে বৈরাগ্যের

উপদেশ দান বৃথা। সদসৎ বিচারে তাহার অন্তর সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। সুতরাং প্রথমে তাহাকে ভোগ বাসনা, অর্থ ও কামের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। বিষয়াসক্ত মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। আশার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মানুষ যখন পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তখনই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

> "যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম্ম। একটী পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্য মনস্কে বসেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতরে ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়লো। তখন পাখীর চট্‌কা ভাঙ্‌লো। সে দেখ্‌লে চতুর্দ্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল তবু কূল কিনারা দেখ্‌তে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তুলে বস্‌ল। অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল, এবার পূর্ব্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখ্‌তে পেলেনা। চারিদিকে কেবল অকূলপাথার। তখন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বস্‌ল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে, ঐরূপ আবার পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখ্‌লে কোথাও কূল কিনারা নাই, তখন সেই যে মাস্তুলের উপর বস্‌ল

আর উঠ্‌লনা। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত। হয়েছে আর কোনও চেষ্টা নাই।"

"সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়, যখন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ না কল্লে ত্যাগ হয় না। কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ। এই আছে এই নাই। প্রায় মেঘ বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না: দুঃখের ভাগই বেশী। আর কামিনী কাঞ্চনের মেঘ সূর্য্যকে দেখ্‌তে দেয় না।"

সদসৎ বিচার করিয়া ভোগ বাসনা কিরূপে ত্যাগ করিতে হয় তিনি তাহাই শিক্ষা দিতেছেন,—

"কামনা থাক্‌তে, ভোগ লালসা থাক্‌তে মুক্তি নাই। সংসার ভোগের স্থান। এক একটী জিনিষ ভোগ করে ত্যাগ কর্ত্তে হয়। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি রাজসিক ভাবের আরোপ কর্ত্তাম ত্যাগ করবার জন্য। সাধ হয়ে ছিল যে খুব ভাল সাঁচ্চা জরির পোষাক পরবো, আঙ্‌টী আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজবাবু নূতন সাজ গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে। সাঁচ্চা জরির পোষাক পর্‌লাম। খানিকক্ষণ পরে মনকে বল্লাম—মন, এর নাম সাঁচ্চা জরির পোষাক। এই সাজে

রজোগুণ হয়। তখন সেগুলকে খুলে ফেলে দিলাম, পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্‌লাম, আর তার উপর থু থু কর্ত্তে লাগ্‌লাম। আর ভাল লাগ্‌লো না। মনকে বল্লাম,—মন এর নাম শাল—এরই নাম আঙ্‌টী। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টান্‌তে লাগ্‌লাম,—একবার এপাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে, নীচু থেকে। তখন বল্লাম—মন, এরই নাম নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

"বড় বাজারের রং করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হলো—এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলাম,—তারপর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের শরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছেলে বেলায় গঙ্গা নাইবার সময়,—তখন নাথের বাগানে—একটী ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখে ছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পর্‌তে সাধ হলো। তা বেশীক্ষণ পরবার যো নাই। গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্‌ শিড়্‌ করে উপরে বায়ু উঠ্‌তে লাগ্‌লো, সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনা? একটু রেখেই খুলে ফেল্‌তে হলো। তা না হলে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে। শম্ভুর চণ্ডীর গান শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল। সে গান শোনার পর আবার রাজনারাণের চণ্ডী শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল,—তাও শোনা হলো।"

"অনেক সাধুরা সে সময় আস্‌তো। তা সাধ হলো

তাদের সেবার জন্য আলাদা একটী ভাঁড়ার হয়! সেজ-বাবু তাই আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে,—সাধু সেবার জন্য। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে কাঠ এসব দেওয়া হতো। গাড়ী পাল্কি যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনি খতাত—প্রতাপরুদ্র!” (ক)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—“বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে সকল ভোগ তাহারা দুঃখের কারণ, যেহেতু উহা অজ্ঞানের কার্য্য। এই সংসারে সুখের লেশ মাত্র নাই, ইহা বুঝিয়া বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করিবে। তাহারা কেবল যে দুঃখ যোনি তাহাই নহে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী—তাহাদের আদিও অন্ত আছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই ভোগের আদি এবং তাহার বিয়োগই ভোগের অন্ত। সুতরাং সকল ভোগই অনিত্য। হে কৌন্তেয়! বিবেকী ব্যক্তি সেই ভোগ সমূহে প্রীতি লাভ করে না। কারণ সে ভোগের অসারতা বুঝিয়াছে এবং নিত্য ব্রহ্মের ও স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। পশু পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা অত্যন্ত মূঢ় তাহাদেরই বিষয় সমূহে প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।” *

মানুষ যখন সুখের আশায় কোন বিষয় উপভোগে রত হয়, সে সদসৎ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে যে, সেই ভোগসুখ অনিত্য, আর সেই বিষয় ভোগ হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার অন্ত নাই। ইহা ধারণা হইলে তাহার

* গীতা পঞ্চম অধ্যায় ২২ শ্লোক শঙ্কর ভাষ্য।

বাবু যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানগৃহস্থ শিশুখ্রীষ্টের চিত্র

শ্রীযুক্ত বাবু প্রদ্যুম্ননাথ মল্লিক
মহাশয়ের সৌজন্যতায় গৃহীত হইয়াছে

সে বিষয় ভোগে বৈরাগ্য আপনি উদয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ভোগ বাসনা তৃপ্তি করিতে যাহা যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইল, তাহা লোক শিক্ষা, বিশেষতঃ সাধকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত। তাঁহার কার্য্য ও উক্তি সকল বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হয়। তাঁহার উক্তি ও উপমা গুলি কেবল কাল্পনিক উপদেশ বা উপকথা নহে, কিন্তু সে সকল তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সত্য। তাঁহার উক্তি সকল তাঁহার জীবন চরিত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ; তাঁহার সাধন লব্ধ জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সেই নিমিত্ত তাঁহার উক্তি ও উপমা কেবল পাঠ বা শ্রবণ করা অপেক্ষা, তিনি তাহাদিগের মর্ম্ম জীবনে সাধনা করিয়া অনুধাবণ করিতে বলিতেন। নিজ নিজ অন্তরে দাসী-ভাব, সন্তান ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের আরোপ ও কর্ম্মক্ষেত্রে সদসৎ বিচার করিয়া কার্য্য করিলে, মানুষ সহজে অসার ভোগ সুখ বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার শিক্ষা।

বিষয় ভোগের বাসনা হইতে তাঁহার মন যেমন সম্পূর্ণ বিরক্ত হইল, কোনরূপ স্বত্ববুদ্ধি বা সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বলিতেন,—

"সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর কর্‌বে। তাদের সঞ্চয় কর্ত্তে নাই। ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রব লেশ মাত্র ও থাক্‌বে না। টাকা নিজের হাতে ত লবেনা, আবার কাছে ও রাখ্‌তে দেবে না। লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারী বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসতো। বিছানা ময়লা দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার

টাকা লিখে দোবো, তার সুদে তোমায় সেবা চল্‌বে। যাই ও কথা বল্লে, অম্‌নি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লাম—তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তাহলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই। সে ভারি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বল্লে—তাহলে এখনও আপনার ত্যাজ্য গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বল্লাম —আমার বাপু এত দূর হয় নাই! লক্ষ্মীনারাণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে। আমি বল্লাম,—তাহলে আমায় বলতে হবে—একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। সে সব হবে না। আরশির কাছে জিনিষ থাক্‌লে প্রতিবিম্ব হবে না?"

"মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে,—তা লতে পার্‌লাম না। এক খানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুন্‌লাম। সেজবাবু আর হৃদে এক সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজ-বাবুকে বল্লাম,—দ্যাখো অমন বুদ্ধি করোনা, ওতে আমার ভারি হানি হবে।"

"আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমি ও দেশে রেজেষ্ট্রি কর্ত্তে গিছলাম। আমায় সই কর্ত্তে বল্লে। আমি সই কল্লুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই! আম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় কর্ত্তে নাই।"

"সঞ্চয় করবার যো নাই। শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম,—তখন পেটের অসুখ। শম্ভু বল্লে একটু একটু আফিম খেও, তাহলে কম পড়্‌বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আস্‌ছি ফটকের কাছে কে জানে ঘুরতে লাগ্‌লাম যেন পথ খুঁজে পাচ্চি না। তারপর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।"

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আস্‌ছি, আর চল্‌তে পারলাম না,—দাঁড়িয়ে পর্‌লাম। তারপর সেগুল একটা ডোবের মত জায়গায় রাখ্‌তে হলো, তবে আস্‌তে পারলাম।" (ক)

"বেটুয়া করে পান আন্‌বার যো নাই, কোন জিনিষ সঙ্গে করে আনবার যো নাই, তাহলে সঞ্চয় হলো কি না! হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে পারিনা।" (ক)

আপনার উপর স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া এবং সদসৎ বিচার দ্বারা, শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন মন হইতে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন হইতে কামিনীকাঞ্চনের চিন্তা মাত্র মনে উদয় হইলে অসহ্য যন্ত্রণা হইত, এবং তাহাদের স্পর্শ মাত্রে দেহে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন। তাঁহার দেহ ও মন মিশিয়া যেন একটী হইয়া গিয়াছিল। ত্যাগের কি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই! একবার যাহা মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মনের ভ্রমে ও যদি তাহা গ্রহণ করিতে যান, তাঁহার দেহ তাহাতে বিরোধী হইয়া থাকে! কোথায়

সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি কামিনীকাঞ্চনের স্পর্শ মাত্রে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় কাতর হন, ভ্রমেও তিলার্দ্ধবস্তু নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম! শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কেবল অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নয়, ইহার অলৌকিক রহস্য আমাদের চিন্তার ও অগম্য!

১২৬৩ সালের শেষভাগ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে যখন তাঁহার বিবাহ হয়, তখন সেই অবস্থা কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। কিন্তু পর বৎসরে ১২৬৭ সালে আবার তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানোন্মাদের অবস্থা। যখন তিনি সখীভাব সাধন করেন, সে সময় তাঁহার জ্ঞানোন্মাদ প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণই প্রায় মহাভাবে মত্ত। সম্ভবতঃ ১২৬৮ সাল হইতে তাঁহার সহজাবস্থা হইয়াছিল। সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমেই পুত্র শোক সন্তপ্তা মাতাদেবীকে গঙ্গাতীরে বাস করাইবার নিমিত্ত কালীবাড়ীতে আনাইয়া আপনার কাছে রাখিলেন। উদ্যানের উত্তরের নহবৎ ঘরে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে মাতার নিকট আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ এবং দৈহিক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কিছু সময় ধরিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন। ১২৬৯ সালের ফাল্গুন মাসে ৺কাশীধামের রেলপথ প্রথম খোলা হইলে, তীর্থ-যাত্রার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী ও প্রয়োগ তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন।

শুনা যায়, মথুর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কালীবাড়ীর পূজক রাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কখন কালীবাড়ীতে ও কখন মথুর বাবুর নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার সাধক ও সাধুভক্ত দিগকে দেখিতে ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইত। কখন মথুরবাবু তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন, কখন তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এই উপলক্ষে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, কত্তাম তবু আমায় খুব মান্‌তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হলো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলাম জান্‌তে, অভিমান আছে কি না। শুন্‌লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দ্যাখা হলে, এত বড় জ্ঞানী আর পণ্ডিত, আমার মুখে রাম প্রসাদের গান শুনে কান্না। কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বল্লে,—ভক্তের সঙ্গ কর্ব্বে কামনা ত্যাগ কর, নচেৎ নানা রকমের লোক তোমায় পতিত কর্ব্বে। বৈষ্ণব চরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল। আমায় আবার বল্লে,—আপনি একটু শুনুন। একটা

সভায় বিচার হয়েছিল, - শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা কল্লে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বল্লে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিব ও দ্যাখে নাই, ব্রহ্মাও দ্যাখে নাই!"

"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বল্লে,—ও সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বল্‌বো, বল্লাম,—কে জানে বাপু আমার টাকা কড়ি ও সব ভাল লাগে না। পদ্মলোচন বলে ছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাবো তার আর কি? তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ী গিয়ে খেতে পারি। বলেছিল, তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বল্‌বো। তারপর কিন্তু তার মৃত্যু হলো।" (ক)

পণ্ডিত পদ্মলোচন শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার কল্প পুরুষ ধারণা করিয়াছিলেন। জয়পুরের পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী ও এ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই কালীবাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রের সাধন সময় তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রীর কথায় তিনি বলিতেন,—

"নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল। তবুও হর হর বল্‌তে বল্‌তে ভাব হতো। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত কর্ত্তে চেয়ে ছিল, তা সে কাজ স্বীকার কল্লে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকৃতো।" (ক)

শুনা যায়, নারায়ণ শাস্ত্রী পঞ্চবটীতে সাধনা করিয়াছিলেন। একদিন ধ্যান করিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণে দৈবশক্তির প্রকাশ বুঝিতে পারেন এবং সেই অবধি তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বহু বৎসর আনুগত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সঙ্গে ১২৭১ সালের কোন সময় আদি ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছিলেন। তখন কেশবচন্দ্র আদি সমাজের একজন উপাচার্য্য। তিনি বলিতেন,—

"কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাদের (বেদীর) উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝ খানে বসেছে। ধ্যান কচ্চে দেখ্‌লাম যেন কাষ্ঠবৎ। তখন ছোকরা বয়েস। সেজবাবুকে বল্লাম,—দ্যাখ, যতগুলি ধ্যান কচ্চে এই ছোকরার ফতা ডুবেছে,—বঁড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুর্চ্চে। ঐ ধ্যান টুকু ছিল বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুলা মনে করেছিল হয়ে গেল।" (ক)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ও তাঁহার এ সময় আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সেজবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখ্‌তে গিছ্‌লাম। সেজোবাবুকে বল্লাম,—আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে; আমার তাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়। সেজবাবু বল্লে,—আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাবো। আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তাম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে। সেজবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দ্যাখা হলো। দেখে দেবেন্দ্র বল্লে—তোমার একটু বদ্‌লেছে—তোমার

ভুঁড়ি হয়েছে। সেজবাবু আমার কথা বল্লে—ইনি তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন, ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বল্লাম—দেখি গা, তোমার গা। দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্লে,—দেখলাম, গৌরবর্ণ তার উপর সিঁদুর ছড়ান। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই। প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখে ছিলাম। তা হবে না গা! অত ঐশ্বর্য্য বিদ্যা মান সম্ভ্রম! অভিমান দেখে সেজবাবুকে বল্লাম, - আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি, আমি পণ্ডিত আমি জ্ঞানী আমি ধনী বলে অভিমান থাকৃতে পারে? দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হলো। সেই অবস্থাটী হলে কে কিরূপ লোক দেখ্‌তে পাই। আমার ভিতর থেকে হি হি করে একটা হাসি উঠ্‌লো। যখন ঐ অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই তখন খড় কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠ্‌ছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর!"

"দেখ্‌লাম, যোগ ভোগ দুইই আছে। অনেক ছেলে পুলে ছোট ছোট,—ডাক্তার এসেছে। তবেই হলো, অতো জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্ব্বদা থাকৃতে হয়। বল্লাম—তুমি কলির জনক। জনক, 'এদেকি উদিক দুদিক রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটী।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন

রেখেছ শুনে তোমায় দেখ্‌তে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও। তৎ বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বল্লে,—এই জগৎ যেন একটী ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে, এক একটী ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান কর্ত্তাম, ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলাম, তবে ত খুব বড় লোক। ব্যাখ্যা কর্ত্তে বল্লাম, তা বল্লে,—এ জগৎ কে জান্‌ত? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাক্‌লে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না।”

“অনেক কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র খুসি হয়ে বল্লে,—আপনাকে উৎসবে আস্‌তে হবে। আমি বল্লাম,—সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার ত এই অবস্থা দেখ্‌ছ, কখন কি ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে—না আস্‌তে হবে, তবে ধুতি আর উড়নী পরে এসো; তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বল্লে আমার কষ্ট হবে। আমি বল্লাম,—তা পারবো না, আমি বাবু হতে পার্‌বো না। দেবেন্দ্র সেজবাবু সব হাস্‌তে লাগ্‌লো। তার পরদিনই সেজবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো,—আমাকে উৎসবে দেখ্‌তে যেতে বারণ করেছে। বল্লে,—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়নী থাক্‌বে না।” (ক)

এ সময় তাঁহার অপর এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা লক্ষিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, কিরূপে তাঁহার নৈমিত্তিক পূজাদিক

উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সন্ধ্যা তর্পণাদি নিত্যকর্ম্ম ও তিনি করিতে অক্ষম হইলেন। এই সকল নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দেহের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, চেষ্টা করিলেও কোনরূপ ক্রিয়া তিনি আর সম্পন্ন করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "সমাধি হলে সব কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জপাদিকর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়ে যায়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাঁর নাম-গুণ-গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। আমার এই অবস্থার পর তর্পণ কর্ত্তে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জিজ্ঞাসা কল্লাম,—দাদা, এ কি হলো? হলধারী বল্লে—'একে গলিত হস্ত বলে।' ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকে না। এ অবস্থায় সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ অপূর্ব্ব সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসাবস্থাই জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম মীমাংসা করিয়া দেয়। মোক্ষের কারণ কেবল জ্ঞান বা কেবল নিত্য নৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম বা জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়, ইহা লইয়া বৈদিককাল হইতে বিভিন্ন বিরোধী মত প্রচলিত আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ নিরসন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুপম গীতায় ভাষ্যে অদ্ভুত প্রাতিভ জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণীত হইয়াছে যে, জ্ঞানের উদ

নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যায়; কর্ম্মে ইচ্ছা থাকিলেও সাধকের দেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম। যুগ যুগান্তর ধরিয়া শাস্ত্র বিচারে যাহা অমীমাংসিত ছিল, তাহার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কি, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল নিত্যকর্ম্মে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নহে। এ সমুদয় কর্ম্ম করিবার কালাকালের জ্ঞান ও তাঁহার বিস্মৃতি হইয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বল্লাম,—দাদা, আজ কি অমাবস্যা? শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস কর্বে কেন? হলধারী বল্লে—এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে। যার অমাবস্যা পূর্ণিমা বোধ নাই! এ অবস্থায় অমুকদিন মনে থাকে না। অমুকদিন সংক্রান্তি ভাল করে হরিনাম কর্বো, এ সব আর ঠিক থাকে না। ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলেই এই অবস্থা! (ক)

এরূপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ ও বৈধকর্ম্ম করিবার কালাকালের জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া তাঁহার কর্ম্ম সন্ন্যাসাবস্থা হইয়াছিল। ইহাই কর্ম্ম ত্যাগের পূর্ণাবস্থা, প্রকৃত সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী সর্ব্ববিধ বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য বৈরাগ্য আশ্রয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ মন সর্পের নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞানযোগে অবস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইল। তিনি বলিতেন,—

> "তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বল্লাম,—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

মা! এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই এমন অবস্থা করে দাও। তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে, রইলাম।" (ক)

"আমি ও তুমি" ভক্ত ও ভগবান, এই ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতভাব সাধন আরম্ভ করিলেন।

বেদমতে সাধন।

আমরা দেখিয়াছি বিষয়ভোগবাসনা ও কামিনীকাঞ্চনাসক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং কিরূপ সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস পূর্ব্বক এক মাত্র ভগবানই তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিল। এখন কেবল 'আমি ভক্ত' এই যে অভিমান রেখার মত তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান, তাহাও বিসর্জ্জন দিবার জন্য তাঁহার বেদমতে সাধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার সার উপদেশ দিলেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ ১৮।৬৮

শ্রুতি স্মৃতিতে উক্ত সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈধকর্ম্মের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শ্রোতব্য শ্রুত সমস্ত দূর করিয়া দিয়া, মদেকশরণ হও, অর্থাৎ আমি যে সর্ব্ব দেহীর আত্মা ও ঈশ্বর আমার সর্ব্বাত্মভাবে শরণ লও,—একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। এইরূপ হইলে ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইবে ইহা ভাবিয়া শোক করিও না, কারণ মদেকশরণ তুমি, তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বন্ধন হইতে আমি মুক্ত করিব,—তুমি আমার দ্বারা অকুতোভয় হইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ব্যাখায় বলিয়াছেন,—"সকল

প্রকার ভেদজ্ঞান দূর করিয়া এক অদ্বৈতজ্ঞানই মোক্ষের উপায়। কর্ম্মের মূল অবিদ্যা। বিদ্যার উদয় হইলে শুভই হউক অশুভই হউক সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয়। অবিদ্যা ও বাসনা এই দুইটী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বিহিত ও অবিহিত সকল কর্ম্মের মূল কারণ। "আমি কর্ত্তা", "আমার কর্ম্ম", এই প্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। "আমি এক" "আমি কর্ত্তা নহি", "আমার ক্রিয়া নাই," এই প্রকার জ্ঞান অবিদ্যার নাশক। এই প্রকার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, কর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ যে ভেদবুদ্ধি ও অহঙ্কার, তাহার নাশ হয়। মোক্ষ নিত্যবস্তু, তাহা কোন কার্য্য নহে, এই কারণে কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশ হইলেই, মোক্ষরূপ ফল আপনিই আবির্ভূত হয়। আত্মস্বরূপ প্রকাশই জ্ঞানের ফল। জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক। অবিদ্যা সম্ভূত কর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ। এই কারণে জ্ঞানই কেবল মোক্ষের সাধন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়।" তাঁহাকে জানা ছাড়া মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। কর্ম্মের অধিকারী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস এবং তৎ পূর্ব্বক জ্ঞান নিষ্ঠাই বিহিত। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া কিম্বা কাহারও দ্বারা না করাইয়া, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সকল প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অভিমান, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা", এই অভিমান, পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত

শরীরে প্রসন্ন চিত্তে বাস করেন। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—যাহারা অনন্য অর্থাৎ ভগবান্‌কে যাহারা আত্মভাবে পাইয়াছে, তাহারা অনবরত ধ্যান পরায়ণ হইয়া আমার উপাসনা করে। সেই প্রীতির সহিত আমার ধ্যান নিরত ব্যক্তিগণের যোগ অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি, এবং ক্ষেম অর্থাৎ সেই লব্ধ বস্তুর রক্ষা, আমিই বহন করিয়া থাকি।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকল প্রকার অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি কর্ত্তা নই, কিন্তু ভগবানই এক মাত্র কর্ত্তা" জানিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করে, তাহারই নিকট ভগবান আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষের অধিকারী করিয়া থাকেন। যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার "আমি কর্ত্তা" এই জ্ঞান থাকে না। যে পর্যন্ত অবিদ্যা বা ভ্রান্তি থাকে, সেই পর্যান্তই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অহংভাব আরোপিত হয় এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে সকল কার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান বা অহঙ্কার থাকিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ;—

> "জ্ঞান অজ্ঞানের পার হলে তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন—এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কার থাক্‌তে মুক্তি নাই।"
>
> "অহঙ্কার অভিমান, তমোগুণ—অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। যে "আমিতে" সংসারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে সেই "আমিই" খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ

হয়েছে এই আমি মাঝ খানে আছে বলে। জীবের "অহঙ্কার" আড়াল আছে বলে ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পায় না। অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এই 'অহঙ্কার'রূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না কল্লে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। এই 'মায়া' বা অহং মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না। কিন্তু সূর্য্য ভ্যাখা যাচ্চে না বলে কি সূর্য্য নাই? সূর্য্য ঠিক আছে। মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে ভ্যাখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। এই দ্যাখ, এই গামছাখানা আমি মুখের সাম্‌নে আড়াল কচ্চি। আর আমায় তোমরা দেখ্‌তে পাচ্চ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চ না। জীবতো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।"

"অহঙ্কার উপাধি এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। আমি পণ্ডিত, আমি অমুকের ছেলে, আমি ধনী, আমি মানী, এ সব উপাধি ত্যাগ হইলেই দর্শন।"

"আত্মা স্বপ্রকাশ। কেবল অহং আড়াল করে রেখেছে। অহংজ্ঞান চলে গেলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান কোদালে অভিমান রাবিশের ঢিপি—জাতি অভিমান, বিদ্যা অভিমান, ঐশ্বর্য্যের অভিমান ইত্যাদি, কেটে ফেল্লে আত্মদর্শন হয়।"

"যতক্ষণ 'অহঙ্কার' থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। আর যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ মুক্তিও হয় না। "আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আস্তে হয়। গরু হাম্বা হাম্বা—আমি আমি—করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই। হয়ত তাকে কষায়ে কাটে। মাংসগুলো লোকে খায়। চামড়ায় ঢাক্ তইরি হয়, আর কাটী দিয়ে সেই ঢাক পেটে। তাতে ও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া থেকে জুতা তইরি করে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে। তাতে ও দুর্গতির শেষ হয় না। অবশেষে নাড়ী ভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু—তুমি তুমি—করে তখন নিস্তার হয়। যখন জীব বলে—নাহং নাহং—আমি কেহ নই, আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তুমি প্রভু, আমি দাস—তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি। তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্তে হয় না। যদি ঈশ্বরের

কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"

"তুমি' আর 'তোমার' এইটী জ্ঞান। 'আমি' আর 'আমার' এইটী অজ্ঞান। এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কচ্চো, আর তুমিই আমার আপনার লোক, আর তোমার এই সমস্ত—ঘর বাড়ী পরিবার আত্মীয় বন্ধু, সমস্ত জগৎ—সব তোমার। আর আমি সব কচ্চি, আমি কর্ত্তা, আমার ঘর বাড়ী পরিবার ছেলে পুলে বন্ধু বিষয় টাকা বিদ্যা ঐশ্বর্য্য এ সব অজ্ঞান।"

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্ব্বদাই মনে করে 'আমিই' এই সব কচ্চি। আর গৃহ পরিবার এ সব 'আমার'। দাঁত ছর্কুটে বলে, এদের—মাগ ছেলেদের, কি হবে? আমি না থাক্‌লে এদের কি করে চল্‌বে? আমার স্ত্রী পরিবার কে দেখ্‌বে?"

"গুরু শিষ্যকে বল্লেন,—ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। সংসার মিথ্যা। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। শিষ্য বল্লে,—আজ্ঞা, আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী, এরা তো খুব যত্ন করে, না দেখ্‌লে অন্ধকার দ্যাখেন, কত ভালবাসেন। এঁদের ছেড়ে কেমন করে যাব? গুরু বল্লেন,—তুমি আমার আমার কচ্চো বটে, আর বল্‌চো ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্চি, কেউ তোমার নয়। আমি তোমায় একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্চি। সেইটে

কল্লে বুঝ্বে, সত্য ভালবাসে কি না। এই বলে একটী ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বল্লেন—এইটী খেও, তা হলে মড়ার মত হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞান যাবে না, সব দেখ্তে শুন্তে পাবে। তার পর আমি গেলে, তোমার ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা হবে।

"শিষ্যটী ঠিক ঐরূপ কল্লে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সকলে আছড়া পিছড়ি করে কাঁদ্তে লাগ্লো। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ এসে বল্লে—কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্লে, এ ছেলেটী মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এ ত মরে নাই! আমি একটী ঔষধ দিচ্ছি খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্লেন,—তবে একটী কথা আছে, এই ঔষধটী আগে একজনকে খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। আর যিনি আগে খাবেন তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। তা, এর তো অনেক আপনার লোক আছে দেখ্ছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা, কি স্ত্রী এঁরা তো সব আছেন, এঁরা অবশ্য খেতে পারেন। তখন তারা সব কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। মা, কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লেন—বাবা আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে। আমি গেলে কে এ সব দেখ্বে শুন্বে, কে তাদের খাওয়াবে, তার জন্য ভাবছি। পরিবার ও খুব কাঁদ্ছিলেন,—দিদি গো, আমার কি হলো গো, বলে।

তিনি শুন্‌লেন. যে ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বল্‌তে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়েছে গো, আমার অবগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে? আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বল্লেন, তোমার আপনার কেবল একজন,—ঈশ্বর।"

"'আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান। বিচার কর্ত্তে গেলে যাকে 'আমি' 'আমি' কচ্ছো দেখ্‌বে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর,—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখ্‌বে তুমি কিছু নও, তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার—আমি কিছু করি নাই, আমার দোষ ও নাই, গুণ ও নাই, পাপও নাই, পুণ্যও নাই!" (ক)

যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হয়, অহঙ্কারের নাশ হয়, সেই জ্ঞান লাভের উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

"ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশ মাত্র থাক্‌লে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাট্‌ত! সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা কর্ত্তো। রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফল মূল খেত। দ্যাখা শুনা ছোঁয়া এসব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখ্‌তো,—তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ কর্ত্তো। এ সাধনে আ্যাকেবারে বিষয়বুদ্ধির লেশ

মাত্র থাক্‌লে হবে না। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদপে থাক্‌বে না, তবে শুদ্ধমন। সেই শুদ্ধমন ও যা শুদ্ধআত্মা ও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন অ্যাকেবারে থাক্‌বে না। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি হয়।”

“স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হওনা কেন, কাজলের ঘরে থাক্‌লে গায়ে কালী লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক সঙ্গ খুব দোষের। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। সন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন দুই ত্যাগ কর্ব্বে,—যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না, তেমনি কাঞ্চন, টাকা স্পর্শ কর্ব্বে না। টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাক্‌লে কত খারাপ—হিসাব দুশ্চিন্তা টাকার অহঙ্কার লোকের উপর ক্রোধ কাছে থাক্‌লে এই সব এসে পড়ে। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়, জিতেন্দ্রিয় হয়, তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন এইরূপ ত্যাগ কর্ব্বে। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখ্‌লে তবে ত লোকের সাহস হবে, তবে ত তারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয় তবে কে দিবে?”

"মন থেকে কামিনীকাঞ্চন গেলে তখন আর একটা অবস্থা হয়,—ঈশ্বরই কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা। আমি না হলে হবে না এরূপ জ্ঞান থাক্‌বে না,—সুখে দুঃখে।" (ক)

যখন 'আমি অকর্ত্তা' ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, এই মনোভাব অন্তরে দৃঢ় ধারণা হয়, তখন দেহাত্মজ্ঞান ও বিষয়বাসনা সমস্ত চলিয়া যায়, সর্ব্ব প্রকার বৈধকর্ম্ম ও জীবন মাত্র ধারণ ভিন্ন কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ হইয়া যায়, বং ভগবানে অনন্য মন হইয়া সম্পূর্ণ শরণাগতি ও নির্ভরশীলতা উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তিনিই, যাঁহার 'আমি কর্ত্তা' এই বোধ দূর হইয়াছে, মন আর রূপ রসাদি বিষয়ে আবদ্ধ নয়, কামিনীকাঞ্চনে যাঁহার আসক্তি নাই এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল কর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই এক মাত্র আশ্রয় করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতভাব সাধন করিবার সুযোগ শীঘ্রই আগমন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১২৭১ সালে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে উপস্থিত হন। দেবালয়ে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাকে বেদান্তে অধিকারী বুঝিতে পারিয়া সাধনা করিবার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতভাব সাধন করিবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে গুরু রূপে তোতাপুরী ঈশ্বরেচ্ছায় আগত বুঝিয়া সাধনা করিবেন কি না তৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকালী মাতার সম্মতি লইয়া পুরিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

শুনা যায়, জননীর শোক সন্তপ্ত হৃদয় পাছে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ জানিতে পারিলে অধিকতর ব্যাকুল হয়, এজন্য তিনি বাহিরে করেন নাই। তিনি বলিতেন—

"বেদ মতের সাধনের সময় সন্ন্যাস নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনীতে পড়ে থাক্‌তাম। হৃদুকে বল্‌তাম—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি চাঁদনীতে ভাত খাবো।" (ক)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জ্ঞানী জ্ঞানপথ—বিচারপথ অবলম্বন করেন। তাঁহার উক্তি,—

"জ্ঞানপথ কি?—না যে পথ দিয়ে স্বস্বরূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ। জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান—এরই নাম মুক্তি। পরমব্রহ্ম, ইনিই আমার নিজের স্বরূপ—আমি আর পরম-ব্রহ্ম এক, মায়ার দরুণ দেখ্‌তে দ্যায় না।"

জ্ঞানীর নিজের স্বরূপ যে পরমব্রহ্ম, যিনি এক মাত্র জ্ঞেয়বস্তু, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীর জ্ঞেয় সেই পরমব্রহ্মের স্বরূপ ও অদ্বৈত-বাদের সারতত্ত্ব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩।১২

জ্ঞানীর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বলিতেছি, যাহার জ্ঞান হইলে লোক অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেই জ্ঞেয় বস্তুর আদি নাই, তিনি অনাদি ও পরম ব্রহ্ম। সেই জ্ঞেয় সৎ—অস্তি, ইহাও বলা যায় না এবং উহা অসৎ—নাস্তি, তাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র

বেদরূপ শব্দ প্রমাণের বিষয়,—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। এই জন্য তিনি অস্তি ও নাস্তি কোন শব্দের দ্বারা, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা, জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় বুদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না।

শ্রুতি বলেন,-

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

যিনি পরমাত্মা তাঁহাকে বাক্য দ্বারা অথবা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ অন্য কোন ইন্দ্রিয়েরই দ্বারা পাওয়া যায় তিনি সর্ব বি রহিত জ্ঞানের অবিষয় হইলেও জগতের মূল বলিয়া তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। এজন্য তিনি অস্তি, আছেনই বলিতে হইবে, ইহা ব্যতীত আর কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্ব ভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্ব ভাবঃ প্রসীদতি ॥

সৎ বা অস্তি রূপে প্রতীয়মান, জগৎকার্য্য রূপ উপাধির দ্বারা, জগতের মূল আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞান হয়। এইরূপ উপাধি বিশিষ্ট যে অস্তিত্ব জ্ঞান, ও তাহারও পার যে সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য তত্ত্বভাব, এই উভয়ের মধ্যে যে নিরুপাধি তত্ত্বভাব অর্থাৎ যাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, অদ্বয় স্বভাব, যাহা নেতি নেতি শ্রুতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই নিরুপাধি তত্ত্বভাব রূপেই আত্মার উপলব্ধি করিতে হইবে। অস্তি বলিয়া যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন আত্মা তাঁহার পক্ষে প্রসন্ন হন।

সৎ বা অস্তি এই শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ব্রহ্ম সে জ্ঞানের

বিষয় না হওয়াতে, 'ব্রহ্ম নাই' এই প্রকার সংশয় হইতে পারে; সেই সংশয় নিবারণের জন্য বলিতেছেন,

সর্ব্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩। ৩

যদিও কোনরূপ শব্দের দ্বারা সর্ব্ব উপাধি বর্জ্জিত, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু কেবল উপাধি দ্বারা কোনরূপে তাঁহার স্বরূপকে গৌণ ভাবে বুঝা যাইতে পারে। জীবদেহের হস্ত পাদ প্রভৃতি উপাধি লইয়া বুঝা যায় যে, সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অঙ্গ যাহা কিছু হস্ত পাদ আছে সেই সকল হস্ত পাদের কার্য্য,—ধারণ, চলন ইত্যাদি দ্বারা জীবভাবে দেহস্থিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মসত্বার জ্ঞাপক। এই জন্য বলা যায় যে, সকল দিকেই তাঁহার (অনন্ত) হস্ত ও পাদ, তাঁহার চক্ষু মস্তক মুখ সকল দিকেই রহিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ। সেই ব্রহ্ম এই বিশ্বের সকল প্রাণীশরীরের সকল প্রদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

সেই জ্ঞেয় আত্মা যখন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপাধির সহিত মিলিত রহিয়াছেন তখন বাস্তবিক উহা দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট জড় বা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কেন বিবেচিত না হইবে? এই প্রকার শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন,—

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।

অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ॥ ১৩।১৪

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, এই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ—সঙ্কল্প চেষ্টা প্রভৃতি তাহার দ্বারা আত্মা যেন

ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ হন ; বাস্তবিক আত্মা কথন ব্যাপৃত হন না। কারণ আত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অর্থাৎ, সাক্ষাৎ ভাবে এই সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত, এই জন্য তাহা 'অসক্ত'—কাহার ও সহিত যুক্ত নয়। সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত হইলেও উহা সর্ব্বভৃৎ—সকল বস্তুকেই ধারণ করিয়া থাকে। এ জগতের সকল বস্তুই সৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্ম যদিও নির্গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ বিরহিত কিন্তু তিনি গুণত্রয়ের পরিণাম, সুখ দুঃখ ও মোহের ভোক্তা—উপলব্ধা বা প্রকাশয়িতা।

শ্রুতি বলেন,—

আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥

এই আত্মা উপাধিতে উপহিত হইয়া, অচল হইয়া ও দূরে বিচরণ করেন ; শয়ান থাকিয়া ও সর্ব্বত্র গমন করেন। হর্ষ ও অহর্ষ এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবান্ দেবতাকে, আমাদের ন্যায় (সূক্ষ্ম বুদ্ধি পণ্ডিত) ভিন্ন অন্য কে জানিবার যোগ্য হয়? অর্থাৎ আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৩৷১৫

সেই আত্মা সকল প্রাণীর দেহের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান। চরাচর অর্থাৎ স্থির ও গতিশীল সকল বস্তুই তিনি। যেমন রজ্জুতে সর্প প্রতিভাত হয়, বাস্তবিক রজ্জু ভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে পারে না, সেই প্রকার সেই সৎ ব্রহ্মে কল্পিত

যাবতীয় বস্তুই সেই ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না। তবে চরাচর সকল বস্তুকে—এই ব্রহ্ম—এই ভাবে সকলে বুঝিতে পারে না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইলেও সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ সূক্ষ্ম বলিয়াই ব্রহ্ম স্বীয় রূপে জ্ঞেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় হইয়া থাকে।

অবিদ্বান্ তাহাদের নিকট কিন্তু বিদ্বানের ব্রহ্ম অতি নিকট, কারণ তাঁহারা নিজরূপে আত্মাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন,—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতি রূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যেমন একই অগ্নি লোক মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর ভেদানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের রূপ বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দাহ্যবস্তু ভেদে বহুবিধ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে যে একই আত্মা, তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎ তৎ দেহ সদৃশ হন, এবং বাহিরে ও স্বীয় অবিকৃতরূপে আকাশের ন্যায় বিদ্যমান থাকেন।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত ভর্ত্তৃ চ তজ্‌ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩।১৬

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সকল প্রাণীতেই অবিভক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও যেন প্রতি দেহে বিভক্তের ন্যায় প্রতীত

হন। ইহার কারণ এই যে, দেহেতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম জগতের স্থিতিকালে ভূতগণকে ধারণ করেন, প্রলয়কালে গ্রাস করেন, আবার সৃষ্টিকালে সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেন। যেমন প্রকৃত রজ্জু মিথ্যা কল্পিত সর্পের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেইরূপ আত্মাই এই অবিদ্যা কল্পিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৩।১৭

এই জ্ঞেয় বস্তু সূর্য্য চন্দ্রাদি দীপ্তিময় বস্তুর ও জ্যোতিঃ। অজ্ঞানরূপ তমঃ হইতে পর, অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই আত্মাই জ্ঞান, ইহাই জ্ঞানের বিষয়, ইহাই জ্ঞানের ফল। এই তিনটী বস্তুই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সেই আত্মভূত ব্রহ্মকে সর্ব্বাবভাসক সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ করে না, তদ্রূপ এই বিদ্যুৎগণ ও তাহাকে প্রকাশ করে না; আমাদের দৃষ্টি গোচর এই যে অগ্নি তাহা কি করিয়া তাহাকে প্রকাশিত করিবে? এই যে আদিত্যাদি সকল

দীপ্তিদান করে, তাহা দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশের সাহায্যে অপরকে প্রকাশ করে।

জ্ঞেয়বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, শ্রীভগবান, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি বা প্রকৃতির স্বরূপ বলিতেছেন,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥ ১৩।১৯

ঈশ্বরের দুইটী প্রকৃতি. অপরা ও পরা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ। এই উভয় প্রকৃতিই অনাদি। ঈশ্বর ও নিত্য, প্রকৃতি পুরুষও নিত্য। এই প্রকৃতি দ্বয়ের সাহায্যে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন। প্রকৃতি —যাহা ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি, সেই প্রকৃতি বা মায়া হইতে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বিকার এবং সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতির পরিণাম।

কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। ১৩।২০

পঞ্চ স্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকারকে কার্য্য বলে এবং পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই সপ্ত বিকারীকে কারণ বলে। প্রকৃতিই এই কার্য্য ও কারণের হেতু অর্থাৎ ইহাদের আরম্ভক কারণ। ফলে, প্রকৃতিই কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্ব রূপে সংসারের কারণ। পুরুষ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তিনিই ভোক্তা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম যে সুখদুঃখ তাহার

ভোগের অর্থাৎ উপলব্ধির হেতু। সুখ দুঃখের ভোগই সংসার। এই সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বই পুরুষের সংসারিত্ব।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু ॥ ১৩।২১

ভোক্তা পুরুষ "প্রকৃতিস্থ" হইয়া অর্থাৎ কার্য্য কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিকে (অবিদ্যাকে) আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতিজাত সুখ দুঃখ মোহাত্মক গুণ সমূহকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতিজ গুণের ভোগ কি প্রকার? আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, এই প্রকার ভাবে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিজ গুণের ভোগ। সুখ দুঃখ মোহ রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব তাহাই সংসার উৎপত্তির কারণ। এই সুখ দুঃখ ভোক্তা পুরুষের, সংসারে সৎযোনি অর্থাৎ দেবযোনি ও অসৎ-যোনি অর্থাৎ পশু প্রভৃতি যোনি এবং সদসৎ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি, এই সকল যোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ "গুণসঙ্গ"। "প্রকৃতস্থা" অর্থাৎ অবিদ্যা এবং 'গুণসঙ্গ' অর্থাৎ কামনা এই দুইটী বস্তুই সংসারের কারণ। এই দুইটীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। এই দুইটীর নিবৃত্তির কারণ—সন্ন্যাস সহকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। সেই জ্ঞান কি?—"যাহাকে জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়।" সেই জ্ঞানলাভের উপায়—নেতি, নেতি,—ব্রহ্মের ধর্ম্ম যে 'প্রকাশ' তাহা জগতে আরোপ না করা।

সেই পরমাত্মার এক্ষণে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করা হইতেছে—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্‌পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩।২২

সেই পরমাত্মা কিরূপ ?—তিনি 'উপদ্রষ্টা'—নিকটে থাকিয়া যে দেখে অথচ নিজে ব্যাপৃত হয় না, তাহাকে উপদ্রষ্টা বলে। আত্মা সকলেরই অন্তঃস্থিত এবং সেইজন্য আত্মা সমীপে থাকিয়া, আত্মভাবে অধিষ্ঠাতা হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিয়া থাকেন মাত্র, কোন কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হন না; এই কারণে আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলা যায়। 'অনুমন্তা'—অর্থাৎ আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত না হইয়া, যেন অনুমোদন করিতেছেন—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না—এই ভাবে ব্যাপৃত বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়। তিনি 'ভর্ত্তা'—অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মা, জড় দেহ-ইন্দ্রিয়-মনকে আপনার চৈতন্যাভাস দ্বারা প্রকাশ করিয়া যে স্বরূপের অবধারণ করেন তাহাই 'ভরণ'। আত্মা এইরূপে ভরণ করেন বলিয়া 'ভর্ত্তা'। তিনি "ভোক্তা"; চৈতন্যই আত্মার স্বভাব; এই নিত্য চৈতন্যময় স্বভাব বশতঃ, আত্মা, বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহস্বরূপ সর্ব্ব-বিষয়িণী বৃত্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; এইজন্য আত্মাকে 'ভোক্তা' বলা যায়। আত্মাই 'মহেশ্বর' —মহান্ এবং ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি সকলেরই আত্মা এবং স্বতন্ত্র। আত্মাই "পরমাত্মা"—দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত অচেতন হইলেও, যে আত্মার চৈতন্যশক্তি প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত ও "আত্মা" এই ভাবে ব্যবহার গোচর হয়' সেই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। দেহের সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার গোচর হইলেও এই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া এই দেহেই উক্ত হয়। সেই আত্মাই অব্যক্ত হইতে 'পর', অর্থাৎ বিলক্ষণ 'উত্তম

পুরুষ'। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—'আমাকেও এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও'।

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

"বেদে আছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এক ও নয় দুই ও নয়, এক দুইয়ের মধ্যে। 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নাস্তি'ও বলা যায় না—তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে। এই অস্তি নাস্তি, প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।"

"যিনি সৎ তাঁর একটী নাম ব্রহ্ম। সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন, আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না,—হদ্দ বলা যায়, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কি স্বরূপ। বাজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেল্কি অনিত্য। বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—আমি আলাদা কিছু নই—আমি সেই ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্ম—শুদ্ধআত্মা—নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধআত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে অথচ তিনি নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আকাশবৎ।"

"ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই—তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। ব্রহ্ম, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত। তিনি গুণাতীত মায়াতীত। ব্রহ্ম—তিনি বিদ্যা অবিদ্যার

পার। বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়া দুইয়েরই অতীত। এই জগতে বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া দুইই আছে—জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনীকাঞ্চন ও আছে। সৎ আছে অসৎ ও আছে, ভাল আছে আবার মন্দও আছে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোন অপকার কর্ত্তে পারে না,—তবে দেহাভিমানী জীবদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু কর্ত্তে পারে না। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়—সাপের কিছু হয় না।"

"ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়্দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে—মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটী জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই—সে জিনিষটী ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

"শুদ্ধআত্মা নিষ্ক্রিয়। যেমন চুম্বুক পাথর অনেক দূরে আছে কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুম্বক পাথর চুপ করে আছে—নিষ্ক্রয়।"

"শুদ্ধ আত্মা নিরাকার, দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না। বেদান্ত বিচারে

ব্রহ্ম—নির্গুণ। তিনি বাক্য মনের অতীত, মন বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। তাঁর কি স্বরূপ মুখে বলা যায় না। মনের লয় হলে তবে অনুভবে বোধে বোধ হয়—আর 'অস্তি' মাত্র জানা যায়।"

"যিনি শুদ্ধআত্মা তিনি মহাকারণ। স্থূল কারণ মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল মন বুদ্ধি অহঙ্কার বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ, ব্রহ্ম বা শুদ্ধআত্মা কারণের কারণ। এই শুদ্ধআত্মাই আমাদের স্বরূপ। জ্ঞান কাকে বলে?—এই স্বস্বরূপকে জানা, আর তাঁতে মন রাখা, এই শুদ্ধআত্মাকে জানা। আমিই সেই শুদ্ধ-আত্মা এটী জ্ঞানীর মত।"

"বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষী স্বরূপ—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষী স্বরূপ। স্বপ্ন ও যত সত্য, জাগরণ ও সেইরূপ সত্য। এক নিত্যবস্তু—সেই আত্মা। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়।"

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন—তাই বেদে বলে তত্ত্বমসি। আর বাহিরে ও তিনি—মায়াতে দেখাচ্ছে নানারূপ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন। তাই নাম রূপ বর্ণনা করবার সময় বল্‌তে হয় ওঁ তৎসৎ। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। তৎ মানে পরমাত্মা ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মার এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।" (ক)

জ্ঞানপথে এই ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,-

"জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে—সে ব্রহ্মকে জানতে চায়। সে—নেতি. নেতি, এই বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার। ব্রহ্ম এ নয়—ও নয়, জীব নয়,— বিচার জ্ঞানীর বোধ; আমিও মিথ্যা, জগৎ ও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা —ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—নাম রূপ এসব স্বপ্নবৎ।" (ক)

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে, মনের লয় হয়—সমাধি হয়। বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। মনের নাশ হলেই, অহংনাশ হয়,—যেটা 'আমি' 'আমি' কচ্চে। মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়। সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়,—ব্রহ্মদর্শন হয়। তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে, জ্ঞান বিচার আর থাকে না। জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ?—যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়; যতক্ষণ জীব জগৎ আমি তুমি এসব বোধ থাকে। যখন ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়।"

"যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার কর্ত্তে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না।

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধআত্মা একই।"

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে, তিনি যে কি মুখে বল্‌তে পারে না,—সাক্ষাৎকার হলে ও মুখে বলা যায় না। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই! নেতি, নেতি করে যা বাকি থাকে, আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম। একটী মেয়ের স্বামী এসেছে। সেই স্বামী অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটী ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জান্‌লা দিয়ে দেখ ছে। তারা বরটীকে চেনে না—ঐ মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা কচ্চে—ঐটী কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বল্‌ছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বল্‌ছে—ঐটী তোর কি বর? সে আবার বল্‌ছে—না। আর এক জনকে দেখিয়ে বল্‌ছে—ঐটী কি তোর বর? সে আবার বল্‌ছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা কল্লে—ঐটী তোর বর? তখন সে হাঁ ও বল্লে না, নাও বল্লে না—কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝ্‌লে যে ঐটীই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান, সেখানে চুপ।"

"বেদান্ত বিচারের শেষে রূপ টুপ উড়ে যায়। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন, আর ঈশ্বরকে ব্যক্তিবলে বোধ সম্ভব হয়। বেদান্ত বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নাম রূপ

জগৎ মিথ্যা। তখন ঈশ্বরকে ব্যক্তিবলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন তিনিই নাই, তাঁর আমি খুঁজে পান না। ব্রহ্ম কি মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না। তখন ব্রহ্ম—নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। লুণের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল—কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হলো না। যাই নামা অম্‌নি গলে যাওয়া—কে আর খবর দিবেক? 'আমি' রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে গেলে এক হয়ে যায়—আর একটু ও ভেদবুদ্ধি থাকে না।"

"নেতি, নেতি অর্থাৎ এসব মায়া, স্বপ্নবৎ—এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ নেতি, নেতি—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—আমি ঘট, রয়েছে। মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে—কটা সূর্য্য দেখা যাচ্ছে? —১০টা প্রতিবিম্ব সূর্য্য, আর একটা সত্য সূর্য্য ত আছে। মনে কর একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে—এখন কটা সূর্য্য দেখা যায়?—নটা, আর একটা সত্য সূর্য্য ত আছেই। সব ঘট ভেঙ্গে দিলে কি থাকে?—একটা সূর্য্য?—না, কি থাকে তা মুখে বলা যায় না—যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য্য না থাক্‌লে, সত্য সূর্য্য যে আছে কি করে জান্‌বে? সমাধিস্থ হলে, অহংতত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এসে কি দেখেছে মুখে বল্‌তে পারে না।"

"চৈতন্যলাভ না কল্লে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ?—যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না—এই আমি দেখ্‌ছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ কল্লে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্‌লে কষ্ট হয়। চৈতন্যলাভ কল্লে তবে চৈতন্যকে জান্‌তে পারা যায়।" (ক)

জ্ঞানপথে বিচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী ধ্যানযোগ অবলম্বন করেন। ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা সম্বন্ধে বেদে সপ্ত ভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ গুহ্য নাভি মনের স্থান। মনের তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি থাকেনা—কেবল কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থভূমি হৃদয়—তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে, আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন আর নীচের দিকে মন যায় না। মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে ভাল লাগে না। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সেই

ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে সেইরূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন কর্ত্তে যায় কিন্তু পারে না। শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয়—সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়—কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না—সর্ব্বদা বেঁহুস, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্বৈতমতে সাধন ব্যাপার, সাধারণ মানব বুদ্ধির অগম্য, সাধন পথে তুলনা হীন। কি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থাবলম্বী, কি ভিক্ষুকাশ্রমী সকলেই সর্ব্ববাসনা নির্ম্মূল করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, নির্জ্জন অরণ্যে কত বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেন, শাস্ত্রে এরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাগ্য মুর্ত্তি ভগবান্ বুদ্ধদেব ষড়বর্ষকাল বিবিধ ধ্যানযোগ আশ্রয় করিয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। জ্ঞান মুর্ত্তি ভগবান্ শঙ্কর প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতপন্থী সাধক, সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া কদাচিৎ কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ কথিত উক্তি,—

"ন্যাংটা (তোতা পুরীকে তিনি ন্যাংটা বলিতেন) বেদান্তের উপদেশ দিলে—তিন দিনেই সমাধি! মাধবী তলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হত বুদ্ধি হয়ে বল্‌ছে—আরে! এ কেয়া রে!" (ক)

তন্ত্র সাধনার আরম্ভে, ইষ্টমন্ত্র শ্রবণ মাত্র, ইষ্ট ভাবে তন্ময় হইয়া, ইষ্টবৎ দেহ মনের পরিণতি এবং ধ্যানযোগে তিন দিনে, নির্ব্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি কোন শাস্ত্রকার ও সাধন উপদেষ্টা কল্পনায় ও ধারণা করেন নাই! জড় বুদ্ধি আমরা এই অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা কি করিয়া করিব!

ধ্যানাবস্থায় কি অনির্ব্বচনীয় অনুভব তিনি করিয়াছিলেন তাহা আভাসে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> 'ন্যাংটা জ্ঞানীর ধ্যানের কথা বল্‌তো—জলে জল, অধো ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ; জীব যেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে! ঠিক ধ্যান হলে এইটী সত্য দেখ্‌বে। জ্ঞানীর ধ্যান আর এক রকম জান?—অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে—পাখা বিস্তার করে!—চিদাকাশে আত্মা পাখী—পাখী খাঁচায় নাই; চিদাকাশে উড়্‌ছে—আনন্দ ধরেনা!" (ক)

এই অদ্ভুত কথার মর্ম্ম কে বুঝিবে? সেই অহংজ্ঞান শূন্য সমাধি অবস্থায় তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি মুখে বলিতে পারেন নাই। তাঁহারই উক্তি,—

> "পূর্ণ জ্ঞানের পর—অভেদ। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহং তত্ত্বও থাকেনা।"

> "সমাধিতে কি হয় মুখে বলা যায় না—নেমে এসে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ, ওঁ বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি! ব্রহ্ম, বেদ

বিধির বার—মুখে বলা যায় না! সেখানে আমি, তুমি নাই!" (ক)

তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবার পর, শ্রীমৎ তোতাপুরী অভূতপূর্ব্ব সমাধি ব্যাপার দর্শন করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত বুঝিয়া নিজ সঙ্কল্পিত পরিব্রাজনে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল। আমি সে অবস্থায় বল্লাম—বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই। তখন রাত দিন তার কাছে কেবল বেদান্ত। বামনী বল্‌ত—বাবা, বেদান্ত শুনো না, ওতে তোমার ভক্তির হানী হবে!" (ক)

পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাড়ীতে ·গার মাস অবস্থান করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গলাভে বেদান্তবিদ্ ঘোর অদ্বৈতবাদী পুরিজী অবশেষে ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী হন, এবং ভক্তি পূর্ব্বক মহামায়ার সাকার মূর্ত্তির পূজা করিয়া, তাঁহার আন্তরিক সাকার বিদ্বেষ পরিহার করেন।

এ সময় তাঁহার আর একটী সাধনের কথা আমরা শুনিতে পাই। সূর্য্যোদয়ের সহিত তাঁহার চক্ষু দিবাকরে সংযুক্ত হইত এবং সূর্য্যদেবের গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার দৃষ্টি আকাশ মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া, অস্ত গমন সময় পর্য্যন্ত তাহাতে সংস্পৃষ্ট থাকিত। এ সাধনার উদ্দেশ্য তাঁহার কি ছিল, তাহা

আমরা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু রাজযোগ মতে এরূপ সাধনায় বিশেষ বিভূতি লাভের কথা উল্লিখিত আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,—"ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ—সূর্য্যে চিত্ত সংযম করিলে ভুবন কোষ জানা যায়।" ভাষ্যকার ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করেন,—যে তেজোমণ্ডলকে আমরা সূর্য্য বলি, যোগী ঐ তেজোমণ্ডলে সুষুম্না নাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন। এই নিমিত্ত সূর্য্য মণ্ডলের নাম "সুষুম্না দ্বার" এবং সুষুম্না নাড়ীর নাম "সূর্য্য দ্বার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিঃতে চিত্ত সংযম করিয়া যতদূর উহার আলোক প্রসারিত হয়, ততদূরই জানিতে পারেন। সূর্য্যের আলোক যতদূর উর্দ্ধ অধোগতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে, ততদূরই ভুবনকোষ। যোগিগণ সূর্য্যসংযম দ্বারা ভুবনকোষ অর্থাৎ ভূর্লোক ভুবর্লোক ও পঞ্চ সর্গলোক এবং অবীচ্যাদি সপ্ত নিম্ন বা নরক স্থান এবং তদন্তর্গত জীব ও অজীব বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাঁহারা যোগী নহেন তাঁহারা কেবল আপনার জন্মস্থান মাত্র জানিতে পারেন, অন্য কিছুই জানিতে পারেন না। *

শুনা যায়, পুরিজী প্রস্থান করিবার পর, শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। এবার সমাধিস্থ হইয়া আহার নিদ্রা শূন্য নিশ্চেষ্ট জড়বৎ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। আহারাভাবে প্রাণ ধারণ অসম্ভব বুঝিয়া, সে সময় কোন আগন্তুক সাধু তাঁহার দেহে কঠোর প্রহার পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া সামান্য দুগ্ধ মাত্র পান করাইতে পারিতেন। এরূপে সেই সাধুর বিশেষ

* পাতঞ্জল দর্শন - কালীবর বেদান্ত বাগীশ।

প্রযত্নে তাঁহার দেহরক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। এই অবস্থার শেষভাগে তাঁহার উদরাময় রোগের সূত্রপাত হয় এবং পীড়ার যন্ত্রণার তীব্রতা বশতঃই ক্রমে তাঁহার দেহজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল।

এই দীর্ঘকাল ব্যাপী নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে অবস্থান যোগশাস্ত্রে অসম্ভব বলিয়া বর্ণিত আছে। কারণ, এ অবস্থায় আহারাভাবে ও সহজ শ্বাসাদি ক্রিয়ার বিপর্যায়ে একুশ দিনের অধিক দেহ রক্ষা হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় ছয় মাস কাল যে সাধুর চেষ্টায় দেহ সজীব ছিল, তাহা ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

সুদীর্ঘ সমাধির পর তাঁহার অদ্বৈতভাবের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দ্যায়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়, আকাশ আশ্রয় করে। দেহ-জগৎ যদি ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তাহলে আত্মা সমাধিস্থ হয়। আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। তারপর তিনি মনকে নামালেন; ভক্তি ভক্তেতে মন রাখিয়ে দিলেন। ক

বাল্যকালে প্রথম যখন তাঁহার ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন হয়, তখন তাঁহার সহজ ভক্তি-শুদ্ধ-চিত্ত ভাব সমাধি মগ্ন হইয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে সময় ঈশ্বর দর্শনের জন্য কোন বিশেষ সাধনা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। যখন ভগবান্ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন হইয়াছিল—ভক্তের সগুণ ঈশ্বর, আর তাঁহার অবতার লীলা। তিনি তখন প্রেমের চক্ষে চিন্ময় সীতারাম রূপ, রাধাকৃষ্ণরূপ,

শ্রীগৌরাঙ্গরূপ নানাভাবে দেখিয়াছিলেন। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বসদ্গুণাধার ভগবান্, অবশেষে তাঁহাকে সর্ব্বভূতে শিবশক্তি সম্মিলিত অভেদ-চৈতন্য রূপে দর্শন দিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। এ সময় ভক্ত ও ভগবানে ভেদ, "আমি" ও "তুমি" ভেদ, তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ—এই ভেদ বুদ্ধি, পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি ভগবান্কে দূর হইতে কখন বিশেষ সাকার রূপে, কখন তাঁহাকে সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার পুরাণ মতের সাধন। পুরাণ মতের সাধনায় তিনি দ্বৈতভাবে ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবে,—উভয় ভাবেই সিদ্ধ হন। অতঃপর, যে মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধজীব অবশ হইয়া, সংসার চক্রে নিয়ত ভ্রাম্যমান, যাঁহার কৃপা ভিন্ন মোক্ষ লাভের অন্য কোন উপায় নাই, সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অপরূপ রূপ দর্শনের জন্য তাঁহার তন্ত্রের মহাকঠিন সাধন। তিনি সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী, ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী মহামায়ার চিন্ময়ী মাতৃ রূপ অন্তরে এবং বাহিরে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন তাঁর চিন্ময়ী মা, বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার ভক্তি পথের সাধনা শেষ হইয়াছিল।

তিনি বলিতেন,—

"ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে—ঐ ঈশ্বর অর্থাৎ আকাশের দিকে দেখিয়ে দ্যায়—ঐ আকাশের ভিতর, অনেক দূরে। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে, প্রাণ রূপে

আছেন ; তিনি অন্তর্যামী—হৃদয় মধ্যে আছেন ; সে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে দ্যাখে। উত্তম ভক্ত ভ্যাখে—ঈশ্বরই নিজে এই সব হয়েছেন—তিনিই মায়া জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ব হয়েছেন,—যা কিছু দেখ্‌ছি সবই তাঁর এক একটী রূপ। সে দেখে, ঈশ্বর অধোউর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।" (ক)

দ্বৈতবাদের এই তিনরূপ অবস্থাই সত্য, ইহাই তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব। একটা মিথ্যা আর একটী যে সত্য তাহা নহে। সাধনের প্রথমাবস্থায় ভক্ত ভগবান্‌কে দূরে সাকার রূপে দেখিতে পায়। সে দেখে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জগৎ স্বতন্ত্র, 'আমি' স্বতন্ত্র। ভক্ত সাধনায় যতই অগ্রসর হইতে থাকে, যতই ভক্তির গাঢ়তা বশতঃ ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সে তাঁহাকে সর্ব্বভূতে প্রাণ রূপে প্রত্যক্ষ করে। সে দেখে—বাসুদেব সর্ব্বমিতি —সর্ব্বভূতে বাসুদেব অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। ভক্তির পূর্ণাবস্থায় ভক্ত দেখিতে পায় যে, ভগবানই জীব জগৎ রূপে রহিয়াছেন,—সবই তাঁর এক একটী রূপ। প্রথম অবস্থাটী পূর্ণ দ্বৈতবাদীর ভাব ; দ্বিতীয়টী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এবং শেষটী শক্তিবাদীর অনুভব। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শক্তিবাদ ভক্তি পথের শেষ সোপান, আর এক সিঁড়ি উঠিলেই অদ্বৈতভূমি। এই অদ্বৈত ভূমিতে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীর ও শক্তিবাদীর ক্ষীণ 'আমি' রূপ ভেদটুকু, 'তুমি' তে মিশিয়া যায়, অংশ পূর্ণে মিলিত হয়, সাকার নিরাকারে নিজ অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা,—

"মহাসমুদ্র, কুল কিনারা নাই—সেই জলের কোন কোন

স্থানে বরফ হয়েছে। বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে যায়,—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ দিয়ে গেলে সাকার রূপ আর দ্যাখা যায় না—আবার সব নিরাকার। জ্ঞান সূর্য্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গ্যাল। কিন্তু দ্যাখ যারই নিরাকার তারই সাকার।" ক)

নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গের পর অদ্বৈত ভূমি হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবার 'আমি, আমার' রাজ্যে আসিলেন, তখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাকে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেন। তাঁহার উক্তি,—

"ব্রহ্মজ্ঞানের পর ও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটী কাঁটা আহরণ করে সেই কাঁটাটী তুলে দিতে হয়, তার পর দ্বিতীয় কাঁটাটী ও ফেলে দ্যায়। প্রথম অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটী আন্‌তে হয়, তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুটীই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষণ বলেছিলেন,—রাম! এ কি আশ্চর্য্য, এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব পুত্র শোকে অধীর হয়ে কাঁদছেন? রাম বল্লেন—ভাই! যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞান আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞান ও আছে, যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধ ও আছে। ব্রহ্ম—জ্ঞান অজ্ঞানের পার, পাপ পুণ্যের পার, ধর্ম্মাধর্ম্মের পার, শুচি অশুচির পার!"

"জ্ঞান অজ্ঞান দুই ফেলে দিতে হয়—তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞান কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে অগ্নি আছে—এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা ও খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এটী বোধে বোধ—তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্য ভাবে সখাভাবে দাস্য-ভাবে মধুর ভাবে,—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন, এইটী দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞানী নিরাকার সাকার দুই লয়, অরূপ রূপ দুই গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী দেখে—ব্রহ্ম, অটল নিষ্ক্রিয় সুমেরুবৎ। আবার এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃতমঃ তিনগুণে হয়েছে। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগৎ, মন বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান এ সব তাঁর ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ।" (ক)

অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিবার পর—পুরাণ তন্ত্র ও বেদ মতে সাধন করিয়া সিদ্ধ হইবার পর, শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানীর অবস্থা হইয়াছিল। বিজ্ঞানীর অবস্থা ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধাবস্থা একই প্রকার, তবে বিজ্ঞানী অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া ভক্তি পথে অবস্থান করেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ, সেই জন্য সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে।

বিজ্ঞানীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে বাল্য-কালে প্রতিমায়, শিলায়, ঘটে পটে বৃক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে "অস্তি ভাতি ও প্রিয়কে" পূজা করিয়াছিলেন, ভক্তিপথে সাধন [illegible]া। সগুণ সাকার রূপে তাঁহারই দর্শন লাভ হইয়াছিল এবং জ্ঞানপথে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও তিনিই। ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ—দ্বৈত ও অদ্বৈত, দুইটী ভিন্ন পথ হইলেও একই গন্তব্য স্থানে তিনি পৌঁছিয়াছেন। তিনি দেখিলেন,—

> "পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। নেতি নেতি করে বিচারের শেষ হলে—ব্রহ্মজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে ওঠবার সময় সব সিঁড়ি একে একে ছেড়ে যেতে হয়। তার পর ছাখে যে ছাদ ও যে জিনিষে তৈরি—ইট চুণ সুরকি—সিঁড়ি ও সেই জিনিষে তৈরি। জ্ঞানের পর উপর নীচে এক বোধ হয়। বিজ্ঞানী ছাখে যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। জ্ঞান ভক্তি একই জিনিষ—তবে একজন বল্‌ছে—জল, আর একজন বলছে—জলের খানিকটা চাপ।" (ক)

প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে যে অমূল্য ধর্ম্মচিন্তা রাশি বেদে ও স্মৃতিতে, বেদান্তে ও দর্শনে, পুরাণে ও তন্ত্রে নানা মতবাদে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ একটী জীবনে সাধনা করিয়া সেই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। এই সকল মতবাদ লইয়া কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, কতই বিচার বিবাদ, ঈর্ষা ও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে! বেদের কর্ম্ম, বেদান্তের বিচার, স্মৃতির আচার, সাংখ্যের

জ্ঞান, যোগের ধ্যান, পুরাণের ভক্তি, তন্ত্রের মন্ত্র—নানা মতে নানা পথে সাধককুল ভ্রান্ত ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট! শুধু তাহাই নহে। অদ্বৈতবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধ, সার্দ্ধ সহস্র বৎসর ধরিয়া কিরূপ পরস্পরের উৎসাদনে ও নির্যাতনে বীভৎস চেষ্টা করিয়াছে ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী! আবার দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, পদ্মপুরাণের নিম্ন লিখিত বচনগুলি তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়,—"মায়াবাদ রূপ অসৎশাস্ত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলিকালে ব্রাহ্মণ রূপে আমিই মায়াবাদ প্রচার করিয়াছি। ইহাতে লোকগর্হিত শ্রুতি বাক্যের কদর্থ প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাতে কর্ম্মস্বরূপের পরিত্যাগ, সর্ব্বকর্ম্ম পরিভ্রষ্ট বিধর্ম্মের কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমাত্মার সহিত জীবের ঐক্য, ব্রহ্মের নির্গুণরূপ ইত্যাদি আমি তাহাতে বলিয়াছি। কলিকালে লোক দিগকে মুগ্ধ করিবার জন্যই জগতে এই সকল শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। আমি জগতের নাশের জন্য এই সকল অবৈদিক বেদবৎ মহাশাস্ত্র রক্ষা করিতেছি।"

অপরদিকে দ্বৈতবাদীগণের পরস্পরের ভিতর ও ঈর্ষা দ্বেষের অসদ্ভাব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

> "বৈষ্ণবদের একটা গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে এক ঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে—তাতে ও নাকি ঐরকম কথা আছে। কেশব মন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়া ও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়া ও তা। সব মতের লোকেরা

আপনার মতটাই খড় করে গেছে। শাক্তরা ও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। নিজেদের মত নিয়ে আবার অহঙ্কার কত! ও দেশে শ্যামবাজার এই সব জায়গায় তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব—তাদের লম্বালম্বা কথা। বলে—ইনি কোন বিষ্ণু মানেন,—পাতা (পালন কর্ত্তা) বিষ্ণু?—ও আমরা ছুঁই না! কোন শিব?—আমরা আত্মারাম শিব—আত্মা রামেশ্বর শিব মানি। কেউ বল্‌ছে—তোমরা বুঝিয়ে দাওনা, কোন হরি মান! তাতে কেউ বল্‌ছে—না, আমরা আর কেন, ঐখানে থেকে হোক্।”(ক)

নানা মত ও নানা পথে-বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, ইহা দেখাইবার জন্যই, সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের অতিমানুষিক সাধনা! সেই মহা-সাধনার ফল তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

‘যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। অনেকেই এক ঘেয়ে। কিন্তু আমি দেখি সব এক। শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত মত সেই একৃকে লয়ে। যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। তাঁরই নানা রূপ। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণে ও তাঁরই কথা—সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তন্ত্রে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব, পুরাণে বলেছে—ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।” (ক)

বেদমতে সাধন।

বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের সাধন শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্মের সকল সাধনই প্রায় শেষ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ পর্য্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য।" (ক)

কিন্তু তাঁহার সার্ব্বকালিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা সম্প্রতি সেই সর্ব্বগ্রাসী সাধনার পরিসমাপ্তি দেখিতে পাইব।

স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহির্ভূত সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি ভঙ্গের পর বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ করিয়া কখন 'নিত্যে' কখন 'লীলায়' অবস্থান করিতে লাগিলেন। কখন ভাব সমাধিতে 'গর্গর মাতোয়ারা' হইয়া তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হয়, কখন বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অখণ্ডে লীন হইয়া জড়বৎ অবস্থান করেন। তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কত রূপ অনুভব হইত তাহা বলিয়াছিলেন,—

"হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে বল্লে,—কি আশ্চর্য্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখ্‌লাম। কখন কপিবৎ—মহাবায়ু দেহবৃক্ষে বানরের ন্যায় যেন এ ডাল থেকে ও ডালে অ্যাকেবারে লাফ্ দিয়ে ওঠে আর সমাধি হয়। কখন ও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি, সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়। তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। কখন মীনবৎ,—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চল্‌তে থাকে আর সমাধি হয়। ভাব সমুদ্রের ভিতর

আত্মা মীন আনন্দে খেলা করে। কখন পক্ষীবৎ,—দেহ বৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখন এডালে কখন ও ডালে মহাবায়ু উঠ্‌তে থাকে। যেখানে বসে সেস্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয় ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে মাথায় ওঠে। কখন পিপীলিকাবৎ,—মহাবায়ু পিঁপড়ের মত একটু একটু শিড়্‌ শিড়্‌ করে ভিতরে উঠ্‌তে থাকে, তারপর সহস্রায় বায়ু উঠ্‌লে সমাধি হয়। কখন তির্য্যকবৎ,—অর্থাৎ মহাবায়ুব গতি সর্পের ন্যায় এঁকা বাঁকা, তারপর সহস্রায় গিয়ে সমাধি।" (ক)

যোগপথে ধ্যান ধারণাদি সাধন করিয়া যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনিই এ সকল অনুভবের মর্ম্ম বোধ করিতে পারিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পথের উপলব্ধি সকল চিরদিন সাধকগণের অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক হইয়া থাকিবে। তাঁহার ভাবসমাধি সম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা বলিতেন,—

'সমাধি—যেখানে মনের লয়। সমাধি মোটামুটি দু রকম —জ্ঞানপথে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে অহংনাশের পর যে সমাধি তাকে স্থিত সমাধি বা জড় সমাধি বলে,—'আমি' থাকে না। ভক্তি পথের সমাধিকে ভাব সমাধি—চেতনা সমাধি বলে—এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য রেখার মত একটু অহং থাকে। সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে—ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক।"

"চৈতন্য দেবের তিনটী অবস্থা হতো। প্রথম বাহ্য

দশা—তখন স্থূল ও সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকতো। স্থূল শরীর অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। তারপর সূক্ষ্ম শরীর—মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। চৈতন্য দেবের যখন বাহ্য দশা হতো, তখন তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তন কর্ত্তেন। তার পর কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ—আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটী চৈতন্য দেবের অর্দ্ধ বাহ্য দশা—তখন কারণ শরীরে—কারণানন্দে মন গিয়েছে। তখন তিনি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য কর্ত্তে পারতেন। তারপর মন লীন হয়ে যায়—মনের নাশ হয়, মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই। এইটী চৈতন্য দেবের অন্তর্দ্দশা। অন্তর্দ্দশা হলে তিনি সমাধিস্থ হতেন। তখন মহাকারণে মনের লয় হতো।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্তে আপনারই ভাব সমাধির অবস্থা সকল বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার মহাভাব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এ সকল অবস্থা জীবন্ত ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে। এই ভাবসমাধির জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ ভাজন হইতে হইত। কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ তাঁহার ভাব সমাধি দেখিয়া কেহ ভণ্ডামি কেহ বা পাগলামি মনে করিত। আবার হলধারী শাস্ত্রবিদ্ হইয়া ও ইহা ভক্তিপথের কোনরূপ উচ্চাবস্থা বলিয়া বোধ করিতেন না, বরং ইহার বিরুদ্ধে নানা কথা কহিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"হলধারী বল্‌তো—তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি

মাকে গিয়ে বল্লাম—মা! হলধারী একথা বলছে—তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা? মা, রতির মার * বেশে আমার কাছে এসে বল্লে—তুই ভাবেই থাক্। আমি হলধারীকে তাই বল্লাম।" (ক)

বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভক্তি ভক্ত ও ভগবান্ লইয়া বিলাস, তাঁর মারই ইচ্ছা ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইলেন। এ সময় সামান্য উদ্দীপন মাত্র তিনি ভাব সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া, নানাবিধ ঈশ্বরীয়রূপ, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সত্য সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন ৺কালীপ্রতিমার সম্মুখে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। তিনি দেখিলেন—মার প্রতিমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে অগ্নি শিখার ন্যায় জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ও ভাগবত গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া এক হইয়া রহিয়াছে। মা, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দিলেন যে, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এক। এরূপ নানাভাবের দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—

"কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী আধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে। হঠাৎ দেখ্‌লাম—নদী তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা, রাম লক্ষণ জাঙ্গিয়া পরা চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠির (বাগানের বৈঠকখানা বাড়ী) সাম্‌নে অর্জ্জুনের রথ দেখ্‌লাম—সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন—সে এখন ও মনে আছে। আর একদিন দেশে কীর্ত্তন হচ্ছে - সম্মুখে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি!"

---

* রতির মা, শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক।

"রামলীলা দেখ্‌তে গেলাম। একেবারে দেখ্‌লাম সাক্ষাৎ সীতা রাম লক্ষণ হনুমান বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল তাদের সব পূজা কর্ত্তে লাগ্‌লাম। একদিন বকুলতলায় দেখ্‌লাম—নীল বসন পরে একটী মেয়ে দাঁড়িয়ে—বেশ্যা। দপ্‌ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন,—ও মেয়েকে ভুলে গেলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্য শূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।"

"গড়ের মাঠে বেলুন দেখ্‌তে আমায় নিয়ে গিছিল। বেলুন উঠ্‌বে অনেক লোকের ভিড়, হঠাৎ নজর পড়লো—একটী সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন—সমাধি হয়ে গেল।"

"ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে তা বলা যায় না। সেই সময় বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেতো। তাই রূপ দেখলে শেষে থু থু কত্তাম। কিন্তু পিছনে গিয়ে ভূতে পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্‌তো। ভাবে বিভোর হয়ে থাক্‌তাম, দিন রাত কোথা দিয়ে যেতো! তারপর দিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত।" (ক)

আমরা বলিয়াছি, বেদমত সাধনের শেষ হইতেই তিনি কঠিন ও কষ্টকর অতিসার রোগে আক্রান্ত হন। রোগের আতিশয্যে তাঁহার দেহ কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। পীড়া আরোগ্যের জন্য

তিনি কিছু দিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীন থাকিলেন। তিনি বলিতেন,—

"যখন আমার ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গা প্রসাদ বল্লে, স্বর্ণ পটপটি খেতে হবে কিন্তু জল খেতে পাবে না, বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে কল্লে—জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাক্‌বো। আমি রোক্ কল্লাম—আর জল খাবো না।" (ক)

কবিরাজি চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফলোদয় না হওয়াতে, স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি কামারপুকুরে গমন করেন। বিবাহের পর সাত বৎসর সাধনা করিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম স্বদেশ গমন। স্বভাবতঃই আত্মীয় বন্ধু ও গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার শুভাগমনে সবিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। যখনই তিনি গৃহের বাহির হইতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ চারিদিকে সমাগত হইত। পূর্ব্বের ন্যায় সকলের সহিত সদালাপে ও ভগবৎ কথায় সময় ক্ষেপ হইতে লাগিল। পীড়া সত্ত্বেও সকলেই তাঁহাকে সমাদরে তাঁহার অভিলষিত খাদ্য ভোজন করাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইত। তিনি ও তাহাদের প্রীতি পূর্ণ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। এ সময় আহার বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ আচার পালন ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সাত বৎসর উন্মাদের পর ও দেশে (কামারপুকুর) গেলাম। তখন কি অবস্থাই গেছে!—খানকী পর্য্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।" (ক)

গ্রামের উচ্চ নীচ সকলেই নানা প্রকার মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে আসিত। শুনা যায়, ডোম পাড়ার ডোমেরা তাহাদের গৃহের পাকা কাঁঠাল তাঁহার আহারের জন্য মাথায় করিয়া আনিয়া ছিল। তিনি ও তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর গৃহে ভোজন করেন। তিনি বলিতেন,—

> "আমার কামার বাড়ীর দাল খেতে ইচ্ছা ছিল—ছেলে বেলা থেকে। কামারেরা বল্‌তো,—বামুনরা কি রাঁধ্‌তে জানে? তাই খেলাম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ!" ক।

আহার সম্বন্ধে মূল সূত্র কি, তাহা তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "শূকরের মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে সে লোক ধন্য! আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকে তা হলে সে ধিক্!" ক

তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই যে, আহারের বিচার জ্ঞান ভক্তি লাভ করিবার জন্য। আহারের সঙ্গে মানসিক অবস্থা বিশেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, যেরূপ আহারে দেহ মনের পরিবর্ত্তন হইয়া ভগবানে ভক্তির হানি হয়, ভক্তের সাধন অবস্থায় সে সকল আহার ত্যজ্য। তিনি বলিতেন,—

> "ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্ম জ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পারতো—শূকরের মাংস পর্য্যন্ত। ভক্তের অবস্থায় সব রকম খাওয়া চলে না। অবস্থা বিশেষে আহারের রুচি ভেদ হয়। জ্ঞানীর

পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে, জ্ঞানী আপনি খায় না,—কুণ্ডলিনীকে আহুতি দ্যায়।” (ক)

জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আহার রসনার তৃপ্তির জন্য নহে। জ্ঞানী যাহা আহার করেন তাহা তাঁহাকে “ঔষধবৎ” গ্রহণ করিতে হয়। জ্ঞানীর দৃষ্টি ভোজ্য দ্রব্যে বদ্ধ না থাকিয়া ব্রহ্মে সংযুক্ত থাকে, সুতরাং আহারের গুণ দোষে জ্ঞানীর মন লিপ্ত হয় না। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আহারনিষ্ঠা স্বভাবতঃই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন তাঁহার আহার কেবল দেহ রক্ষার্থ,—হৃদয়ের মধ্যে কুণ্ডলিনীকে আহুতি প্রদান।

শাস্ত্রে একটী ব্রহ্মজ্ঞের ভোজনে দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের তুল্য বলিয়া কথিত আছে। “বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণ ও যদি ভোজন দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ এক ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।” * স্মৃতি শাস্ত্রের এইরূপ বিধান জন্য দেবকার্য্যে বিশেষতঃ পিতৃ কার্য্যে বিশেষ পাত্র বিচার করিয়া ভোজন করাইতে হয়। যাঁহারা বেদ ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন এরূপ পাত্র ভিন্ন অসদাচারী ব্রাহ্মণ ভোজনে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। কারণ বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাহা আহার করেন তাহা ব্রহ্মেই অর্পিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্রহ্মেরই সেবা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

“লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা।

---

* মনুসংহিতা।

সব জীবের ভিতর তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান কি না তাঁকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই—এমন লোক যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেখানে বসে খায় সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়। হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়ে ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লাম,—দ্যাখ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস্ তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লাম।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বদেশে আসিবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় এবং তন্ত্র সাধনার গুরু ব্রাহ্মণী তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীসারদাদেবী স্বামীর অনুমতি ক্রমে কামারপুকুরে আগমন করেন। বিবাহের পর এই তাঁহার প্রথম স্বামী দর্শন। যদিও বিবাহের কয়েক মাস পরে, শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মাত্র শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গমন করেন, কিন্তু সে সময় শ্রীসারদা-দেবী সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। সেই বালিকা বয়সে স্বামী স্ত্রীর কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কি জ্ঞান থাকিতে পারে? বিবাহ ব্যাপার সেই বালিকার চক্ষে পুতুল খেলার মধ্যে একটী খেলা বই আর কি? কিন্তু এখন তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স। সংসারের নানা বিষয়জ্ঞান তাঁহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি শুনিতে পাইতেন যে, তাঁহার স্বামী পাগল হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বামী ইতর ভদ্র সকলেরই স্নেহাস্পদ, কোনরূপ লোকাচারে বদ্ধ থাকেন না, এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার অন্য কথা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং শ্রীসারদাদেবীও স্বামী সন্নিকটে কি ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন, তাহার প্রকৃত কথা অবিদিত। সুতরাং তাহার আলোচনায় আমরা নিবৃত্ত হইলাম।

কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া তিনি সিওড়ে যাইবার অভিমত প্রকাশ করেন। সিওড়ে হৃদয়ের বাটীতে তিনি বর্ষা ও শরৎ ঋতু অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার ভগ্নদেহ অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছিল। হৃদয়ের গৃহ গ্রামের প্রান্তভাগে, তাহার পরে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র। মাঠের মধ্যে ছোট বড় অনেক পুষ্করিণী আছে। তিনি বলিতেন—"খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে অনন্তের ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব হয়—যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।" সিওড়ের বহুদূর-ব্যাপী বিস্তীর্ণ মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সর্ব্বদা অখণ্ড চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইত। বৃষ্টিতে জলসিক্ত মাঠ দেখিয়া তাঁহার মনে হইত—"বর্ষায় যেমন পৃথিবী জ'রে থাকে,—সেইরূপ এই জগৎ, চৈতন্যেতে জ'রে রয়েছে।" তিনি দেখিতেন বর্ষাগমে নদীর জল মাঠের মধ্যে কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইয়া পুষ্করিণীতে প'ড়তেছে। সেই জলপথে ঝাঁকে ঝাঁকে মৎস্যও ভাসিয়া আসিতেছে। পেটের পীড়ার জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল তাঁহার পথ্য ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ঝাঁক ছোট মাছ একটী বড় মাছের পশ্চাতে পুষ্করিণীর দিকে নালা দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। হৃদয় বহু কষ্টে তাঁহার ভোজনের মৎস্য জোগাড় করে জানিয়া, সেই মৎস্য ধরিবার

জন্য তাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বোধ করিলেন, বড় মাছটী পোনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যেন কাতর ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। মনে হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন,—

"যার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য,—ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিল্‌বিল্‌ কচ্চে!" (ক)

পর দিন হৃদয় তাঁহার পথ্যের জন্য মউরোলা মাছ সংগ্রহ করিয়া আনন্দে তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়া বলিল,—মামা! কেমন 'মাছ এনেছি দ্যাখ।' তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"ওরে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমি ও মাছ খেতে পারবো না।" তিনি বলিতেন,—"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো, পরে তত কষ্ট হতো না।" এ সময় তাঁহার বিজ্ঞানীর অবস্থায় তিনি সর্ব্বত্রই এরূপ চৈতন্যসত্বা উপলব্ধি করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "ও দেশ থেকে বর্দ্ধমানে আস্‌তে আস্‌তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম—বলি দেখি, এখানে জীবেরা কেমন করে খায়, থাকে! গিয়ে দেখি—মাঠে পিপড়ে চলেছে—সব স্থানই চৈতন্যময়!" (ক)

১২৭৪ সালের শীতের প্রারম্ভেই তিনি সিওড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন। স্বদেশ হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে তিনি মথুর বাবু ও তাঁহার পরিজনগণের সহিত দ্বিতীয়বার তীর্থ দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। এবার ভাগিনেয় হৃদয় তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা

জননী কালীবাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীর্থ পর্য্যটনের বর্ণনা তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন,—

"সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়াছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিব দর্শন হলো! আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে– সমাধি মাঝিরা হৃদেকে বল্‌তে লাগ্‌লো—ধর, ধর, পাছে পড়ে যায়। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন! প্রথমে দেখ্‌লাম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আস্‌তে দেখ্‌লাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন! ভাবে দেখ্‌লাম—সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, একটী ঠাকুর বাড়ীতে ঢুক্‌লাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো!"

"তীর্থে গেলাম, তা এক একবার ভারি কষ্ট হতো। কাশীতে সেজ বাবুর সঙ্গে রাজা বাবুর (কাশীর প্রসিদ্ধ মিত্র পরিবার) বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর সঙ্গে বইঠক্‌খানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা কেবল বিষয়ের কথা কইছে—এত টাকা লোক্‌সান হয়েছে, এই সব কথা। সেই সব কথা শুনে আমি—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। বল্লাম—মা! কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম। তীর্থ কর্ত্তে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে ত বিষয়ের কথা শুন্‌তে হয় নাই!" (ক)

স্বভাবতঃই তিনি কাশী আসিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু দেখি-

বার ও তাহাদের সহিত পরিচয় করিবার নিমিত্ত উৎসুক হন। তিনি বলিতেন,—

"কাশীতে মঠ্ দেখ্লাম—মোহন্তের কত মান। বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বল্‌ছে, কি আজ্ঞা! কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। আমায় বল্‌তো—প্রেমীসাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহন্তকে দেখ্‌লাম যেন একটী গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম—উপায় কি? সে বল্লে—কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ কচ্ছিল। পাঠ শেষ হলে বল্‌তে লাগ্‌লো—জলে বিষ্ণু স্থলে বিষ্ণু বিষ্ণু পর্ব্বত মস্তকে, সর্ব্বং বিষ্ণু ময়ং জগৎ। সব শেষে বল্লে—শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।"

"একদিন গীতা পাঠ কল্লে, তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়্‌বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজবাবু ছিল—সেজবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়্‌তে লাগলো। সেই নানক পন্থী সাধুটী বলেছিল—উপায় নারদীয় ভক্তি। ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে।" (ক)

একদিন তিনি পরমহংস মৌনব্রতী তৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিলেন এবং কবীরপন্থীদিগের সহিত পরিচয়ের অনেক কথা শুনা যায়। কাশীতে থাকিবার কালীন তাঁহার ভৈরবীচক্রে যাইবার কথা ও তিনি বলিয়াছিলেন। কাশী হইতে

প্রয়াগে দুই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। প্রয়াগতীর্থে তাঁহার বিশেষ কোন ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কি কোনরূপ উদ্দীপন হয় নাই এবং প্রথামত তথায় মস্তক মুণ্ডন ও করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পইরাগে গিয়ে দেখ্‌লাম—সেই পুকুর সেই দূর্ব্বা সেই গাছ সেই তেঁতুলপাতা। কেবল তফাৎ—পশ্চিমে লোকের ভুবির মত বাহে।" (ক)

শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের কথায় বলিয়াছিলেন,—

"বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়। মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখ্‌লাম, অম্‌নি দপ করে দর্শন হলো—বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনাতীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যার সময় যমুনা পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর, বড় কুল গাছ, গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আস্‌ছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যাই দেখা, আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো। উন্মত্তের ন্যায়—কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ, বলে বেহুঁস হয়ে গেলাম! ভাবে বুক্ রক্তবর্ণ হয়ে গিছ্‌লো!"

"শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু দর্শন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ—লুচি জিলিপী পাল্কীর ভিতর দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম—কৃষ্ণরে, তুই নাই কিন্তু সেই সব রয়েছে

বার ও সেই মাঠ তুমি গরু চরাতে। হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আস্‌ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্‌লো—খুব হুঁসিয়ার। আমি চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বল্‌তে পার্‌লাম না। শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডুর পথে যাচ্ছি, গোবৰ্দ্ধন দেখ্‌তে নামলাম। গোবৰ্দ্ধন দেখ্‌বার মাত্রেই একেবারে বিহ্বল। দৌড়ে গিয়ে গোবৰ্দ্ধনের উপরে দাড়িয়ে পড়্‌লাম। ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু গিয়ে দেখ্‌লাম, সাধুরা একটী একটী ঝুপ্‌ড়ির মত করেছে। তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন ভজন কচ্চে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত। বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল—আমি তাকে ধর্‌তে গিছ্‌লাম। গোবিনজীকে দুইবার দেখ্‌তে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজবাবু ও দেখে ছিল।"

"আমি বৃন্দাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম—পোনের দিন রেখে ছিলাম। কালীয় দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হতো—আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম। হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটার মত নাওয়াত।" (ক)

"গঙ্গামাই আমায় বড় যত্ন কর্ত্তো। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে একটী কুটীরে থাক্‌তো, আমার অবস্থা দেখে, আর ভাব দেখে বল্‌তো—ইনি সাক্ষাৎ সেই রাধা, দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় দুলালী বলে

ডাক্‌তো। তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেতো। হৃদে এক এক দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেতো। সেও আমায় খাবার জিনিষ তয়ের করে খাওয়াত। গঙ্গামাইর ভাব হতো। তার ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হতো। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়ে ছিল।" (ক)

"গঙ্গামাইর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক্ ঠাক্—আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাবো, গঙ্গামাইর বিছানা ঘরের এক দিকে হবে, আমার বিছানা ও দিকে হবে, সব ঠিক্ ঠাক্। হৃদে তখন বলে, তোমার এত পেটের অসুখ কে দেখ্‌বে? গঙ্গামাই বল্লে—কেন আমি দেখ্‌বো, আমি সেবা কর্ব্বো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামাই আর এক হাত ধরে টানে। এমন সময় মাকে মনে পড়্‌লো। মা, সেই একলা দক্ষিণশ্বরে কালীবাড়ীর নবতে আছেন। আর থাকা হলো না। তখন বল্লাম—না, আমায় যেতে হবে।" (ক)

শ্রীবৃন্দাবন হইতে তাঁহারা পুনরায় ৺কাশীধামে ফিরিয়া আসেন। এই সময় কাশীর প্রসিদ্ধ বীণ্‌বাদক মহেশ সরকারের বীণ্‌বাদন শুনিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহেশ ও আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে নিজের বীণ্‌বাদনের পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

প্রায় তিন মাস কাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর

বাবুর সহিত কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আনিত রজ ছড়াইয়া দিলেন এবং নিজ সঙ্গে যে মাধবীলতা আনিয়া ছিলেন তাহা স্বহস্তে পুঁতিয়া বলিলেন—"আজ হতে এ স্থান শ্রীবৃন্দাবন হলো।" শুনা যায় তীর্থে দানাদি কার্য্যে মথুরবাবু বহু সহস্র টাকা ব্যয় করেন এবং তীর্থকর্ম্ম সমাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শে নিজ ভবনে ব্রাহ্মণ সাধু বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে ভক্ষ্য ভোজ্য ও উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

বোধ হয় ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট পাণিহাটী গ্রামে রঘুনাথ দাসের দণ্ড মহোৎসব প্রথম দর্শন করিতে গমন করেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গের অনেক স্থান হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সঙ্কীর্ত্তন দল এই উৎসবে যোগদান করেন। ইহাকে রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব ও বলে। দাস রঘুনাথকে দণ্ড দিবার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া এই মহোৎসব করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই চিঁড়ার মহোৎসব পাণিহাটী গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। সে দিন মহোৎসব ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য ও মহাভাব সমাধি নিরীক্ষণ করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে পাণিহাটীর গঙ্গাতীর রাজপথ ও শ্রীরাঘব মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। আগন্তুক অগনন দর্শকের মধ্যে সাধক পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ উৎসব

ক্ষেত্রে তাঁহার এই অপূর্ব্ব মহাভাবাবস্থা, ভক্তিগ্রন্থে লিখিত শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের অনুরূপ বোধ করিয়া আশ্চর্য্য হন। এ সময় হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবাদিষ্ট মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে কালীবাড়ীতে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। বৈষ্ণবচরণ বলিয়াছিলেন—"তুমি যে সব কথা বল, সে সব শাস্ত্রে আছে, তবে তোমার কাছে কেন আসি জান?—তোমার মুখে সেই সব শুনতে আসি।" বৈষ্ণবচরণ কি বুঝিয়া ছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে ভগবান্ আবার শাস্ত্র মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন?

বৈষ্ণবচরণ বৈষ্ণবতন্ত্র মতে সাধনা করিতেন এবং ইদানীন্তন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিলেন। তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে কলিকাতার কাছিবাগান পল্লির কোন কর্ত্তাভজা সমাজে লইয়া যান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

> "এক মতে আছে মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্ত্তা-ভজা মাগীদের ভিতর একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সব আমার কাছে এসে বসলো। আমি তাদের মা, মা, বলাতে পরস্পর বলাবলি কর্ত্তে লাগলো—ইনি প্রবর্ত্তক, এখনো ঘাট চেনেন নাই। ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্ত্তক, তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ। একজন মেয়ে বৈষ্ণবচরণের কাছে গিয়ে বসলো। বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বল্লে—এর বালিকা ভাব। স্ত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়, মাতৃভাব শুদ্ধভাব!"

"ওদেশে ভগী তেলি—কর্ত্তাভজার দলে। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটী পুরুষ না হলে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হবে না। সেই পুরুষটীকে বলে রাগকৃষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়েছিস্?—সে মেয়ে মানুষটা বলে,—পেয়েছি।"

"বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে—যে যাকে ভালবাসে তাকে ইষ্ট বলে জান্‌লে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। তুই কাকে ভাল বাসিস্?—অমুক্‌কে। তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান। ও দেশে (কামার পুকুরে) আমি বল্লাম—এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব। দেখ্‌লাম যে, লম্বা লম্বা কথা কয় আবার ব্যভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম,—হবে, যদি একজনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্‌লে হবে না।"

"একদিন আমি দালানে খাচ্ছি, একজন ঘোষ পাড়ার মতের লোক এলো। এসে বল্‌ছে, তুমি খাচ্ছ না কারুকে খাওয়াচ্ছ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ সে দ্যাখে যে অন্তরে ভগবান্ আছেন। যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে জীব। বিজাতীয় লোক থাক্‌লে কথা কবে না। বলে—এখানে জীব আছে। ওদেশে (কামার পুকুরে) এই মতের লোক একজন দেখেছি—সরীপাথর মেয়ে মানুষ। এ মতের লোক পরস্পরের বাড়ী খায় কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা

সরীপাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে, তবু হৃদের বাড়ীতে গিয়ে খেলেনা। বলে, ওরা জীব। আমি একদিন তাদের বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছ্‌লাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ী দিলে দুটী খেলাম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেল্লে, তার পর অসুখ।"

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। স্ত্রীলোক লইয়া সাধন এবং নানাবিধ রোগ আরোগ্য ও ঝাড়ন বশীকরণাদি কর্ম্মই, ইহাদের লোক সাধারণের ভিতর প্রতিপত্তির কারণ। কর্ত্তাভজাদিগের ন্যায় বাউল সম্প্রদায় ও স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বাউলদের সম্বন্ধে বলিতেন,—

"শাক্ত মতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্ত মতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সিদ্ধকে বলে সাঁই—সাঁইয়ের পর আর নাই। বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ—অর্দ্ধেক মালা গোহাড়, অর্দ্ধেক মালা তুলসীর। হিন্দুর নীর, মুসলমানের পীর। সাঁইরা বলে আলেখ্‌ আলেখ্‌। বেদমতে বলে ব্রহ্ম, ওরা বলে আলেখ্‌। জীবদের বলে আলেখে আসে আলেখে যায়। অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়। তারা বলে হাওয়ার খবর জান? অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এর ভিতর দিয়ে মহাবায়ু ওঠে—তার খবর। জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ? ছটা পৈঠে, ষড়চক্র। যদি বলে পঞ্চমেতে আছে, তার মানে যে বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। তখন নিরাকার দর্শন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"একজন বাউল এসেছিল; তাকে আমি বল্লাম—তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে? খোলা নেমেছে? যত রস জ্বাল দেবে তত রেফাইন (Refine) হবে।' প্রথম আকের রস, তার পর গুড়, তার পর দোলো, তার পর চিনি, তারপর মিছরি, ওলা, এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্চে। খোলা নাম্‌বে কখন? অর্থাৎ কখন সাধন শেষ হবে?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর নুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে—ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ। ওরা অনেকে রাধাতন্ত্র মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে। পৃথিবী তত্ত্ব, জল তত্ত্ব, অগ্নি তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব—মল মূত্র রজ বীজ এই সব তত্ত্ব! এসব সাধন বড় নোংরা সাধন—যেমন পাই খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা!"

কর্ত্তাভজা ও বাউল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা সহজিয়া বৈষ্ণব মতেরই অনুকরণ। আবার সহজিয়া মত বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের রূপান্তর মাত্র। মহাযান মতাবলম্বী শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ও তাহাদের এক শাখা—মাধ্যমিকেরা, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের সাকার মূর্ত্তির পূজা করিত। আবার মাধ্যমিকের আর এক সম্প্রদায়—মন্ত্রযানেরা, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের এক একটী শক্তি কল্পনা করিয়া শক্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। এই শক্তিপূজা হইতেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আরম্ভ। বুদ্ধদেবের সময়েই স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাসে অধিকার

দেওয়া হয়। কালক্রমে সকল বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণ ও শ্রমণাগণের অবাধ একত্র অবস্থানের কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। শীঘ্রই ইহাদের ভিতর বজ্রযান নামে এক নব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা এই মত গোপনে প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের সাধন পথে ভোগসুখ উপভোগ করিয়া সহজে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের প্রচারিত চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্রের অভিমত—রমণের দ্বারা সহজানন্দ উপভোগানন্তর যে বিরমানন্দ, তাহাই নির্ব্বাণপদ। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত সাধারণের আসক্তি অনুরূপ নির্ব্বাণ লাভের এই "সহজ তত্ত্ব" তাঁহাদিগের উপাস্য ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তি বজ্রেশ্বরী একীভূত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বজ্রযান সম্প্রদায় নানা 'সহজ' মতের তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করিলেন। ইহার ফলে, মধ্য এসিয়ার ভূত প্রেত উপাসক, মদ্য মাংসাশী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নানা বর্ব্বর জাতির ভারতে প্রবেশ ও আপন আপন বিশ্বাস ও আচার বজ্রযান মতের সহিত একীভূত করিয়া পঞ্চ-ম-কার সাধনরূপ বামাচার মতের প্রবর্ত্তন হয়। বৌদ্ধ পাল রাজগণের রাজত্ব কালে বামাচারের পূর্ণ প্রবলতা বঙ্গের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়াছিল। নেপালের বৌদ্ধগণ এখনও এই বজ্রজান মতাবলম্বী রহিয়াছেন। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ রাজত্বের অধঃপতনের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং বামাচারের পরিবর্ত্তে সিদ্ধান্তাচার ও কুলাচারের বিধান প্রচারিত হয়। শৈব ও শাক্ত মতাবলম্বী উচ্চ সাঁধকগণের প্রবৃত্তি অনুরূপ পঞ্চতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও সাধারণের জন্য পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্পের আদেশ করিয়া তন্ত্র সকল লিখিত হইল। কিন্তু অহিংসা

ধর্ম্ম পালনকারী বঙ্গীয় বজ্রযানগণ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়া সহজ তন্ত্রানুযায়ী সহজসাধন পথ পরিত্যাগ করেন নাই। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বজ্রযানের বজ্রেশ্বরীকে বাশুলী নামে পূজা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর যুগল রূপ নায়িকাতে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস করিয়া পরকিয়া সাধনই প্রবল রাখিলেন। ইহাদের মতে মানুষ ভজনই সাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রথমে একটী পরকীয়া রমণী গ্রহণ করিয়া সেই নায়িকার দেহই শ্রীবৃন্দাবন এবং তাঁহাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণী বিরাজিত ভাবিয়া থাকেন। নায়িকাতে দেহ মন আরোপ করিয়া সাধন করিলে অচিরাৎ প্রেমরস সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। সহজিয়ারা আপনাদিগকে রসমার্গের পথিক রসিক-ভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী, রায় রামানন্দ, এই পাঁচজন রসিক-ভক্ত সহজিয়া সাধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হইলে অনেক মুণ্ডিত কেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৈষ্ণবাচার অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারা পরবর্ত্তী সময় নেড়া নেড়ী বলিয়া পরিচিত। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বারশ নেড়া তেরশ নেড়ীকে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া সংসারী করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেন,—

"ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজাবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা সহজ সহজ করে চেঁচায়। সহজাবস্থার দুটী লক্ষণ বলে। প্রথম কৃষ্ণ গন্ধ গায়ে থাক্‌বেনা। দ্বিতীয়,

পদ্মের উপর অলি বস্‌বে কিন্তু মধুপান কর্ব্বে না। কৃষ্ণ গন্ধ নাই, এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে—বাহিরে কোন চিহ্ন নাই—হরিনাম পর্য্যন্ত মুখে নাই। আর একটীর মানে—কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেন্দ্রিয়।"

"ওরা ঠাকুর পূজা প্রতিমা পূজা এসব লাইক (Like) করে না—জীবন্ত মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে—কর্ত্তাভজা অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে, গুরুকে ঈশ্বর বোধে ভজনা করে—পূজা করে।" (ক)

তাঁহার উক্তি সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্ত্তা-ভজা বাউল প্রভৃতি সাধক দিগের আধ্যাত্মিক ভাবগুলি তিনি ঐ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সহজেই আপনার ভিতর মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিকগণের ন্যায় পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধনা না করিয়া, তাঁহার মাতৃভাবের সাধনা এবং উল্লিখিত সম্প্রদায় সকলের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার নিন্দা হইতে বুঝা যায় যে, এ সকল সাধনা অশাস্ত্রীয় সাধনা। ইতিহাসও তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

বৈষ্ণবচরণ কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি সমাজ ভুক্ত হইলেও তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাতি করে সেজবাবুর কাছে নিয়েগিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজবাবু ভগবতীর ভক্ত। সেজবাবু খুব খাতির যত্ন কল্লে—রূপোর বাসন বার

করে জল খাওয়ান পর্য্যন্ত। বেশ কথা হচ্ছিল। তার পর সেজবাবুর সাম্‌নে বলে কি—মুক্তি দেবার এক মাত্র কর্ত্তা কেশব! আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। বল্‌তেই সেজবাবুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলেছিল—শ্যালা আমার! সেজবাবু শাক্ত ভগবতীর উপাসক। আমি আবার বৈষ্ণব চরণের গা টিপি।” (ক)

কলিকাতার কলুটোলা পল্লিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চৈতন্য সভা নামে একটী সভা ছিল। সম্ভবতঃ কলুটোলার ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ সেই সভার সভাপতি। চৈতন্যদেবের উদ্দেশে একখানি স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখে ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইত। বৈষ্ণবচরণ ভাগবত পাঠ করিতেন। চৈতন্যসভার এক অধিবেশনের দিবস বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা এবং ভাব সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি সহসা শ্রীচৈতন্যের আসনে উপবেশন করেন। চৈতন্যাসন গ্রহণ করাতে মহাপ্রভুর অবমাননা হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণব সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কাল্‌না নিবাসী বৈষ্ণব চুড়ামণি ভগবান দাস বাবাজীর কর্ণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অতিশয় গর্হিতাচরণ হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সময় তিনি নানক পন্থী শিখ সম্প্রদায়েরও বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাড়ীর পার্শ্বেই গভর্ণমেণ্টের বারুদখানা। এক দল শিখ

সৈন্য রক্ষীরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইহারা সকলেই নানকপন্থী; কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিত। তিনিও বারুদখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাইলে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের পরিশুদ্ধ শয্যায় বসাইয়া নিজেরা ভূতলে বসিত এবং স্বহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। কোয়ার সিং একদিন বলিয়াছিলেন,—"সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই—তুমি নানক!" তিনি বলিতেন,—

> "কালীঘরের সাম্‌নে শিখ্‌রা বলেছিল,—ঈশ্বর দয়াময়। আমি বল্লাম,—দয়া কাদের উপর? শিখ্‌রা বল্লে—কেন মহারাজ! আমাদের সকলেরই উপর। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এতো জিনিষ তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা কচ্চেন। আমি বল্লাম—তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখ্‌ছেন,—তা এতে কি বাহাদুরী? আমরা সকলে তাঁর ছেলে, ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখ্‌ছেন—তা তিনি দেখ্‌বেন না তো বামুন পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে? তবে কি তাঁকে দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা ততক্ষণ তাঁকে সবই বল্‌তে হয়। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খুব দূরের লোক—পরের ছেলে।"

এক সময় কোয়ার সিং—তখন তাঁহার সৈন্যদল বারাথ্‌পুরে থাকিত—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কি অবস্থাই গেছে! কোয়ার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখ্‌লাম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বস্‌লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে। যাই জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বস্‌তে গেলাম। ভাবলাম অত খবরে কাজ কি! তার পর যেই সকল্‌কে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বল্‌তে বল্‌তে আমি আগে খেতে লাগ্‌লাম। সাধুরা কেউ কেউ বল্‌তে লাগ্‌লো শুন্‌তে পেলাম—আরে, এ কেয়ারে!"

"চানকের পণ্টনের ভিতর ইংরেজকে আস্‌তে দেখে সেপাইরা সেলাম কল্লে। কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজত্ব তাই ইংরেজকে সেলাম কর্ত্তে হয়।" (ক)

এই নানকপন্থীরা তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি করিত তাহা একটী ঘটনায় বুঝা যায়। এই সৈন্যদল কলিকাতার কেল্লায় একদিন বদ্‌লি হইয়া যাইতেছিল। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে গাড়ীতে লইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার পথে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়। সৈনিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ও সৈন্যদল "শ্রীগুরুর জয়!" উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া একে একে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল।

স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহির্ভূত সাধনা।

এইরূপে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের সাধনা বিশেষে মিলিত হইবার পর তাঁহার এক অভিনব ধর্ম্মসাধন করিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছিল। সহজিয়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গুপ্ত-সাধন-প্রণালী এবং তাহাদের আচারাদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। জাতিবিচার না মানিয়া এবং প্রতিমাদি পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দু ও মুসলমান উভয় আচার প্রতিপালন এবং মানুষে দেবতা বোধ ও নিরাকারে নিষ্ঠার জন্য, এই সকল সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম্মের সমধিক নিকটস্থ। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরাই এই সকল ধর্ম্মসাধন অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার পর, তাঁহার যে মুসলমান ধর্ম্ম সাধন করিতে অভিলাষ হইবে ইহা সম্ভাবনা বলিয়াই বোধ হয়। এ সময় গোবিন্দ রায় নামে এক ব্যক্তির সহিত কালীবাড়ীতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোবিন্দের বাড়ী দম্‌দমার নিকট। তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত এবং গোপনে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দরবেশী মত সাধন করিতেন। বোধ হয় ১২৭৫ সালের কোন সময় তিনি গোবিন্দের নিকট আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি বলিতেন,—

> "গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হলো, খানিক খেলাম। মনি মল্লিকের বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলাম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না এলো। (ক)

আল্লা মন্ত্র সাধন করিবার সময় তিনি মুসলমানের মত বেশ পরিধান, পিঁয়াজ রসুন সংযুক্ত অন্ন আহার এবং মস্‌জিদে যাইয়া

নমাজ প্রভৃতি নিয়ম পালন করিতেন। আল্লা মন্ত্র জপ ছাড়া তাঁহার অন্য কোন আচরণ ছিল না, ভুলিয়া ও কালীঘরে যাইতেন না, কালী নাম কি কোন দেবদেবীর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না! তিন দিন এইরূপে সাধন করিবার পর তাঁহার এক দিব্য দর্শন লাভ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান কচ্চি, দ্যাখালে—প্রথম দ্যাখালে অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে; তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দোফরাশ, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্কি, তাতে ভাত রয়েছে। শান্কিতে করে ভাত নিয়ে সাম্‌নে এলো। সেই শান্কির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গ্যাল। সেই শান্কি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটা দিয়ে গ্যাল। আমি ও একটু আস্বাদ কল্লাম। মা, দেখালেন,—এক বই দুই নাই! সেই সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন! তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন!" (ক)

যতদিন ভেদবুদ্ধি থাকিবে—আর অদ্বৈতজ্ঞান লাভ ভিন্ন ভেদবুদ্ধি যায় না—ততদিন বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, ভেদজ্ঞান ও তৎসঙ্গে অন্নাদির বিচার মন হইতে দূর হইবার নয়। কিন্তু যখন সকল জীবে ঈশ্বরসত্বা অনুভব হয়, যখন সর্ব্বভূতে তিনি বর্ত্তমান, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তখনই জাতি বিচার, বর্ণ বিচার আহারাদির বিচার চলিয়া গিয়া, "হিন্দু ও মুসলমান, ধনাঢ্য ও মুদ্দোফরাশ, কুকুর ও ব্রাহ্মণ" সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন

হয় এবং তখনই সার্ব্বজনীন সাম্যও ভ্রাতৃভাবের সার্থকতা হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞের অবস্থা বলিয়াছে—"বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জীবের প্রতি আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সমদর্শী হন।" *

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত মুসলমান ধর্ম্ম সাধনার বিশেষত্ব আছে। মহম্মদের মতানুগামী যাঁহারা, তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বাদসা হইতে, নীচকর্ম্মী ঝাড়ুদার ও অন্নহীন ভিক্ষুক, সমাজে একাসনে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গিত হইয়া থাকেন। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কিন্তু তাঁহারাই আবার বিধর্ম্মীর উচ্ছেদ সাধন, অনাবৃত স্বর্গদ্বার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহম্মদীয় সমদর্শী সমাজ ভয়ঙ্কর ধর্ম্মবিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম্ম সাধনায়, সর্ব্বধর্ম্মের অভেদাত্মতা ও সার্ব্বজনীন সমদর্শীতা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তিনি একটী ভাবকে মায়া, অপরটীকে দয়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি,—

> "দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে সেই সকল জিনিষকে ভালবাসার নাম মায়া। দয়া সর্ব্বভূতে সমান ভালবাসা! শুধু ব্রাহ্ম সমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব

* গীতা পঞ্চম অধ্যায়।

দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্ম্মের লোকদের ভালবাসা এটী দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়! মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়—ভগবান্ থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়!" (ক)

মুসলমান ধর্ম্ম সাধনা করিবার পর আহার সম্বন্ধে আচার-নিষ্ঠা পুনর্ব্বার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। মথুরবাবু আচার বিষয়ে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, তাঁহাকে লইয়া কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে বজরা করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিতেন,—

"সেজ বাবুর সঙ্গে ক দিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপ ও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্-লাম মাঝিরা রাঁধ্‌ছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজ বাবু বল্লে—বাবা, ওখানে কি কচ্চ? আমি হেসে বল্লাম—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু বুঝেছে যে ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বল্লে,—বাবা, সরে এস, সরে এস। এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।" (ক)

মথুর বাবুর সহিত বজরায় বেড়াইবার সময় তিনি নবদ্বীপ দর্শনান্তর কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলার চৈতন্য সভায় মহাপ্রভুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং ভগবানদাস বাবাজীও তাহা

শ্রবণ করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ হইবার পর, তাঁহার বিদ্বেষ ভাব অপনীত হয় এবং তাঁহার মহাভাবের প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনিই শ্রীচৈতন্যাসনে বসিবার উপযুক্ত।"

কিছুদিন গঙ্গার উপর ভ্রমণান্তর বর্ষার আরম্ভে তিনি পুনর্ব্বার স্বদেশ যাত্রা করেন। এবারেও আত্মীয়গণ তাঁহার আচার হীনতার কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "দেশে গেলাম, রামলালের বাপ (তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর) ভয় পেলে। ভাব্‌লে যার তার বাড়ীতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার করে দ্যায়। আমি বেশী দিন থাক্‌তে পারলাম না। চলে এলাম।" (ক)

কামারপুকুরে তিনি আসিবা মাত্র গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার সহিত আনন্দে মিলিত হইল। তিনিও পরিচিত অপরিচিত ইতর-ভদ্র সকলেরই প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ বালকদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "নারায়ণ শুদ্ধ আত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতাম ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চীনে শাঁখারি বল্‌তো,—উনি আমাদের খাইয়ে দ্যান না কেন? তা কেমন করে দেবো—কেউ ভাজ মেগো, কেউ বোন মেগো, তাদের কে খাইয়ে দেবে? সিওড়ে রাখাল ভোজন করালাম। তাদের হাতে হাতে

জলপান দিলাম। দেখ্‌লাম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল! তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগ্‌লাম।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ; এ সময় গৃহে থাকিয়া বালক চরিত্র কিরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাঁহার উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেন,—

"পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের মত- সব চৈতন্যময় ছাখে। যখন আমি ও দেশে কামারপুকুরে রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স। পুকুরের ধারে ফড়িং ধর্‌তে যাচ্ছে। পাতা নড়্‌ছে, আর পাতার শব্দ পাছে ভয়, তাই পাতাকে বল্‌ছে—চোপ, আমি ফড়িং ধর্‌বো। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতর আছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গ্যাল না। উঁকি মেরে এক একবার দেখ্‌ছে—বিদ্যুৎ, আর বলছে—খুড়, আবার চকমকি ঠুক্‌ছে।"

"পরমহংস বালকের ন্যায়, আত্মপর জ্ঞান নাই—ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বল্‌ছে—তুমি খুড়, না পিসে?" (ক)

তিনি কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া সিওড়ে গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় এবার নিজ বাটীতে প্রথম ৺ দুর্গাপূজা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতে মনে হয়, তিনি বর্ষা-

কাল সিওড়ে অতিবাহিত করেন এবং শরতের সমাগমে হৃদয়ের ৺ দুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকিয়া পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এ সময়ের একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সিওড়ে অবস্থিতির কথা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই—সব ব্রহ্মময় দ্যাখে! কোথায় যাচ্ছে কোথায় চলেছে, হিসাব নাই। রামলালের ভাই, হৃদয়ের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখ্‌তে গিছিল। হৃদয়ের বাড়ী থেকে ছট্‌কে আপনা আপনি কোন দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা কচ্চে—তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বল্‌তে পারে না,—কেবল বলে, চালা অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে। তখন জিজ্ঞাসা কল্লে, কার বাড়ী থেকে এসেছিস্? তখন কেবল বলে,—দাদা।" (ক)

স্বদেশ হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরে ১২৭৬ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু হয়। অক্ষয় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র। অক্ষয়ের জন্মমাত্রে সে মাতৃহীন হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মাতৃহীন শিশুকে সযত্নে পালন করিয়াছিলেন। অক্ষয় এ সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পূজা করিতেন। বিবাহ হইবার অল্পদিন পরেই কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। পীড়া শীঘ্রই সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে অকালে কালগ্রস্ত করিয়াছিল। অক্ষয়ের অকাল মৃত্যুতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সাময়িক কাতর হইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি মথুরবাবুর সহিত তাঁহার নূতন জমীদারী দেখিতে রাণাঘাট অঞ্চলে গমন করেন। দীন দুঃখী দিগের জন্য তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় চিরদিন অশ্রুপাত করিত। এখানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের বহির্ভাগে প্রান্তরের ধারে, ছোট ছোট পর্ণকুটীরে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, রুক্ষ দেহ, কটিতটে ছিন্নবাস, বহুসংখ্যক শ্রমজীবী অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। সম্ভবতঃ ইহারা দূর দেশবাসী, মজুরির জন্য এ প্রদেশে আসিয়াছিল। তিনি মথুরবাবুকে বলিলেন—"মা, আনন্দময়ীর রাজ্যে এত দুঃখ কষ্ট! তুমি এদের এক মাথা করে তেল, একখানা করে কাপড়, আর এক পেট করে অন্ন দিয়ে সেবা কর।" মথুর বলিয়াছিলেন, —বাবা, এত টাকা কোথা পাব যে এই সমস্ত লোককে আমি খাওয়াতে পারি? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"তুমি মার ভাঁড়াড়ী মাত্র! দীন দুঃখীর সেবার জন্য মার ঐশ্বর্য্য তোমার ঘরে!" মথুর বাবু কলিকাতা হইতে বস্ত্রাদি আনাইয়া সেই সমস্ত দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স একাদশ বৎসর তখন তাঁহার হঠাৎ দিব্যভাব উপস্থিত হয় এবং তিনি অপূর্ব্ব ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করেন। সেই দিন হইতে নিজের অন্তরে আর একজন রহিয়াছেন ইহা তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন। ক্রমে তাঁহার অন্তরে দেবভাবের স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ হইতে লাগিল। যে বাল্যভাবের বশে তিনি সকল কার্য্য করিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরস্থ এই দেবভাবের উত্তেজনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই দেবশক্তির সাহায্যেই তাঁহার নানাবিধ সাধন, ভজন, নানাবিধ

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব নির্ব্বিকল্প ও মহাভাব সমাধি! তাঁহার তন্ত্র সাধনার গুরু ব্রাহ্মণী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মহাভাবাবস্থায় দেহে অপূর্ব্ব অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ও বিরহকালে কম্পদাহাদি নানাবিধ ব্যভিচারী ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত সে সকলের আশ্চর্য্য রূপ একতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব, এই কথা প্রকাশ করেন। বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন এবং নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী তাঁহাতে অদ্ভুত ঐশ্বরিক বিভূতি দর্শন করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমোন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। এই সকল সাধক ও পণ্ডিতগণের তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস, তাহার ভিতর কিছু কি সত্য আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ সরল বালকের ন্যায় মথুরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল কথা ইহারা যা বলে ইহা কি সত্য? তুমি কোন শাস্ত্রজ্ঞ সাধক আনাইয়া ইহার মীমাংসা করাইয়া দাও।" মথুরের নিজের ও তাঁহাকে ঐশীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস ছিল সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব স্থির করিবার জন্য তিনি বিশিষ্ট সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ অনুসন্ধান করিতে সচেষ্ট হন। অবশেষে বর্দ্ধমানের সন্নিহিত ইঁদেশের তান্ত্রিকসাধক পণ্ডিত গৌরীকান্তকে বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের সহিত গৌরীকান্তের বিচারের জন্য তিনি উভয়কে একত্র সমাবেশ করিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, বৈষ্ণবচরণ উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন এবং বৈষ্ণবচরণ

ও ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য বোধে তাঁহার স্তবগান করিতে থাকেন। গৌরীকান্ত এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার পর, গৌরী শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ ইষ্ট মহাশক্তির পূর্ণাবির্ভাব জ্ঞান করিয়া ভক্তি পূজা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল সাধক পণ্ডিতগণের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন "এ সমস্তই মারই লীলা! তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।"

তিনি গৌরীকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

> গৌরীপণ্ডিত সাধন করেছিল; যখন স্তব কর্ত্তো—হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর, তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত্তো। গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্ত্তো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটী রূপ! গৌরী বলেছিল,—কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, তিনিই নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ!" (ক

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ১২৭৮ সালের ১লা শ্রাবণ, চতুর্দ্দশ বৎসর নিজের দেহ মন প্রাণ ও অতুল ঐশ্বর্য্য উৎসর্গ পূর্ব্বক, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ভক্তির সহিত, গুরু ও ইষ্টরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সেবা করিয়া, পরম ভক্ত মথুরানাথ ইহলীলা সংবরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের সহিত মথুরানাথের সেবা ভক্তির কথা চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্ব প্রকার ভাব সাধনে সিদ্ধ ও অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন তাঁহার দেহরক্ষা কেবল ভক্তের সঙ্গে বিলাস ও লোকশিক্ষার জন্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে। কোন দিন আরুনি নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, শ্বেতকেতো! তুমি আপনাকে অসামান্য বিদ্বান মনে করিতেছ এবং অভিমানে কাহার ও সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর অবগত হইলে, অশ্রুত বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়? শ্বেতকেতু ইহা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরুণি উত্তর করিলেন,—হে সৌম্য! যেমন একটা মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃন্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়, একটী লৌহমণি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লৌহ বিকার জ্ঞাত হয়, কেন না, মৃত্তিকা ও লৌহই সত্য, ইহাদের বিকার সকল মিথ্যা, সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটাদি নাম গ্রহণ করে মাত্র, সেইরূপ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সত্য, বিকার মিথ্যা। সুতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে, সমস্ত বিশ্ব জানিতে পারা যায়। হে সৌম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সন্মাত্র ছিল,—একমাত্র এবং

অদ্বিতীয়, নাম ও রূপ কিছুই ছিলনা। সেই এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রকে জানিলে সমস্তই বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে জানিতে পারিয়া তাঁহার জানিবার অবশেষ আর কিছুই ছিল না। পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি যাহা অনুভব করিতে লাগিলেন তাহা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

> "হরিই সেব্য হরিই সেবক, এই ভাবটী পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম নেতি নেতি করে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বোধ হয়। তারপর সেই দ্যাখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন—মায়া জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাখা—তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দ্যান,—'আমি' যায় না। সমাধির অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। জ্ঞান লাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। সেই 'আমি' ভক্তের 'আমি', বিদ্যার আমি, তা হতে এই অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। তাই এই ভক্তের 'আমি' বিদ্যার 'আমি' রাখে—লোকশিক্ষার জন্য, আবার ভক্তি আস্বাদ কর্‌বার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস কর্‌বার জন্য।" (ক)

উপরোক্ত উক্তিতে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈতভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া, তাঁহার এখন বিজ্ঞানীর

অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভগবান্ তাঁহার একটু 'আমি' রাখিয়া দিয়াছেন,—এখন তাঁহার পাকা আমি। এই পাকা আমি, দাস আমি, ভক্ত আমি, ছেলে আমি, এইরূপ 'আমি' জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভগবানের বিচিত্র জগৎলীলা ও নরলীলা আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী মা, তাঁহাতে ভক্তের আমি রাখিয়া দিয়াছেন—তাঁহার ভক্তের সঙ্গে বিলাস করিবার জন্য, আর লোকশিক্ষার জন্য। তাঁহার মা, তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—তুই ভাবেই থাক্, আমার সব ভক্তেরা আস্‌বে, তোকে ঐহিক লোকের সঙ্গ কর্ত্তে হবে না, আমার শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ কেবল থাক্‌বে।"

মথুরানাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে শ্রীসারদাদেবী তাঁহার স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। ছয় বৎসরের বালিকা বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় আট বৎসর পরে, প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার প্রথম স্বামী সন্দর্শন ঘটে। সাত বৎসর সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমন করিলে, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীসারদাদেবীকে তথায় আনয়ন করা হয়। এত দিন তিনি শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ে উন্মাদ অবস্থায় রহিয়াছেন। কামারপুকুরে আসিয়া তিনি স্বামীর নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের এ সময় লোকাচার পরিত্যাগ ও ভগবৎ চিন্তায় ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা সবিশেষ জানা যায় না। ইহার ও পর প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া

গিয়াছে। তিনি এখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও কর্ত্তব্য আছে। স্বামীর যেরূপ অবস্থাই হউক সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে শাস্ত্র ও লোকচার উভয়েরই তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্রীসারদাদেবী, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাসে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শুনা যায়, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে পিতার সমভিব্যাহারে এবং জয়রামবাটী গ্রাম ও তদঞ্চলের অনেক স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিতেছিলেন। কিন্তু বহুদূর পথ চলার কষ্টে তিনি প্রবল জ্বরে পীড়িতা হইয়া কোন চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করিলে, ঐ স্থান হইতে পিতার সহিত তিনি অসুস্থ শরীরে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। দুঃসহ ক্লেশ কি করিয়া নিরবে সহ্য করিতে হয়, শ্রীসারদাদেবীর জীবনে তাহা চিরদিন দেখা গিয়াছে। শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এক অভিনব পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইল। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 'মার' কাছে আদিষ্ট। তাঁহার প্রথম ভক্ত ও শিষ্যা তাঁহার পত্নী শ্রীসারদাদেবী!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্ম্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে সবিশেষ যত্ন ও সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নহবতে আপনার জননীর নিকট নিভৃতে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীসারদাদেবী ও প্রীত মনে স্বামী ও শ্বশ্রূর সেবায় নিযুক্তা হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এখন পাঁচ বৎসরের

বালকের স্বভাব হইয়াছে—সদানন্দ মূর্ত্তি সরল বালক অনুক্ষণ মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাধি মগ্ন হইয়া থাকেন। সে প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে, মহাপাষণ্ড নাস্তিক ও পাপাচারীর মন ও দ্রবীভূত হয়। শ্রীসারদাদেবী স্বামীকে যে পরম আরাধ্য দেবতা ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না,—ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, পত্নী শ্রীসারদাদেবীকে কি ভাবে স্বীয় সন্নিধানে রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ষোড়শী পূজায় প্রকাশ পাইয়াছে। জীবশিক্ষার জন্য, নিজ জীবনে সেই মহাপূজা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—

> "যে মেয়ে মানুষের কাছে থেকে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধ হবে সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী! তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্ব্বে! আর তত ভয় নাই!" (ক)

শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই, শ্রীরামকৃষ্ণ সোপচারে ও বিহিত বিধানে ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী শ্যামাপূজার রাত্রে তাঁহার গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছিল। ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে জগদম্বার পূজা করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে ষোড়শী পূজা বলে। শ্রীবিদ্যা ও ত্রিপুরাসুন্দরী ইঁহারই নামান্তর। ষোড়শী পূজায় ভগবতীর কোনরূপ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি কল্পনা নাই। মহামায়াকে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী, সর্ব্বকল্যান দায়িনী রূপে ধ্যান করিবার বিধান। মহাবিদ্যা ষোড়শী দেবীর ধ্যান নিম্নোক্তভাবে করিতে হয়।

"দেবী পদ্মসন্নিভা, বালসূর্য্য কিরণের ন্যায় ইঁহার শরীরের জ্যোতিঃ। ইনি জবাকুসুম, দাড়িম্ব পুষ্প পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ বিশিষ্টা। ইঁহার মস্তকস্থিত উজ্জ্বল মুকুট মাণিক্য-কিঙ্কিণীজাল দ্বারা বিভূষিত। কৃষ্ণকায় অলিবৃন্দের ন্যায় বক্র অলকাদাম সুশোভিত ও নবোদিত অরুণের ন্যায় ইঁহার মুখপদ্ম। কুটিল ললাট দেশে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। এই পরমেশ্বরীর শিবধনু সদৃশ ভ্রূযুগল। ইঁহার নেত্র ত্রয় আনন্দভরে মুদিত ও বিকশিত হইতেছে। উজ্জ্বল কিরণবিশিষ্ট সুবর্ণকুণ্ডলে কর্ণযুগল পরিশোভিত। সুন্দর গণ্ডস্থলে সুধাংশুর অমৃতমণ্ডল জয় করিয়াছে। তাম্র বিদ্রুম মণি ও বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠাধরে অমৃত স্যন্দিত হইতেছে এবং ঈষৎ হাস্যের মাধুর্য্যে রসসাগরের মাধুর্য্যকে জয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দ্বারা পাদপদ্ম শোভিত। ইনি রক্তপদ্মে উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহার চারি হস্ত ও ত্রিনেত্র। ইঁহার দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ। ইনি অপর দুই হস্তে পঞ্চবান ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বপ্রকার মোহন বেশ এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা। জগতের আহ্লাদদায়িনী, জগৎ রঞ্জনকারিণী, জগৎ আকর্ষণকর্ত্রী, জগতের কারণস্বরূপা, সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনী, সর্ব্বলক্ষ্মী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী, এই মঙ্গলদায়িনী নিত্যা দেবীকে চিন্তা করি।"

শ্রীসারদাদেবীকে সম্মুখস্থিত দেবীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া পুষ্প চন্দন মাল্য ধূপ দীপাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা দিব্য-মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীপাদপদ্মে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি ও

আপনার জপমালা সমর্পণ করিয়া তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইলেন। শ্রীসারদাদেবী ও স্বহৃদয়ে জগদম্বার আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহারও বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। ষোড়শী পূজার পুণ্যফলে বিবাহিতা হইয়াও তিনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী, সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মার যত রূপ দেখিছি, তাঁর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে অনুপম—তার তুলনা নাই!"

শ্রীরামকৃষ্ণ এসময় আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া শ্রীসারদা দেবীকে আপনার শয়ন শয্যায় স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পুনর্ব্বার সখীভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়াছেন,—

"তা না হলে পরিবারকে আট্‌মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন কোরে? দুজনেই মার সখী!" (ক)

শুনা যায় এ সময় তাঁহার ভাবসমাধি প্রগাঢ় হইয়াছিল। শ্রীসারদাদেবীকে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইত। রাত্রে তিনি প্রায় নিদ্রা যাইতেন না, সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন চিত্তে জাগিয়া অপেক্ষা করিতেন, কখন সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়। সমাধি দেখিলেই তিনি মার নাম শুনাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

শ্রীসারদাদেবী ভক্তিবিনম্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দিবারাত্র কি ভাবে রহিয়াছেন এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেন, তাঁহার শ্রীমুখের বর্ণিত প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। এরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নিজের জীবন কি ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বক্ষণ জ্ঞান ভক্তির কথা শ্রবণ

করিয়া, সংসারে থাকিয়াও কি করিলে ভগবান লাভ হয়, তিনি সাক্ষাৎভাবে তাহা অবধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকেই আপনার ইষ্ট জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, এবং মনে জ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া রহিলেন। স্বামীর নিকট তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞানও ছিল না। শ্রীসারদাদেবী লজ্জা ধৈর্য্য দয়া ক্ষমা স্নেহ ও সেবার জীবন্ত মূর্ত্তি! দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অবস্থান কালে গভীর নিশীথে, যখন সকলেই নিদ্রাভিভূত, তিনি জাগরিতা হইয়া নিঃশব্দে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। কালীবাড়ীতে নিত্যই উৎসব, কর্ম্মচারী ভৃত্য পূজক সাধু অতিথি প্রভৃতি শত শত লোকপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা দূরে থাক, তাঁহার অবস্থিতি মাত্রও কেহ কখন জানিতে পারে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবাকারী অন্তরঙ্গ ভক্তগণও কেহই তাঁহার কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ কখন শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দর্শন ত দূরের কথা। স্বামী যোগানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন—"আমি মাকে লইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, বহু তীর্থস্থানে লইয়া গিয়াছি, গাড়ী হইতে নামান উঠান পর্য্যন্ত আমাকে করিতে হইয়াছে, কিন্তু মার শ্রীচরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই!" শ্রীসারদাদেবীর চরিত্রে স্বামীর একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ও স্ত্রীলোকের অমূল্য ভূষণ স্বরূপ, সসম্ভ্রম লজ্জার ভাব, আধুনিক স্বাধীনতা প্রয়াসী, পুরুষ-সমতা-কাঙ্খিনী ইংরাজী অনুকরণে শিক্ষিতা হিন্দু মহিলার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সমাজে গৌরী, সীতা ও সাবিত্রী স্ত্রী চরিত্রের চরমোৎকর্ষ ভাবে

পূজীতা হইতেছেন, সে সমাজে শ্রীসারদাদেবীও যে আদর্শ-স্থানীয়া হইবেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

নহবতে যে কক্ষে তিনি থাকিতেন তাহাতে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর শয্যা, আহারীয় দ্রব্য, তৈজসপত্রাদি রক্ষিত হইবার পর একটু বসিবার স্থানের সংকুলান হওয়া দুর্ঘট ছিল। তিনি কি করিয়া সেই অল্প পরিসর স্থানে দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন, তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। আগন্তুক, অভ্যাগত, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত যে কেহ জয়রামবাটী যাইয়া তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হইয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীসারদাদেবীর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে লোকসেবা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! নিজ পিতা মাতা ও পরমাত্মীয়গণেও সেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই। পল্লিগ্রামে দরিদ্র সংসারে আহারীয় দ্রব্যের নিত্যই অভাব। সহসা লোক সমাগমে সে সকল সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। অতিথি সৎকার করিবার জন্য অনেক সময় লোকাভাবে তিনি স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে, কৃষক পল্লি হইতে ফলমূলাদির বোঝা নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছেন! নিজের রুগ্ন দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া দেহপাত করিয়াছেন, কিন্তু সাহায্যের জন্য কাহাকেও ব্যস্ত করিতে বা কষ্ট দিতে চাহিতেন না। আগন্তুক সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে, তিনি দ্বারদেশে আসিয়া সজল নয়নে দণ্ডায়মানা থাকিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা নয়নপথ অতিক্রান্ত হন। আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকলকে প্রীতিদানে সন্তুষ্ট রাখিয়া, স্বার্থপর সতত

দ্বেষ হিংসা কলহ পূর্ণ সংসার মধ্যে সকল দুঃখ ক্লেশ নিরবে সহ্য করিয়া, প্রশান্ত মনে তিনি দিন যাপন করিয়াছেন। কত শোক তাপ দগ্ধ অসহায় স্ত্রীলোক তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের শেষকাল শান্তিতে কাটাইয়াছে! শ্রীসারদাদেবীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে। আমরা দুই একটী কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আটমাস কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া, শ্রীসারদাদেবী পিত্রালয়ে গমন করেন। মথুরবাবুর পরলোক গমনের পর এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননীর আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য অর্থাভাব হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা সিঁদুরিয়া-পটী নিবাসী বাবু শম্ভুচরণ মল্লিকের বদান্যতায় তাঁহাকে সে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। শম্ভুচরণ একজন ইংরাজী শিক্ষিত হৃদয়বান্ পুরুষ। শুনা যায়, কোন সদাগর আফিসে মুৎসদ্দীর কর্ম্মে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নিকট তাঁহার একখানি বাগান বাটী ছিল এবং তথায় দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের পীড়িত দিগকে ঔষধ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে অবধি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শম্ভুবাবুর বাগানে সময় সময় যাইতেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতীত হইত।

প্রভূত সঞ্চিত অর্থ যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন, শম্ভুবাবুর ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু মানুষের জন-সাধারণের মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যে অনেক সময় সকাম হইয়া

থাকে, এবং ঐ সকল কৰ্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষ ভুলিয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই শম্ভুবাবুকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শম্ভু বল্লে এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যে টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেনসারী, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সবে। আমি বল্লাম, এসব অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পাল্লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক্ এটী যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, হাঁসপাতাল ডিস্‌পেনসারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্‌নে এলেন, এসে বল্লেন—তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বল্‌বে,—আমায় কতক গুলো হাঁসপাতাল ডিস্‌পেনসারী করে দাও?—না বল্‌বে—হে ভগবান্! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমায় সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই! হাঁসপাতাল ডিস্‌পেনসারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়—তিনি কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি! তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী হতে পারে।" (ক)

শম্ভুবাবুর নিকট হইতে সামান্য একটু আফিম্ কিরূপ তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন, আমরা অন্য স্থানে তাহা বলিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈদৃশ অদ্ভুত ত্যাগের

দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, শম্ভুচরণ ও মথুরানাথের ন্যায় অকপট ভক্তি যোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম অবস্থিতি কালে, কালীবাড়ীর নহবতে থাকিবার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল জানিতে পারিয়া, শম্ভুবাবু মন্দিরের সন্নিকটে একখণ্ড জমি খাজনা করিয়া লইয়া, তাহাতে বাসের উপযোগী একটী কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

শম্ভুবাবুর খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মধ্যে মধ্যে বাইবেল গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শুনাইতেন। শম্ভুচরণের নিকট তিনি যিশুখ্রীষ্টের পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্মোপদেশের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যিশু খ্রীষ্টকে ঋষি খ্রীষ্ট বলিতেন। তিনি নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, একদিন অচিন্ত্য রূপে তাঁহার যিশুখ্রীষ্টের জীবন্ত সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। বাবু যদুনাথ মল্লিকের বাগান-বাটীর বৈঠকখানা গৃহ এই অপূর্ব্ব ঘটনার স্থান। কালীবাড়ীর পার্শ্বেই কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী বাবু যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাটী। যদুনাথ এবং তাঁহার মাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব্ব-ত্যাগী ও সর্ব্ববিধ আকাঙ্খাশূন্য সাধু পুরুষ জানিয়া বিশেষ ভক্তি করিতেন। এবং প্রায়ই তাঁহাকে নিজ বাগানবাটীতে ও কখন কখন কলিকাতার বাসভবনে লইয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যদুনাথের উদ্যানগৃহে যিশুখ্রীষ্টের একখানি সুন্দর তৈল চিত্র দেখিতে পান। চিত্রখানিতে যিশুমাতা মেরী, শিশু যিশুকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন, ইহাই চিত্রিত ছিল। চিত্র দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মহা-ভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হন এবং সমাধি অবস্থায় অনুভব করেন যে,

যিশুমূর্ত্তি চিত্র হইতে আসিয়া তাঁহার দেহের ভিতর মিশিয়া যাইলেন! তাঁহার উপলব্ধি হইলে যে, যিশু এবং তিনি এক ব্যক্তি! এই ঘটনার পরে তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মোপদেশ ও উপাসনা দেখিবার ও শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তিনি 'মাকে' বলিয়াছিলেন,—

"মা! তোমার খ্রীষ্টান ভক্তেরা কিরূপে তোমায় ডাকে আমি দেখ্‌বো!" (ক)

কলিকাতার কোন গির্জ্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া খ্রীষ্টীয় উপাসনা পদ্ধতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসি নাই,—ভাবলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দ্যায়।" * (ক)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ দিব্য দর্শনের ভিতর প্রগাঢ় অর্থ অনুস্যূত রহিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম সাধন করিয়া তিনি যেমন সর্ব্ববর্ণে, সর্ব্ব জাতিতে ও সর্ব্বজীবে অভেদাত্মতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিশুখ্রীষ্টের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সর্ব্ব জাতীয় ও সর্ব্বকালীয় অবতার ও প্রত্যাদিষ্ট ঋষি ও মহাপুরুষদিগের একাত্মতা-রূপ অলৌকিক সত্য, সাক্ষাৎ অবধারণ করিলেন। এই দিব্যদর্শন

* এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটী প্রাত্যহিক ব্যবহার অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কালীবাড়ীর যে ঘরে তিনি থাকিতেন, তাহার দেয়ালে অনেক-গুলি দেবদেবীর ছবির সহিত তাঁহার নিজের ফটোগ্রাফ ও কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত একখানি যিশুখ্রীষ্টের ছবি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সকল দেবদেবী মূর্ত্তি নমস্কার করিবার সময়, যিশুখ্রীষ্টের ছবি তিনি কখন নমস্কার করিতেন না।

প্রভাবে তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সাধনা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদৈশিক ও সার্ব্বলৌকিক সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের মহাসম্মিলন সংসাধিত হইল। বাসনা-বিমূঢ়-চিত্ত ও সংশয়াত্মা আমরা, এই মহাসমন্বয়ের মহত্ত্ব, গভীরতা ও গুরুত্ব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কেমন করিয়া ধারণা করিব!

শম্ভুচরণ ও যদুনাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় সম্ভবতঃ ১২৭৯ সালে হইয়াছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত ও এ সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নৈনান উদ্যানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দয়ানন্দকে দেখ্‌তে গিছ্‌লাম। তখন ওধারে একটী বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সে দিন; তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগলো। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বল্‌তো গৌরাণ্ড ভাষা। দেবতা মান্‌তো—কেশব মান্‌তো না। তা বল্‌তো, ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন, আর দেবতা কর্ত্তে পারেন না! নিরাকার বাদী। কাপ্তেন * 'রাম রাম' কচ্ছিল, তা বল্লে, তার চেয়ে সন্দেশ সন্দেশ বল।"

স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার শ্রীমুখের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি সকল এবং ভাবাবেশে প্রেমানন্দ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

* কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতে কাপ্তেন তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই সমভিব্যাহারে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী দয়ানন্দকে দেখিতে যান।

"আমরা কেবল শাস্ত্রের বাক্যাড়ম্বর লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এই মহাপুরুষ শাস্ত্রের সার ভাগ উপভোগ করিতেছেন!"

এ সময় কি ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন বা পদগৌরবান্বিত ব্যক্তি, কি পণ্ডিত বা সাধু কাহারও সহিত কথা বার্ত্তায় তিনি স্পষ্টবাদীতা এবং নির্ভীকতা স্বতঃই প্রদর্শন করিতেন। মনোরঞ্জক তোষামোদ বাক্য, তাঁহার জিহ্বা কখন উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হয় নাই। মথুরানাথকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"তুমি মনে কোরো না, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মান্‌ছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো।" তিনি বলিতেন,—

"যদুমল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র * এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি বল্লাম—কর্ত্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কি না? যতীন্দ্র বল্লে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন।' তখন আমার বড় রাগ হলো। বল্লাম, তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য বিবেক বৈরাগ্য ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না? আরও কত কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধল্লে! যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।"

"অনেক দিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী গিছ্‌লাম। তাকে বল্লাম, 'তোমাকে রাজা টাজা

* মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বল্‌তে পারব না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে।' আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখ্‌লাম, সাহেব টাহেব আনাগোনা কর্ত্তে লাগলো। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হলো। সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদনাহয়েছে।" (ক)

নারায়ণ শাস্ত্রী এ সময় তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই থাকিতেন। এবং মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত কালীবাড়ীর কুঠিতে তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন.—

"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল. মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল—তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ কচ্ছিল। দপ্তরখানার সঙ্গে বড় ঘর, সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্‌তে পাল্লে না—ভুল হতে লাগ্‌লো। তখন ভাষায় কথা হলো। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে,—তুমি নিজের ধর্ম্ম ছাড়লে ক্যান? মাইকেল পেট দেখিয়ে বল্লে,—পেটের জন্য ছাড়্‌তে হয়েছে। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'যে পেটের জন্য ধর্ম্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব!' তখন মাইকেল আমায় বল্লে—'আপনি কিছু বলুন।' আমি বল্লাম, কে জানে ক্যান আমার বল্‌তে ইচ্ছা কচ্চে না। আমার মুখ কে য্যান চেপে ধরেছে।" (ক)

যদিও ইতঃপূর্ব্বে ভারতের নানা প্রদেশের বেদান্তবাদী ও

বিভিন্ন পন্থী বৈষ্ণব, সাধু ও সন্ন্যাসীগণ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের অনেকানেক তান্ত্রিক সাধক, কর্ত্তাভজা বাউল সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম মাত্র শ্রবণ করে নাই। শিক্ষিত দলের মুখপাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। ১২৮১ সালে,—কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার কিরূপে মিলন হয়, তৎসম্বন্ধে জনৈক ব্রাহ্ম প্রচারকের বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ মুখে কেশবের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা এরূপ বলিয়াছিলেন,—

"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখ্‌লাম। সমাধি অবস্থায় দেখ্‌লাম,—কেশব সেন আর তার দল। অ্যাক ঘর লোক আমার সাম্‌নে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটী ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখ্‌লাম লাল মণি— ওটী রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বল্‌ছে—'ইনি কি বল্‌ছেন তোমরা সব শোন।' মাকে বল্লাম—মা! এদের ইংরাজী মত, এদের বলা ক্যান? তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম ও মায়ের নাম ওরা নিয়ে গ্যাল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে * নিলে। কিন্তু আদিসমাজে গ্যাল না।" (ক)

* পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সমাধিতে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার পর তাঁহার বিশেষ সংবাদ লইবার জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি বলিতেন,—

"কেশব সেনকে দ্যাখ্‌বার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে বল্লাম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, 'লোকটা জপে সিদ্ধ।' সে জ্যোতিষ জান্‌তো, বল্লে,—কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে সে ভাষায় কথা কইল।"

"তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখ্‌লাম। দেখেই বলেছিলাম—এঁরই ল্যাজ খসেছে। ইনি জলেও থাক্‌তে পারেন, ডাঙ্গাতেও থাকতে পারেন। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব বল্লে,—"তোমরা হেস না, এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।" আমি বল্লাম—যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ না খসে, তার কেবল জলে থাক্‌তে হয়, আড়ায় উঠে বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ খসে, অম্‌নি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলে ও থাকে আবার ডাঙ্গায় ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে,—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাক্‌তে পারে।" (ক)

'মার' ইচ্ছায় ও সাক্ষাৎ আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশব চন্দ্রের এবং তাঁহার সাহচর্য্যে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

একত্র সম্মিলন। কেশবচন্দ্র হইতেই ভক্ত সমাগম আরম্ভ, এবং কেশবচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার মহা ধর্ম্মসমন্বয় বার্ত্তা জগতের সমক্ষে প্রচার।

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি অধিকারী বুঝিয়া শিক্ষা দিতেন। যে ব্যক্তি যে ভাবের অধিকারী তাহাকে সেই ভাবে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুষ্কর তপশ্চর্য্যার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে তাঁহার সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত সমান সহানুভূতি ছিল। তাঁহার উক্তি,—

> "আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটী রাখ্‌তে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। আমি সব ভাবই কিছু কিছু দিন কর্ত্তাম তবে শান্তি হতো। আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদের ও মানি, বৈষ্ণবদের ও মানি আবার বেদান্তবাদীদের ও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজ কাল কার ব্রহ্মজ্ঞানীদের ও মানি। এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আস্‌বে বলে,—বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্ত্তাভজা, বেদান্তবাদী আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী।" (ক)

যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, ঈশ্বর লাভের পর ও তাঁহার কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষা রূপ মহাকার্য্য এখন ও বাকী। তাঁহার উক্তি,—

"জ্ঞান লাভ করে চুপ করে থাক্‌লে লোকশিক্ষা কি করে হবে? বিজ্ঞানী স্বার্থপর নয় যে আপনার হলেই হলো। সে আম সব্বাইকে দিয়ে খায়, আপনি খেয়ে মুখ পুঁছে বসে থাকেনা।" (ক)

জীবন্মুক্ত পুরুষই জগতের কল্যান করিবার প্রকৃত অধিকারী। কারণ তাঁহার কার্য্যশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি। তিনিই লোক-গুরু আচার্য্য; কারণ ঈশ্বরের বাণী তাঁহার শ্রীমুখ দিয়াই বাহির হয়। কেবল জগতের মঙ্গল ইচ্ছায় ও লোকশিক্ষার জন্য বিজ্ঞানী পুরুষ দেহরক্ষা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানদান করিবার জন্য বিদ্যার 'আমি' রাখিয়াছিলেন; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রেম বিলাইতে ভক্তির 'আমি' রাখিয়াছিলেন; যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় এক মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে প্রচার হইয়াছে!

লোকশিক্ষক কে হইতে পাবেন? ধর্ম্মশিক্ষা দিবার অধিকারী কে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে উক্তি, তাহাতে তিনি কোন রূপ সংশয় রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দ্যান তাহলে হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুন্‌বে? সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা যেরূপে হোক্‌ ঈশ্বরকে লাভ কর্ত্তে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেক্‌চার দিতে হয়। আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎ কার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। যে

তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়!"

"ওদেশে (কামারপুকুরে) হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল বেলা বাহ্যে করে রাখ্‌তো। যারা সকাল বেলা আসে খুব গালাগাল দ্যায়। আবার তার পরদিন সেইরূপ,—বাহ্যে আর থামেনা। লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই যখন একটা কাগজ মেরে দিলে,—বাহ্যে করিও না, তখন সব বন্ধ। যে লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস্ চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয়না, আবার অন্য লোক! কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে, হিতে বিপরীত! ভগবান্ লাভ হলে অন্তদৃষ্টি হয়,—কার কি রোগ বুঝা যায়, তখন উপদেশ দেওয়া যায়।" (ক)

"ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার, তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না, বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। সন্ন্যাসী ও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের অভিমান রাখেন নাই। "তিনি নয়" কিন্তু তাঁহার মা, তাঁহাকে যেমন বলাইতেছেন, তিনি তেমনিই বলিতেছেন,"—ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"গুরু, বাবা, কর্ত্তা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে—চিরদিন বালক, আমি আবার বাবা কি? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছ্‌লো। সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল। কেশব সেন আর সব আস্‌বে শুনে ছিলাম। গোটা কত কথা বল্‌বো বলে ঠিক্ করে ছিলাম। রাধা-বাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। তখন বল্লাম্—মা তুই বলবি! আমি আর কি বল্‌বো! আমার স্বভাব এই,—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা! সরস্বতীর জ্ঞানের একটী কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!" (ক)

তাঁহার উক্তির ইহাই মর্ম্ম যে, লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা ঈশ্বরের বাণী—ভগবানের আদেশবাণীই তিনি জনসমক্ষে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অহংজ্ঞানে তিনি কোন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি,—

"যেমন আকাশের জল ছাদ হতে, বাঘেরমুখ দিয়ে বেরোয়, তাঁরই কথা এই খোলটার ভিতর দিয়ে বেরুচ্ছে!"

বর্ত্তমান যুগে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান ও অন্যান্য নানা ধর্ম্মমত ও তাহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্বেষ পর হইয়া নিজ নিজ মত সংস্থাপনের জন্য পরস্পর বিরোধকারী ও শত্রুভাবাপন্ন। সকল ধর্ম্মেরই ভিতর ঈর্ষা ও অনুদার ভাব

প্রবল। সহানুভূতির অভাবে এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত। পৃথিবীর আদি হইতে ধর্ম্মের নামে কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন না মনুষ্য সমাজ-দেহ বিখণ্ডিত করিয়াছে, কত শোণিত স্রোত না প্রবাহিত হইয়াছে! জগৎ ব্যাপী এই ধর্ম্মবিপ্লব ও বিদ্বেষ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মভাব সাধনে সিদ্ধ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সমাচার প্রচার করিতেছেন,—

১। সকল ধর্ম্মই এক একটী পথ ; সকল ধর্ম্ম পথেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়।

"এক একটী ধর্ম্মের মত এক একটী পথ, ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়। নানা ধর্ম্ম, নানা পথ, এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সব মতই পথ—মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে, একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়—তবে কোন ও পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা। শুদ্ধ-পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।"

"একটা জোর করে ধর্ত্তে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে ওঠা যায়, একখানা মইয়ে ওঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে ওঠা যায়, একগাছা দড়ি দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধর্ত্তে হয়। একটাতে দৃঢ় হলে তবে

ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীরাও ঈশ্বরলাভ কর্ব্বে, নিরাকার বাদীরাও ঈশ্বরলাভ কর্ব্বে।"

২। সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরই করেছেন।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ সব করেছেন—অধিকারী ভেদে। তাঁর ইচ্ছায় নানা ধর্ম্ম নানা মত হয়েছে: তবে তিনি যার যেমন রুচি আবার যার যা পেটে সয় তাকে সেইটী দিয়েছেন। এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করেছেন। মা সকলকে মাছের পোলাও দ্যান না—সকলের পেটে সয় না। যার পেটের অসুখ তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। আবার কারু জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড় চড়ি, মাছ ভাজা এই সব করেছেন। যার যেটা ভাল লাগে; যার যেটী পেটে সয়। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভাল বাসেন। প্রকৃতি আলাদা, আবার অধিকারী ভেদ। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সেই ভাবটী নিয়ে থাকে।"

৩। সকল ধর্ম্মমতই সত্য অতএব বিদ্বেষভাব ভাল নয়।

"আন্তরিক হলে সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরা ও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরা ও

পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ও পাবে, আবার মুসলমান খ্রীষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। বৈষ্ণব বলে—আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজ্‌লে কিছু হবে না; শাক্ত বলে--আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—তাঁকে না ভজলে কিছুই হবে না। খ্রীষ্টানরা বলে—আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম না মান্‌লে কিছুই হবে না।

"এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম্মই ঠিক আমি যা ভাবছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।"

"আবার কেউ কেউ বলে.—আমরা নিরাকার বল্‌ছি অতএব ঈশ্বর নিরাকার সাকার নন, আমরা সাকার বলছি অতএব তিনি সাকার নিরাকার নন। এই বলে আবার ঝগড়া। যত লোক দেখি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া কচ্চে ও এর সঙ্গে ঝগড়া কচ্চে। হিন্দু মুসলমান ব্রহ্মজ্ঞানী শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সব পরস্পর ঝগড়া। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলোনা যে. তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো, "আমার বিশ্বাস এইরূপ, আরও কত কি হতে পারেন তিনি জানেন, আমি জানি না: বুঝ্‌তে পারি না।" মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন স্থান, আর বুঝিয়ে স্থান, তা হলে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।"

"হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায় যাচ্চে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাক্‌লে ভগবান লাভ হবে।"

"যদি কোন মত আশ্রয় কোরে তাতে ভুল হয়ে থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধ্‌রিয়ে দ্যান। তাঁর জগৎ তিনি ভাব্‌ছেন। আন্তরিক ডাক্‌লেই হলো। তিনি ত অন্তর্যামী, তিনি অবশ্যই জানিয়ে দেবেন তাঁর স্বরূপ কি। তবে এটী ভাল নয়—এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বল্‌ছে সব ভুল। ... কি তাঁর ইতি কর্ত্তে পারে?"

৪। ঈশ্বর এক; সকল ধর্ম্মেই তাঁকে চায় আর কারুকে চায় না।

"বস্তু এক নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিষকে চাচ্চে: হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান শাক্ত শৈব বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী—সকলেই এক বস্তুকে চাইছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী করে—বল্‌ছে জল। মুসলমান্‌রা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে, চামড়ার ডোল করে—তারা বল্‌ছে পানী। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে—তারা বল্‌ছে ওয়াটার। যদি কেউ বলে—না, এ জিনিষটা জল নয়—পানী; কি পানী নয়

—ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়—জল; তা হলে হাসির কথা হয়! তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া—ধর্ম্ম নিয়ে লাঠালাঠি কাটাকাটি—এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্চে। আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ কর্‍বে। বেদ পুরাণ তন্ত্র—সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায় আর কারুকে চায় না।"

"ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই, কেবল নামে তফাৎ। কেউ বল্‌ছে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বল্‌ছে—কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যিশু, দুর্গা! এক রাম তাঁর হাজার নাম!"

৫। ঈশ্বরের স্বরূপ যে যতটুকু জেনেছে, সে সেই মাত্র বল্‌তে পারে :

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হলে তাঁর স্বরূপ কি ঠিক বলা যায়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, আরও তিনি কত কি আছেন, তা বলা যায় না। কতকগুলি কাণা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। অ্যাকজন লোক বলে দিলে—এ জানোয়ারটীর নাম হাতী। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হলো হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ কর্ত্তে লাগ্‌লো। একজন বল্লে—হাতী একটা থামের মত—সে কানাটী হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর

একজন বল্লে—হাতী একটা কুলোর মত,—সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়েছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানা প্রকার বল্‌তে লাগ্‌লো। তেম্‌নি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে,—ঈশ্বর এম্‌নি আর কিছু নয়।"

৬ ঈশ্বরকে যে সর্ব্বভাবে দর্শন করেছে, সেই তাঁর যথার্থ স্বরূপ জানে।

"যে ভক্ত যেরূপ দ্যাখে সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক, কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ কর্ত্তে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বুঝিয়ে দ্যান। একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বল্লে,—গাছতলায় একটী সুন্দর লাল গিরগিটী দেখে এলাম। আর একজন বল্লে,—তোমার আগে আমি সেই গাছতলায় গিছ্‌লাম, তা সে লাল রং হতে যাবে ক্যান? সে যে সবুজ রং—আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বল্লে,—ও, আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গিছ্‌লাম। সে গিরগিটী আমিও দেখেছি। সে লাল ও নয়, সবুজ ও নয়,—স্বচক্ষে দেখেছি—নীল। আর দুইজন ছিল, তারা বল্লে—হল্‌দে, পাঁস্‌টে, নানা রং। শেষে সব ঝগড়া বেধে গ্যাল। সকলে জানে আমি যা দেখেছি তাই ঠিক্। তাদের ঝগড়া দেখে অ্যাকজন লোক জিজ্ঞাসা কল্লে—ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ

শুন্‌লে, তখন বল্লে,—আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি, আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বল্‌ছো, তা সব সত্য। ও গিরগিটী কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রং নাই—নির্গুণ।"

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দ্যাখা দ্যান,—নানা ভাবে দ্যাখা দ্যান। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে যে বহুরূপী নানা রং—আবার কখন কখন কোন রংই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"

"তা শুধু সাকার বল্লে কি হবে?—তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এ ও সত্য, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দ্যান এ ও সত্য, আবার তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এ ও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে,—সগুণ ও বলেছে, নির্গুণ ও বলেছে।" (ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলি কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নয়, কোন দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয়, কেবল ন্যায় বিচারের মীমাংসা ও নয়, এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, জগদম্বার আদেশে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

আবার সর্ব্বধর্ম্ম গ্রাসোন্মুখ, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদীর

মীমাংসা যে, আত্মা পরোলোক প্রভৃতি অলৌকিক তত্ত্ব, মানব জ্ঞানের বহির্ভূত পদার্থ। ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—মনবুদ্ধির অগোচর। কোনরূপ উপায়ে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না, জানিবার আবশ্যক ও নাই।

ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটী মত এই যে, মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তৎকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে তাহার মনে আত্মা ও পরলোকের কল্পনা উদয় হইয়াছিল। স্বপ্নাবস্থায় নিজে নানা কর্ম্ম করিতেছে দেখিয়া, অসভ্য মানুষ মনে করে যে, তাহার দেহের ভিতর ঠিক তাহারই মত আর এক জন আছে। সে যখন নিদ্রা যায় তাহার অনুরূপ দ্বিতীয় সত্বাটীই তখন নানা কার্য্য করিয়া বেড়ায় এবং জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে দেহমধ্যে ফিরিয়া আইসে। যখন কেহ মৃত হয়, এই ভিতরের সত্বা, দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় দেহমধ্যে সে ফিরিয়া না আসিয়া প্রেতরূপে চক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বাস হইতে ক্রমে দেহমধ্যে একটী স্বতন্ত্র আত্মা আছে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে, জীবিতাবস্থার ন্যায় তাহার প্রীতির জন্য, শ্মশানে ও তাহাকে আহার দ্রব্য, পরিধেয় প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ অনুষ্ঠান হইতে প্রেতপিতৃপূজা ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তি; ইহাই ক্রমে দেবপূজায় পরিণত হয়। পরলোক প্রেতাত্মার দেশ। যত লোক মরে সকলেই প্রেত হয়। এইরূপে যতদিন যায়, যত মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, প্রেতের দল ও ততই বাড়িতে থাকে। ক্রমে প্রেত সকল স্থানেই বর্ত্তমান বোধ হয়;

কখন কখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেতলোকে যাইয়া প্রেত প্রকৃত শক্তিমান হইয়া উঠে। মহাশক্তিশালী প্রেত না করিতে পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। সকল দেহের ভিতর, সকল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। মানুষ পশু সর্পাদি সকল দেহ ধারণ করিতে পারে। সকল প্রকার পীড়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী প্রেতের দেহমধ্যে প্রবেশ দ্বারা ঘটিতে পারে। আবার মঙ্গলকারী প্রেত দেহে প্রবেশ করিয়া অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রমে এইরূপ মহাশক্তি সমন্বিত প্রেত, কখন অপদেবতা কখন বা দেবতা বলিয়া পূজিত হন। মঙ্গলকারী প্রেত-দেবতাকে পূজা করিলে, ধন পুত্র ঐশ্বর্য্য, যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই লাভ হয়। অনিষ্টকারী অপদেবতা নানারূপে কষ্ট দেন। বন্য জন্তু সর্পাদি তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। রোগ সকল ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। তাঁহাদের পূজা না করিলে রোগ শান্তি হয় না। এইরূপে সম্পদ ও মঙ্গল দায়িনী লক্ষ্মী, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজার প্রচার, ও শীতলা মনসা ঘণ্টাকর্ণ জ্বরাসুর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার উৎপত্তি। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অলৌকিক শক্তি বলে, মানুষের দেহে, বৃক্ষে, প্রস্তরে সকলেরই ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা হইতে শালগ্রামে, বানলিঙ্গে, প্রতিমায়, ঘটে, বৃক্ষাদিতে দেবদেবীর আবির্ভাব কল্পিত হয় এবং ইহা হইতেই নদী পর্ব্বত ও প্রস্রবণ প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা জীবিত কালে শত্রুদমনকারী, পরদেশ বিজয়ী তেজস্বী প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন, তাঁহারাই মৃত্যুর পর দেবতা-দিগের অগ্রণী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি দিকপাল রূপে পূজা

পাইতেছেন। আর যিনি বল বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে মহীয়ান, যিনি জ্ঞান ক্ষমা দয়া নীতিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, তিনিই দেবদেব ঈশ্বর বা রাম কৃষ্ণাদি অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। সুতরাং এই মতে দেবদেবী ঈশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই উৎপত্তি প্রেত হইতে। পূজাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রেতের প্রীতি উৎপাদন মাত্র। আর এই প্রেতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে অসভ্যাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হইতে।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে আর এক মত আছে। এ মতে বালক যেমন নিজের কল্পিত এক চৈতন্যময় রাজ্যে খেলা করে, তাহার খেলার পুতুলটীকে ও জীবন্ত দেখে, অসভ্য মানব ও সেইরূপ তাহার চারিদিকের প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহাদের অজ্ঞেয়শক্তির প্রকৃত কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহাদিগকে চেতনশক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করে এবং অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ব্যক্তিবিশেষ বোধ করিয়া পূজা করিতে থাকে। ক্রমে এই সকল প্রাকৃতিক পদার্থের উপাসক দিগের প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে, নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক গুণান্বিত করিয়া নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবপূজার উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসকেরা নিজ নিজ দেবতাই একমাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করিত। নীতি ও জ্ঞানোন্নতির সহিত যে সকল দেবচরিত্র নীতি বিরুদ্ধ বোধ হইল, তাহাদিগের নিম্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সকলের উপর সর্ব্বসদ্‌গুণ সম্পন্ন নীতি পরায়ণ, দয়া ও ক্ষমা-বান্‌ এক দেবদেব প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতএব এ মতে দেবতা

ও ঈশ্বরকল্পনা, ভয় ও বিস্ময় সম্ভূত। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এই সকল কল্পিত প্রাকৃতিক দেবতা অন্তর্হিত হইতেছেন।

য়ুরোপীয় দার্শনিকের মীমাংসা যে, সুসভ্য প্রজ্ঞাবান্ মানবের কর্ত্তব্য, অজ্ঞান ও কল্পনা সঞ্জাত এই সকল ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং জনহিতকর কার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়া। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং নীতি পথ অবলম্বন করিয়া জগতের যাবতীয় কুসংস্কারের উচ্ছেদ ও সুখ শান্তির বৃদ্ধি করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

ভারতের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এই পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়-বাদের মোহে আচ্ছন্ন। ভগবান্ মনুর স্থানে এখন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ অধিষ্ঠিত, মহর্ষি বেদব্যাসের স্থান হার্বার্ট স্পেনসার অধিকার করিয়াছেন। ইদানীং উল্লিখিত পণ্ডিতগণের পদানুসরণ করিয়া, প্রাচীন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ প্রবর্ত্তিত, সর্ব্ববিধ মানবপ্রকৃতির উপযোগী এবং আত্মার সংসার দুঃখের নিবর্ত্তক, ধর্ম্ম ও সমাজ বিধান উৎপাটন পূর্ব্বক, অদূরদর্শী বিচারবুদ্ধি প্রসূত ও ইহলৌকিক সুখাশায়, অভিনব ধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। য়ুরোপীয় দার্শনিক শিক্ষা দিয়াছেন যে, জগৎ ব্যাপার এক অজ্ঞেয় শক্তির কার্য্য। সুতরাং তাহার অনুসন্ধান বৃথা। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোকাদিতে বিশ্বাস ভ্রম ও কুসংস্কার মাত্র। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই মনুষ্যত্ব। কেবল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা এই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে এখন হিন্দু সমাজে ত্যাগের পরিবর্ত্তে

ভোগের, অধ্যাত্মবিদ্যার পরিবর্ত্তে জড়বিজ্ঞানের ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে অর্থকরী শাস্ত্রের আলোচনা! এখন ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তি সংশয়াত্ম যুক্তি বিচারের নিকট পরাজিত! ধর্ম্ম কর্ম্ম কামিনী-কাঞ্চনের মহিমায় দূরে পরিত্যক্ত! সাধন ভজন হীন বিষয়াসক্ত মন যুক্তি বিচার ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইলে, তাহা চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকিবে। কেবল আন্তরিক ব্যাকুলতাও সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্তে, সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" "আনন্দরূপং অমৃতং" প্রকাশিত হন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই উল্লেখ করিতেছেন,—

> "তাঁর বিষয়ে কে বিচার করে বুঝ্‌বে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য কি বুঝ্‌বে? তাঁর কার্য্যাই বা কি বুঝ্‌তে পারবে? তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে, কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। শুধু বিচার কল্লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধন না কল্লে, তপস্যা না কল্লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে'।"
>
> "তাঁকে দর্শন কত্তে হলে সাধন চাই। বিচার করে শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কাছে যেতে হবে। যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ হাটে পৌঁছিলে আর এ্যাক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুনতে পাবে 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে। যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে ততক্ষণ

বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গ্যালে তিনি কি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবে। সমুদ্র দূর হতে হু হু শব্দ কচ্চে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্চে, দেখ্‌তে পাবে।"

"তাঁর বিষয় জান্‌তে গেলে সাধন চাই। সাগরের জল পান কল্লে তবে তাতে লবণ আছে বুঝ্‌তে পারা যায়। কর্ম্ম চাই তবে দর্শন হয়। অ্যাকদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখ্‌লাম। দেখি একজন লোক পানা ঠেলে জল নিচ্চে, আর জল হাতে তুলে অ্যাক অ্যাকবার দেখ্‌ছে—জল স্ফটিকের মত। য্যান জ্যাখালে যে, পানা না ঠেল্লে জল দেখা যায় না। সচ্চিদানন্দ পানাতে ঢাকা। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জানতে জ্যান না। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই তাঁকে দেখ্‌তে পায়। তাঁকে দর্শনের পর, বিচার শাস্ত্র সায়েন্স সব খড় কুটো বোধ হয়।" (ক)

সাধনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে তবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। তখন তাঁহার স্বরূপাদি তত্ত্ব সকল তাঁহার কৃপায় বুঝিবার মানুষ অধিকারী হয়। যুক্তি বিচারের দ্বারা এ সকলের মীমাংসা হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

"তাঁর কাণ্ড মানুষ কি বুঝ্‌বে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ওসব বুঝ্‌তে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সব হতে পারে। তাই ওসব চিন্তা না

করে, কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কি তিথি? হনুমান বলেছিল —আমি তিথি নক্ষত্র জানি না কেবল রাম চিন্তা করি।"

"লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনীকাঞ্চন দেখেই মোহিত হয়। যাঁর পৃথিবী তাঁকে দর্শন কর্ত্তে চায় না। প্রায় সকলেই বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ কেমন ফুল, কেমন পরির মূর্ত্তি ,কমন ঝিল, কেমন বৈঠক-খানা এই সব দেখেই অবাক্! কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে কজন? বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত ক্যান? আগে সে সব জান্‌বার চেষ্টা করা ঠিক নয়। চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই ছায় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দেবে? কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ করো—তা ধাকা খেয়েই হোক্ আর বেড়া ডিংয়েই হোক্। তখন কখানা বাড়ী, কত কোম্পানির কাগজ তিনিই বলে দেবেন। বাবুকে দেখ্‌তে হলে গাছের কি পরির কাছে দেখ্‌লে চল্‌বে না। তিনি যেখানে থাকেন, সেইখানে গেলে ছাখা পাবে। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজ্‌লে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়,—যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্চি! সত্য বল্‌ছি! এ কথা কাকেই বা বল্‌ছি, কেবা বিশ্বাস করে! (ক)

ভীষণ নিরাশা ও দারুণ অশান্তির হেতু এই নাস্তিকতা এবং অশেষ দুঃখের নিদান ভোগসুখলালসার গতিরোধ করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের লোক বিস্ময়কর সাধনা। তাঁহার সাধনলব্ধ উপলব্ধি প্রতিপন্ন করিতেছে যে, অসভ্য মানব স্বপ্ন দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া কোন ধর্ম্ম সৃষ্টি করে নাই। সমস্ত ধর্ম্মই ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত। কোনটাই মিথ্যা নহে। কি অসভ্যাবস্থায় পূজ্য ভূত প্রেত নদী পর্ব্বত; কি বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সর্ব্বকামার্থ প্রদায়ক, সর্ব্ব বিপদনাশক দেব দেবী, কি বেদান্তের নিগু‘ণ ব্রহ্ম, সকলই সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ। বাল্যকালে স্বীয় দেবগৃহে পূজা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহার আবির্ভাব দর্শন করিতেন, বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে যাত্রাকালীন ভাবসমাধি মগ্ন হইয়া তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যকালের প্রত্যক্ষ দর্শন। সাধনাদ্বারা যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন এই মহাসত্য তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণান্তকর কঠোর সাধনা জগতের সম্মুখে প্রমাণীত করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সাধন সম্ভূত অটল, অসন্দিগ্ধ ওজস্বী উক্তি,—

> “ঈশ্বরকে অবশ্য দর্শন করা যায়! ঈশ্বরকে দ্যাখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি! এই হাতের পাখা যেমন দেখ্ছি—সাম্‌নে প্রত্যক্ষ, ঠিক এম্‌নি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি! জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ—শুধু দর্শন নয়—পিতৃভ বাৎসল্য ভাবে, মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ!”

পাশ্চাত্য নীতিবাদীগণের আর একটী মত,—জীবনের কর্ম্ম

জগতের মঙ্গল করা। পরদুঃখকাতর মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জগতের উপকারই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। কোন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"তুমি যে সব কর্ম্ম কচ্ছো, এ সব সৎকর্ম্ম। যদি "আমি কর্ত্তা" এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তে পারো, তা হলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে ঈশ্বর লাভ হয়।"

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আস্‌বে, ততই তোমার কর্ম্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় শাশুড়ী তার কর্ম্ম কমিয়ে দ্যায়। যতই মাস বাড়ে শাশুড়ী কর্ম্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম্ম কর্ত্তে দ্যায় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।"

"তুমি যে সব কর্ম্ম কচ্চো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কর্ত্তে পাল্লে চিত্তশুদ্ধ হবে, আর ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আস্‌বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ কর্ত্তে পার্‌বে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই কচ্চেন,—যিনি চন্দ্রসূর্য্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ দিয়েছেন, যিনি মহতের ভিতর দয়া দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম কর্ব্বে সে নিজেরই মঙ্গল কর্ব্বে।"

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে যদি একবার সন্ধান পাও, তাহলে অন্য কাজ কমে যাবে।" (ক)

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মভক্ত গণকে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা বলো, জগতের উপকার করা। জগৎ কি এত টুকু! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার কর্ব্বে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো, তাঁকে লাভ করো, তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত কর্ত্তে পারো—নচেৎ নয়।"

বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও এইরূপ নীতি-মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন,—

"যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব আসে সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগে না। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম কর্ত্তে চেষ্টা কল্লে শেষে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। রজো মিশান সত্ত্বগুণ থাকলে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার কর্ব্বো, এই অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে কর্ত্তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরোপকার জন্য কামনাশূন্য হয়ে কর্ম্ম করে তাতে দোষ নাই, একে নিষ্কামকর্ম্ম বলে। এরূপ কর্ম্ম কর্ত্তে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না, বড় কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম্মতো আদিকাণ্ড। কর্ম্ম

জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কামকর্ম্ম একটী উপায়—উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে আরও এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য! তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়! আগে তিনি, তার পর দয়া পরোপকার জগতের উপকার জীব উদ্ধার!"

উল্লিখিত কর্ম্মবাদীগণ মনে করেন যে, সকল কার্য্যই তাঁহাদের স্বাধীনইচ্ছা হইতে প্রসূত হয়। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কল্প করেন, কার্য্য ও তদনুরূপ হইয়া থাকে; এবং সেই কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের নিজস্ব। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এই স্বাধীনইচ্ছা সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্ম কর্ত্তে গেলে একটী বিশ্বাস চাই; সেই সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটী মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক ঘড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়, তার পর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং করে শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কাণা দ্যাখা যায়, তখন আনন্দ আরও বাড়ে। আমি ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের কচ্ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ!" (ক)

আনন্দের আকর্ষণ ও বিষয়সুখের প্রলোভন শাস্ত্রে যাহাকে

'রাগদ্বেষ' বলেছে, এবং "আমি কর্ত্তা" এই ভ্রান্তজ্ঞান মানুষকে কার্য্য করিতে বাধ্য করে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি মানুষ বিষয়সুখের লোভে ও রাগদ্বেষের বশে কার্য্য করে, যদি তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে শাস্ত্র সাধন ভজনের উপদেশ কেন দেন, আর পুরুষকারেরই বা সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, শাস্ত্রের উপদেশ "রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া কার্য্য না করা।" বিষয়সুখের লোভে কার্য্য না করিয়া, ক্রীতদাসের ন্যায় কার্য্য না করিয়া, কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করা, প্রভুর ন্যায় কার্য্য করা। এরূপ কার্য্যই প্রকৃত পুরুষকার, কারণ নিষ্কামকর্ম্মের কার্য্যশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি, সুতরাং অমোঘ। এইরূপ নিষ্কামকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হয়, আর চিত্তশুদ্ধ হইলেই ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

> "সকলই ঈশ্বরাধীন। যতক্ষণ তাঁকে লাভ না হয়, মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম, এ স্বাধীন ইচ্ছা বোধ, যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর তিনিই রেখে দ্যান। যদি না রেখে দিতেন, তাহলে পাপের বৃদ্ধি হতো। নিজের দোষে পাপ কচ্চি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে পাপের আরও বৃদ্ধি হতো—পাপকে ভয় হতো না, পাপের শাস্তি হতো না। যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে —দেখতেই স্বাধীনইচ্ছা, বস্তুতঃ তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ী, যেমন করান তেম্‌নি করি।"
>
> "ঈশ্বর সব কচ্চেন, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবন্মুক্ত—"তোমার কর্ম্ম তুমি

করো লোকে বলে করি আমি।" কি রকম জ্ঞান? বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছে। আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছে, খানিক পরে, আলু বেগুন চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কচ্চে—আমি নড়ছি আমি লাফাচ্ছি ছোট ছেলেরা দেখ্‌লে ভাবে, আলু পটল বেগুন ওরা বুঝি জীবন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দ্যায় যে, এই সব আলু বেগুন পটল এরা জীবন্ত নয়,—নিজে নিজে লাফাচ্চে না, হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বল্‌ছে তাই ওরা লাফাচ্চে। যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তাহলে আর নড়ে না। জীবের 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান, অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান্, জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। পুতুল নাচের পুতুল বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়েচড়ে না।"

"তিনিই সব করাচ্চেন বটে, তিনিই কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্চে, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্ম্মফল আছেই আছে। যার যা কর্ম্ম তার ফল সে পাবে। লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা কর্ব্বে—তিনিই বলে দিয়েছেন যে, পেট জ্বালা কর্ব্বে। পাপ কল্লেই তার ফলটী পেতে হবে। যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, যার ঠিক বিশ্বাস ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর আমি অকর্ত্তা, সে কিন্তু পাপ কর্ত্তে পারে না। যে লোক নাচতে শিখেছে সেই সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না।"

"যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্ত্তা' এই ভুল থাক্‌বে, ততক্ষণ আমি সৎ কাজ কচ্চি, আমি অসৎ কাজ কচ্চি, এই সব ভেদবোধ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এ ভেদবোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যা মায়া আশ্রয় কল্লে, সৎপথ ধল্লে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে।" (ক)

অথণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন করিবার পর মানুষের কার্য্য করিবার যথার্থ স্বাধীনতা হয়। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো।"

ভগবান লাভ করিতে হইলে, কিরূপে সাধন করিতে হয়, কত মতে, কত পথে তাঁহার নিকট পৌছান যাইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাণ্ডে সে সমস্ত লিখিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় কি? কিরূপে অনন্ত সংসার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া মানুষ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইতে পারে,—তৎসম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখ কথিত উক্তি, "কথামৃত" হইতে সংক্ষেপে এই স্থানে সংগৃহীত হইল।

ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন হয় না।

প্রশ্ন,—কি কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এই কর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর

নির্ভর। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। তিনি জ্ঞান সূর্য্য, তাঁর একটী কিরণে এইজগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পাচ্চি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন কচ্চি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুখের উপর ধরেন তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়। তার মুখ কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখ্‌তে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখ্‌তে পায়। যদি কেউ সার্জ্জন সাহেবকে দেখ্‌তে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়, বল্‌তে হয়—সাহেব, কৃপা করে অ্যাকবার আলোটা নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে অ্যাকবার দেখি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়—ঠাকুর! কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর অ্যাকবার ধরো—আমি তোমায় দর্শন করি।” (ক)

সংশয় বুদ্ধি প্রশ্ন করে,—তাঁর কৃপা করবার কি শক্তি আছে? তিনি কি আইন ছাড়াতে পারেন?

তাঁহার উত্তর,—“সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন, যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদ্‌লাতে পারেন।”

“তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হলে, খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে, সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্চে দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দ্যাখা দ্যায়।”

ভোগবাসনা নিবৃত্তি না হলে, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

"কিন্তু যতক্ষণ ভোগবাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জান্‌তে বা দর্শন কর্ত্তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনীকাঞ্চনের ভোগ যতটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত থাকে তখন মাকে চায় না, খেলা নিয়ে ভুলে থাকে; সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে; যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে মা যাবো; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, বা কোন কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে; যে কোলে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে। সংসারের ভোগ হয়ে গেলে, ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি কোরে তাঁকে পাবো কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শোনে।" (ক)

প্রশ্ন,—কামিনীকাঞ্চনের ভোগবাসনার নিবৃত্তি কি করে হয়?

ভোগবাসনার নিবৃত্তির উপায় বিবেক বৈরাগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ,—"ঈশ্বরের কৃপায় যদি বিবেক বৈরাগ্য হয়, তা হলে এই কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না। বিবেক অর্থাৎ সৎ অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু ঈশ্বর, আর

সমস্ত অসৎ বা অনিত্য, দুদিনের জন্য। বাজীকরই সত্য, ভেল্কি মিথ্যা—এইটী বিচার। ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য—এইটী ধারণার নাম বিবেক। বিবেক' না হলে, উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জান্‌বার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভাল বাস্‌লে—যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা, এই সব ভাল বাস্‌লে, ঈশ্বর যিনি সৎস্বরূপ তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজ্‌তে ইচ্ছা হয়।"

বৈরাগ্য।

"বৈরাগ্য, অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। বৈরাগ্য তিনপ্রকার—তীব্র বৈরাগ্য, মন্দা বৈরাগ্য, আর মর্কট বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে?—হচ্চে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্—এসব মন্দা বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু চায় না। তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য সে সংসারকে পাতকুয়া দ্যাখে, মনে হয় বুঝি ডুবে গেলাম। আত্মীয়দের কাল সাপ দ্যাখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়, আর পালায় ও। সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক হয়, তা হলে বাড়ী ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। টাকা জমাই, বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা কর্ব্বো, একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্। যা ঈশ্বরের

পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। পরে হবে বলে ফেলে রাখে না।”

“অ্যাকদেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষারা সব থানা কেটে দূরে থেকে জল আন্‌ছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে। সে একদিন প্রতিজ্ঞা কল্লে, যতক্ষণ না জল আসে, থানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ থানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিলে। মেয়ে বল্লে, —বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফ্যাল। সে বল্লে—তুই যা, আমার এখন কাজ আছে। বেলা তুই প্রহর, একটা হলো, তখনও চাষা মাঠে কাজ কচ্চে। স্নান করবার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বল্লে—এখনও নাও নাই? ভাত জুড়িয়ে গ্যাল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল কাটবে, কি খেয়ে দেয়েই কর্ব্বে। গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাকে তাড়া কল্লে, আর বল্লে,—তোর আক্কেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই, চাষ বাস কিছুই হলো না। এবার ছেলে-পুলে কি খাবে?—না খেয়ে মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা-করেছি, মাঠে আজ জল আন্‌বো তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো। স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গ্যালো। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় থানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন অ্যাক ধারে বসে দেখ্‌তে লাগ্‌লো যে, নদীর জল মাঠে কুল কুল করে

আস্‌ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে,—নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লো। এই রোক্ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।"

"আর একজন চাষা, সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গ্যাল আর বল্লে—অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। তখন সে বেশী উচ্চ-বাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বল্লে,—তুই যখন বল্‌ছিস্ তো চল্। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলে না। এই মন্দা বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক না হলে চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না। আর এক রকম বৈরাগ্য আছে তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গ্যাল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল—তোমরা ভাবিবে না. আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে!"

"ত্যাগ দরকার,-ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে? একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষটাকে সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?"

ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার নানা পথ।

"ঈশ্বর লাভের অনন্ত পথ। যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। মোটামুটি যোগ তিন প্রকার— জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ আর ভক্তিযোগ।"

জ্ঞানযোগ।

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি-নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়— আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানযোগ এযুগে ভারি কঠিন। জীবের অ্যাকে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে অ্যাকেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক সুখ দুঃখ এ সকলের পার। এসব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার করো না ক্যান, আবার কোনখান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দ্যাখা দ্যায়। দেহাভিমান যায় না। যদি রোগ শোক সুখ দুঃখ এসব বোধ থাকে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর্ কোরে রক্ত পড়্ছে, খুব লাগ্ছে অথচ বল্‌ছে— কই, হাততো কাটে নাই? আমার কি হয়েছে? এসব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবে তো? 'আমিই সেই' 'আমিই সেই'

এসব অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজে নিজেকে ঠকায়; নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না। কলিতে জ্ঞানযোগ কঠিন।

কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগ—কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্মকরা। অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা কিনা কর্ম্মের ফল আকাজ্ক্ষা কোরো না। যেমন পূজা জপ তপ কচ্চো কিন্তু লোক মান্য হবার জন্য কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়। এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি কর্ম্মযোগ। সংসারী যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ কোরে তাঁকে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম্মকরে সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে—পূজা জপাদি কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। কর্ম্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বগুণ—ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দয়া, এই সব না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে ছায়, আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম্ম অ্যাকেবারে ত্যাগ কর্‌বার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে—তা তুমি ইচ্ছা কর

আর নাই কর। আমি চিন্তা কচ্চি, আমি ধ্যান কচ্চি এও কর্ম্ম; তাঁর নামগুণকীর্ত্তন এও কর্ম্ম; সোহং বাদীদের "আমি সেই" এ চিন্তাও কর্ম্ম; নিশ্বাস ফেলা এও কর্ম্ম। কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম কর।"

"কিন্তু কর্ম্মযোগও বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে তাঁর সময় কই? বেদমতে ঠিক ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ যজ্ঞ মন্ত্র তন্ত্র সব বিধি অনুসারে কর্ত্তে হবে। কলিকালে বেদোক্ত কর্ম্ম করবার সময় কই? তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি। আজ কাল কার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই মালোয়ারী জ্বরে ডি গুপ্ত।"

"তারপর অনাসক্ত হয়ে ফল কামনা না করে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। অ্যাকে কলিযুগে সহজেই আসক্তি এসে যায়। সংসারী লোক মনে করে অনাসক্ত হয়ে কাজ কচ্চি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। কোন্ দিক্ দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে ছ্যায় না। হয় ত পূজা মহোৎসব কল্লাম, কি অনেক গরিব কাঙ্গালদের সেবা কল্লাম— মনে কল্লাম যে অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে জান্‌তে ছ্যায় না। তবে অ্যাকেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।"

ভক্তিযোগ।

"ভক্তিযোগ—এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়ে ও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা, এই সব কোরে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে,—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধোরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ কর্ব্বেন। ভক্তবৎসল মনে কল্লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে তুমি মা, এই অভিমান রাখ্‌তে চায়। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়—তাঁর যদি খুসি হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন,—ভক্তিও দ্যান জ্ঞানও দ্যান। সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বল্‌বেন, আমিও যা তুইও তা, তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে,—রাজা তুমিও যা, আমিও তা, লোকে পাগল বল্‌বে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন,—ওরে তুই আমার কাছে

বোস্, ওতে দোষ নাই—তুইও যা আমিও তা, তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কি জল হয়?”

“হাজরা * বলে,—ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না। আমি বল্‌লাম,—সে কি! ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস, যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজ্‌তো—এরা সব শূদ্র,—এদের ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয়েছে! পুরাণ মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয় তার মুক্তি হবে। এমতে নাম কল্লেই হলো। যাগযজ্ঞ তন্ত্র মন্ত্র—এ সব দরকার নাই।”

“সংসারী লোকের এই ভক্তি লাভ কর্ত্তে গেলে, কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্‌লে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ; তাঁর উপর বালকের মত বিশ্বাস; আর নির্জ্জনে তাঁকে চিন্তা কর্ত্তে হয়। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। সংসারে থাক্‌বে অনাসক্ত হয়ে, আর যে কর্ম্ম কর্ব্বে নিষ্কাম হয়ে কর্ব্বে।”

সাধুসঙ্গ।

“সংসারী লোকের সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সৎসঙ্গ,—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু তাঁদের কাছে একটু কষ্ট করে মাঝে

---

* প্রতাপচন্দ্র হাজরা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সাধন ভজন করিতেন।

মাঝে যেতে হয়। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ কর্ত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌ কেনা কর্ত্তে হবে। পথ্যের দরকার। বাড়ীতে কেবল বিষয়ের কথা—রোগ্‌ লেগেই আছে, কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে সর্ব্বদা থাকৃতে হয়। পাখী দাঁড়ে বোসে তবে রাম রাম বলে, উড়ে গেলে আবার কঁ্যা কঁ্যা কর্ব্বে। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার—সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দ্যান!

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে—কামিনীকাঞ্চনে মত্ত হয়ে আছে। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁস হয়। সাধুসঙ্গ চালুনির জল, কামিনীকাঞ্চনের নেশা কাটায়।"

বিশ্বাস।

"ঈশ্বরকে জান্‌তে গেলে কথায় (শাস্ত্র ও গুরু বাক্যে) বিশ্বাস কর্ত্তে হবে। বিশ্বাসেই তাঁকে বুঝ্‌তে পারা যায়। জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া কর্ত্তে কর্ত্তে বলে—আমার ঈশ্বর আছেন! অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না!"

'বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসে সব হতে পারে। যার ঠিক বিশ্বাস তার সব তাতেই বিশ্বাস হয়—সাকার নিরাকার, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। বিশ্বাস চাই—বালকের

মত বিশ্বাস! বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন,—ও তোর দাদা হয়, তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। মা, বলেছেন, জুজু আছে, তো বালকের অমনি ষোল আনা বিশ্বাস যে ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের মত বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

"বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখ্‌বার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা! এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তার পর সূর্য্য উঠ্‌বেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেতো। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলাতে মা বল্লেন—তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাক্‌বি। ছেলেটী জিজ্ঞাসা কল্লে—মধুসূদন কে? মা বল্লেন,—মধুসূদন তোমার দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অম্‌নি ডেকেছে—দাদা মধুসূদন! কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো,—কোথায় দাদা মধুসূদন! তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে! ঠাকুর তখন থাক্‌তে পাল্লেন না—এসে বল্লেন এই যে আমি, তোর ভয় কি? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন, আর বল্লেন,—তুই যখন ডাক্‌বি, আমি আস্‌বো—ভয় কি? এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা!"

"বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই। বিশ্বাসের কত জোর তাতো শুনেছ? পুরাণে আছে—রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে, লাফ দিয়ে সাগর পারে গিয়ে পড়লো! তার সেতুর দরকার নাই! —আমি রামের দাস, আমি রাম নাম করেছি আমি কি না পারি! এই বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, যে যদি মহাপাতক করে—গো ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা করে, তবু ও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আমি আর এমন কাজ কর্ব্বো না—তার কিছুতেই ভয় হয় না। বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

নির্জ্জনে সাধন।

"আর দিন কতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন কোরে? রোগটী হচ্ছে বিকার। আর যে ঘরে রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। আচার তেঁতুল মনে কল্লেই, মুখে জল সরে, কাছে আন্‌তে হয় না, এরূপ জিনিষ ও ঘরে রয়েছে—জোষিৎ সঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার। ভোগ বাসনা জলের জালা—বিষয় তৃষ্ণার শেষ নাই! এই বিষয় রোগীর ঘরে! এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাঁই নাড়া হয়ে থাক্‌তে

হয়—যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাক্‌লে, আর কামিনীকাঞ্চনে কিছু কর্ত্তে পার্‌বে না। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে।

১। নির্জ্জনে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়।

"সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাক্‌লে ঈশ্বরেতে মন হয় না। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পাচ্চে না, ছেলেকে পড়াতে পাচ্চে না, বাড়ী ভাঙ্গা, ছাদ দিয়ে জল পড়্‌ছে, মেরামত করবার টাকা নাই! তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেতে মন রাখা বড়ই কঠিন হয়। সংসারের ভিতর বিষয় কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমাবস্থায় মন স্থির কর্ত্তে অনেক ব্যাঘাত হয়। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিয়ে রাখে, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার হয় না, হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু কর্ত্তে পারবে না। যদি

নির্জ্জনেতে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্চন তোমায় কিছু কত্তে পারবে না।"

"সংসারে থেকে ও এক এক বার নির্জ্জনে বাস কর্ত্তে হয়। অ্যাকলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জন্য এক বছর হোক্, ছমাস হোক্, একমাস হোক্, তিনদিন ও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি অবসর পেয়ে একদিন ও নির্জ্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায় সেও ভাল। বাড়ীর কাছে অ্যামন একটী আড্ডা কর্ত্তে হয়, যেখানে থেকে বাড়ী এসে অমনি একবার ভাত খেয়ে যেতে পারো। যখন নির্জ্জনে সাধন কর্ব্বে সংসার থেকে অ্যাকেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ না কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাবৃবে,—আমার কেউ নাই, যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য। ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা কর্ব্বে। কামিনীকাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও! তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো—ত্রাহি দাও বোলে!

প্রশ্ন—বিশ্বাস ভক্তির জন্য প্রার্থনা কল্লে তিনি কি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক-শো-বার! যদি ঠিক হয় যদি আন্তরিক হয়! বিষয়ী লোক ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে, সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কাঁদে কই? মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাকো, তাঁর দর্শন হলে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্‌লে এক্ষণই হয়! মার কাছে জোর করো। তোমার যে আপনার মা!—একি পাতান মা! একি ধর্ম্ম মা!—এতে জোর চল্‌বে না তো কিসে জোর চলবে? বল—"মা! আমি কি আটাসে ছেলে? আমি ভয় করিনি চোক্ রাঙ্গালে!" আপনার মা জোর করো। যার যাতে সত্বা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্বা আমার ভিতর আছে বলে তাইত মার দিকে অত টান হয়!"

"তিনি আপনার মা! ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার করো। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়। মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প কচ্চে। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায়না, বলে—না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দেবো, এক্ষণি ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড কর্‌বি! যখন ছেলে কাঁদ্‌তে সুরু করে, কোন মতে ছাড়েনা, মা অন্য মেয়েদের বলে,—রোস মা! এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি। বলে, চাবিটা নিয়ে ক্‌ড়াৎ করে বাক্স খুলে, একটা পয়সা ফেলে দ্যায়। তোমরা ও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দেবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌লে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোক এক ঘটী কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে ত্যায়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? ডাকার মত ডাক্‌তে হয়। "ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে!" তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁর ত্যাথা দিতেই হবে।"

২। সর্ব্বদা তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন কর্ত্তে হয়।

"সর্ব্বদাই তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন দরকার। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে লজ্জা ভয় ত্যাগ কর্ত্তে হয়। যারা হরি নামে মত্ত হয়ে নৃত্য গীত কর্ত্তে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। "আমি এত বড়লোক, আমি হরি হরি বোলে নাচ্‌বো? লোকে একথা শুন্‌লে কি বল্‌বে!" এসব ত্যাগ কর্ত্তে হবে। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাক্‌তে নয়। তাঁর নাম কল্লে, সব পাপ কেটে যায়। কাম ক্রোধ শরীরের সুখ ইচ্ছা এসব পালিয়ে যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে হয়—দুর্গা নাম কৃষ্ণ নাম শিব নাম যে নামে বলে ঈশ্বরকে ডাকোনা ক্যান—যদি নাম কর্ত্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই; তাঁর কৃপা হবেই হবে। তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি—অবিদ্যা নাশ

করে। বীজ এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। জান্তে অজান্তে, ভ্রান্তে অভ্রান্তে, ব্যাকুল হয়ে যে তাঁর নাম কর্ব্বে সে তার ফল পাবেই পাবে! নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই—আমি তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর কি রাম, কি হরি বলেছি আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। ভগবানের নাম কল্লে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে।

"তোমরা যে সংসার কচ্চো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখ্‌তে হবে। তা না হলে হবে না। অ্যাক হাতে কর্ম্ম করো, আর অ্যাক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধর্‌বে। মন নিয়েই সব। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গই হবে। দ্যাখনা যদি একটু ইংরাজী পড়ো তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। আবার পায়ে বুটজুতা শিস্ দিয়ে গান করা, এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, তা হলে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম্ কথা বার্ত্তা চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তসঙ্গে রাখো তাহলে ঈশ্বর চিন্তা হরি কথা এই

সব হবে। মনটী পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে অ্যাকজায়গায় কর্ত্তে হবে। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাক্‌তে হয়। যে মন ভগবান্‌কে দিতে হবে সেই মনের বার আনা মেয়ে মানুষে নিয়ে ফ্যালে। তার পর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবান্‌কে আর কি দেবে ?

"সংসারীলোক মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্ব্বে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বল্‌তে পারো না—সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না। সংসার অ্যাকবারে ত্যাগ করবার কি দরকার ? সংসারে থেকেই হতে পারে। আসক্তি গেলেই হলো। তবে সাধন চাই। যেকালে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে, কেল্লা থেকে যুদ্ধই ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, কাম ক্রোধ, নানা বাসনা, খিদে তৃষ্ণা, আসক্তি এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। যতদূর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে। নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা কোরে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে।"

"তাঁকে যতই চিন্তা কর্ব্বে, ততই সংসারের ভোগের জিনিষে আসক্তি কম্‌বে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসনা কম পড়ে আস্‌বে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কম্‌বে, ততই কাম ক্রোধ লোভ কম

হবে ; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে ; নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আস্‌বে, সংসারে অ্যাকেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।"

"সব কাজ কর্ব্বে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রী পুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাক্‌বে ও সেবা কর্ব্বে—যেন কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জান্‌বে যে তারা তোমার কেউ নয়। সংসার কর্ত্তে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মত থাকো। দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে—আমাদের বাড়ী। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন্ পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে আর বলে,—হরি আমার বড় দুষ্ট হয়েছে, আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না। আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়—মনিবের ছেলে।"

"সংসার করনা ক্যান, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে করো। জানো যে বাড়ী ঘর পরিবার আমার নয়—এ সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্ব্বে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার কর্ত্তে যাও—তাহলে আরও জড়িয়ে পড়্‌বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা কর্ব্বে ততই আসক্তি বাড়বে।"

কর্ম্মত্যাগ কর্ব্বে না কিন্তু নিষ্কাম হয়ে কর্ব্বে।

"যতদিন না ঈশ্বর লাভ হয় কর্ম্মত্যাগ কর্ব্বে না। কর্ম্ম না কল্লে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, নিত্যকর্ম্ম, ধ্যান জপ এ সব কর্ত্তে হবে। সংসারের কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম তাও কর্ব্বে— সংসার যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্ব্বে, যাতে ঐ কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা যায়। সম্মুখে যেটা পড়্‌লো—না কল্লে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে কর্ত্তে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম্ম।"

"ভক্ত বলে—মা! সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয়,—যে কর্ম্মে কামনা আছে, সে কর্ম্ম কল্লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্ত্তে গেলে তোমায় ভুলে যাবো—তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্ত্তে পারি ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়, যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। যেটুকু কর্ম্ম থাক্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হয়ে কত্তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্ব্বে তখন তোমার কর্ম্ম কর্‌বো — নচেৎ নয়।"

"সংসারে কর্ম্ম যত দিন ভোগ আছে করো, কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন কল্লে কর্ম্মক্ষয় হবে। কর্ম্ম চিরকাল কর্ত্তে হয় না। তাঁতে যত শুদ্ধা

ভক্তি ভালবাসা হবে, ততই কর্ম্ম কম্‌বে। তাঁকে লাভ কল্লে কর্ম্ম ত্যাগ হয়।"

আম্‌মোক্তারী বা বকল্‌মা।

"সাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু দুরকম সাধক আছে। এক রকম সাধকের বানরের ছাঁব স্বভাব। আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছাঁর স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ কর্ত্তে হবে, এত ধ্যান কর্ত্তে হবে তবে ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা কোরে ভগবান্‌কে ধর্‌তে যায়।"

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধর্‌তে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে মা যা করে। মা কখন ও বিছানার উপর রেখে দিচ্ছে, কখন ও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে—সে নিজে মাকে ধর্‌তে জানে না। সেইরূপ কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন কর্ত্তে পারে না—এত জপ কর্ব্বো এত ধ্যান কর্ব্বো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকৃতে পারেন না, এসে দেখা দ্যান।"

"কি আর কর্ব্বে? তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি

তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যে কাজ কর্ত্তে দিয়েছেন তাই করো। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। সংসারে রেখেছেন তা কি কর্ব্বে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্ম সমর্পণ করো—তিনি যা হয় করুন। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখ্‌বে তিনিই সব কচ্চেন। সবই রামের ইচ্ছা। সংসার করা সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো। তা না হলে আর কিই বা করবে!"

"গীতায় তিনি বলেছেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত কর্ব্বো" তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন—তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এবুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বল্‌ছি, তাঁর শরণাগত হও, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়—মানুষের কি শক্তি আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণের আশাবাণী—

"সকলে তাঁকে জান্‌তে পারবে। সকলেই উদ্ধার হবে। তবে কেউ সকাল সকাল খেতে পায়, কেউ দুপুর বেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কেহই অভুক্ত থাকবে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জান্‌তে পারবে!"

সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ প্রকাশ।

কেশবাদি ভক্ত সমাগমের কিছুদিন পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননী প্রায় একাদশ বর্ষকাল কালীবাড়ীতে বাস করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ ভক্তির তুলনা নাই। কায়মনোবাক্যে জননীর সেবা, তাঁহার সকল সাধনের প্রধান সাধন। জনক ও জননীতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে কিরূপ প্রীতিপূর্ণ সেবা করিতেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, মার ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি প্রাণের প্রবল আকাঙ্খা সত্ত্বেও বৃন্দাবনে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী ঈশ্বরানুরাগ ও মাতৃভক্তির নিকট ক্ষীণ তেজ হইয়াছিল। চন্দ্রমণি দেবী কালীবাড়ীর নহবৎ ঘরে থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া, মা! কেমন আছ? বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। মাকে প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ এবং মার পদরজ মনে করিয়া দ্বারদেশের ধূলি মস্তকে ধারণ করিতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বে স্বহস্তে গঙ্গাজলে মাতার মৃতদেহের পদযুগল ধৌত করিয়া এবং পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া সরোদনে বলিয়াছিলেন—মাগো! যে দেহ হতে এই দেহের উৎপত্তি আজ তার এই অবস্থা দেখ্‌লাম! জননীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বর কামারপুকুরে দেহত্যাগ

করেন। রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল, এ সময় কালীবাড়ীতে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালকে দিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃত দেহ সৎকার এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

জননীর মৃত্যুর পর তিনি জন্মভূমি কামারপুকুরে আর গিয়াছিলেন কি না, তাহা স্থির বলা যায় না। কিন্তু লৌকিক কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে দুই তিন বার স্বদেশাভিমুখে যাইতে হইয়াছিল। একবার রঘুবীরের নামের জমি রেজিষ্ট্রি করিবার নিমিত্ত তিনি বিষ্ণুপুরে গিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এ সময় তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার কথা,—

"আবির্ভাব মান্‌তে হয়। আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছ্‌লাম। রাজার বেশ সব ঠাকুর বাড়ী আছে। সেখানে ভগবতী মূর্ত্তি আছে—নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুর বাড়ীর কাছে বড় দীঘি—কৃষ্ণবাঁধ লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আঁবাটার (মাথাঘষা) গন্ধ পেলাম ক্যান বলদেখি? আমি তো জান্‌তাম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ী দর্শনের সময় আঁবাটা তাঁকে দ্যায়! আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হলো। তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হলো—কোমর পর্য্যন্ত!"

যে সময় হইতে তাঁহার নিকটে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারিতেন কিরূপ ভাবের লোক আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আগে সাকারবাদীরা খুব আস্‌তো, তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা। (নিজের দেহ দেখাইয়া) এর ভিতর

যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে গ্যায়, কিরূপ লোক এখানে আসবে—কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গ রূপ সাম্‌নে এসেছে, অম্‌নি বুঝ্‌তে পারি গৌরাঙ্গ ভক্ত আস্‌ছে। যদি শাক্ত আসে তাহলে শক্তি রূপ—কালীরূপ দর্শন হয়।" (ক)

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মদলের তাঁহার নিকট আগমনের পূর্ব্বে সমাধিতে তাঁহাদিগকে দেখিবার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ১২৮৬ সালে সিওড়ে গমন উপলক্ষে এইরূপ আর একটী ঘটনার কথা তিনি বলিয়াছিলেন।

"ও দেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে (নিকটস্থ গ্রাম নিয়ে গ্যাল। বুঝলাম গৌরাঙ্গ ভক্ত—গাঁয়ে ঢোক্‌বার আগে দেখিয়ে দিলে, দেখ্‌লাম—গৌরাঙ্গ! এম্‌নি আকর্ষণ, সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। গাছে লোক, পাচিলে লোক, রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক, সাত দিন হাগ্‌বার যো ছিল না।" ক)

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাত দিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতির ঘরে সকালে গিয়ে বস্‌তাম। সেখানে আবার দেখি খানিক পরে সব গিয়েছে—সব খোল করতাল নিয়ে গেছে—আবার তাকুটী তাকুটী কচ্চে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটায় সময় হতো।"

"রব উঠে গ্যাল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে এমন

অ্যাক লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দ্দি গরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল—তাকুটী তাকুটী। হৃদে বক্‌লে আর বল্লে—আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই ?"

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া কর্ত্তে এসেছিল। মনে করে ছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখ্‌লে, আমি একখানা কাপড়, কি একগাছা সূতাও লই নাই। কে বলেছিল—ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়্‌তে এসেছিল। অ্যাকজন জিজ্ঞাসা কল্লে—এঁর মালা তিলক নাই ক্যান ? তারাই অ্যাকজন বল্লে,—নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে। নারকেলের বেল্লো—ও কথাটী ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে।"

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাক্‌তো। যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে প্রচ্ছাপ কর্ত্তে রাত্রে বাইরে যাচ্ছিল,—তা বলে ঐখানেই (উঠানে) করো। আকর্ষণ কাকে বলে ঐখানে বুঝ্‌লাম। হরি লীলায় যোগমায়ার আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কি লেগে যায়।"

সিওড় শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর (১২৮৬ সাল) অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল ঈশ্বরান্বেষী ধর্ম্ম পিপাসু ভক্তগণ তাঁহার কাছে আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভগবানের পথে

অগ্রসর হইবার জন্য সাধারণ ভাবে উপদেশ দিয়া, কাহারও সন্দেহ ভঞ্জন, কাহারও জ্ঞানভক্তি উদ্দীপন, কাহারও বা গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে দিতেন। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ভগবান লাভ করিবার জন্য কাহারও তীব্র আকাঙ্খা দেখিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি, আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখ্‌লে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পার্‌বে। আবার দেখি সে আর অ্যাক রকম হয়ে যায়। আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী খুঁজ্‌ছি। মনে করি এ বুঝি থাক্‌বে। কিন্তু সকলেই অ্যাক অ্যাকটা ওজর করে। অ্যাকটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যু হলে ভূত হয়। তাই সেই ভূতটা যাই দ্যাখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ রকম কোরে মরেছে, অম্‌নি দৌড়ে যায়—এই মনে কোরে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হলো। কিন্তু কাছেও যাওয়া আর দেখ্‌তে পাওয়া যে, লোকটা দাঁড়িয়ে ওঠে। সঙ্গী আর জোটে না।

"কি বল্‌বো, সব দেখি কলায়ের ডালের খদ্দের। কামিনীকাঞ্চন ছাড়্‌তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন কল্লে, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়! রাবণকে এক-জন বলেছিল—তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রাম রূপ ধর না ক্যান? রাবণ বল্লে—রাম রূপ হৃদয়ে অ্যাক-বার দেখ্‌লে রম্ভা তিলোত্তমা ওদের চিতার ভস্ম বোধ

বোধ হয়! ব্রহ্মপদ হয়--পরস্ত্রীর সঙ্গ তো দূরে থাক্!"

"সবাই কলাইয়ের ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয় না—অ্যাক লক্ষ্য হয় না, নানা দিকে মন থাকে।" (ক)

সেই জন্য যাহারা শুদ্ধসত্ত্ব সরল বালক, যাহাদের মনে কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি প্রবেশ করে নাই, যাহারা সৎ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এরূপ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভগবানের বিচিত্র লীলা সম্ভোগ ও শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ ভিন্ন, অন্য কথায় ও কার্যো নিযুক্ত থাকিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট অনুভব হইত। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভগবান্ লাভের পর তাঁকে সব তাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আর ও বেশী প্রকাশ--যাদের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবার অ্যাকেবারে ইচ্ছা নাই। সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা হলে সে কিসে মন দাড় করাবে? তাই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার। না হলে, সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে?" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রতি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় অহেতুক ভালবাসা, তাহাদিগকে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সদাক্ষণ সতর্কতা, তাহাদের ইহ পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সতত চিন্তা, তাহারা কি করিয়া জীবনের

মহান্ লক্ষ্যে উপনীত হইবে সে জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুর্লভ। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি সহস্রবার জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করে একটা লোকেরও কল্যাণ হয়, তা হলে মনে কোর্ব্বো সব জন্মটা সার্থক!"

কঠোর তপস্যায় তাঁহার দেহ পীড়াগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। তিনি সামান্য একটু হাঁটিতে গেলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। তিনি মার কাছে জানাইয়াছিলেন,—

"বলেছিলাম—মা! কামিনীকাঞ্চন ত্যাগীর সঙ্গ দাও, আর বলেছিলাম,—তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ কোর্ব্বো, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে ওখানে যেতে পারি,—তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু।" (ক)

কোন ভক্তের নিকট সাশ্রুনয়নে বলিয়াছিলেন,—"নিতাই আমার, হেঁটে হেঁটে লোকের দ্বারে দ্বারে নাম বিলিয়েছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি গাড়ী নইলে যেতে পারি না!"

শ্রীরামকৃষ্ণের লোক সাধারণের প্রতি এই অহেতুক ভাল-বাসার ভিতর, এক মহান্ শিক্ষা সন্নিবিষ্ট আছে। স্বার্থপরতা ধর্ম্মহীনতার মূল। শাস্ত্র সকল আশ্রমার প্রতিই পরার্থপরতা শিক্ষা দিয়াছেন। মনুসংহিতায় বিদ্যার্থীর প্রতি আদেশ,—"একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিবে না। যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কোন ও কর্ম্ম বা চিন্তা করিতে নাই। এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই।"* গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, প্রতিদিন

* মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ১৬১ শ্লোক।

পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা দেবতা ঋষি পিতৃগণ অতিথি দরিদ্র ভিক্ষার্থী এবং ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত সকলকেই অন্নদানে প্রীত করিয়া, অবশিষ্ট অন্ন নিজের দেহরক্ষার্থ গ্রহণ করিবে। কেবল নিজের জন্য অন্নপাক, গৃহস্থের পাপ ভোজন স্বরূপ, সুতরাং তাহা করিতে নাই। গৃহস্থের দানধর্ম্মের কথায় উক্ত হইয়াছে যে, "অসূয়া পরবশ না হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া, যে কোন যাচ্ঞাকারীকে যথা শক্তি দান করিবে।" * সন্ন্যাসাশ্রমীর প্রতি অনুজ্ঞা "নিত্য স্বাধ্যায় পরায়ণ, শীতাতপদ্বন্দ্ব সহনশীল, সকলের উপকারক, সংযত-মনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত ও সর্ব্বভূতে কৃপাবান্ হইবে।" +

পরার্থ জীবন ধারণই শাস্ত্রের উপদেশ। এইরূপ ইহলৌকিক পরার্থপর হইয়াও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের পরার্থপরতার আদর্শ দিন দিন হীন হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

"ঋষিরা ভয় তরাসে! তাদের ভাব কি জান?—আমি যো সো করে মুক্ত হয়ে যাই, আবার কে আসে?" (ক)

সকলেই নিজ নিজ মোক্ষ সাধনের জন্য ব্যস্ত! এখনকার কালের জ্ঞানপথাবলম্বী পরমহংস দিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"এরা আপ্তসারা—আপনার হলেই হলো!" অর্থাৎ সকলেই ধ্যান যোগাদি অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন। গৃহস্থাশ্রমীরা পূজা জপ দানাদি কার্য্য দ্বারা নিজ নিজ পরকালের সম্বল সঞ্চয় করিতেছেন। এরূপ স্বার্থপর ভাব আধ্যাত্মিক অবনতির চিহ্ন। ইহাতে পরস্পরের প্রতি প্রীতি

* মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২২৮ শ্লোক।

\+ মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮ শ্লোক।

ও সহানুভূতির লাঘব হইতেছে, বেদান্তের মহান্ উপদেশ—সর্ব্বভূতে আত্মভাব ও সমদর্শীতা লোপ পাইতেছে। এই স্বার্থপর দৃষ্টির বশে আমাদের এখন অপরের মঙ্গলের দিকে মন যায় না। নিজের মঙ্গল সাধন করিতে যাইয়া আমরা বিস্মৃত হই যে, "আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তিতে ও ভক্তিতে হয়।"* পারলৌকিক অনুদার স্বার্থভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা যে, নিজের পারলৌকিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের কল্যাণের চেষ্টা অবশ্য করণীয়। "এক জনেরও যদি কল্যাণ হয়, তা হলে এ জন্ম ধারণ সার্থক মনে কর্ব্বো"—তাঁহার এই মহাবাক্যই আমাদের পারলৌকিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাশিক্ষার অনুসরণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামি, নিজের মুক্তির ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়। আর যারা 'আমার মুক্তি' 'আমার মুক্তি' করিয়া রাত দিন মাথা ভাবায় তাহারা ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইয়া বেড়ায় তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।† এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—নিজের মুক্তি ও জগতের মঙ্গলার্থ!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মঙ্গলার্থ নিজের স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা সর্ব্ব বিষয়ই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিসে তাহারা

* স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ২য় ভাগ

† পত্রাবলী ৩য় ভাগ।

সংসারে আবদ্ধ না হইয়া ভগবান লাভে সমর্থ হইবে, দিবারাত্র কেবল তাঁহার সেই চিন্তা। ভগবানের কথা তাহাদিগকে বলিবার জন্য তিনি সংবাদ পাঠাইয়া নিকটে আনাইতেন। নিজে ছুটিয়া ছুটিয়া কলিকাতায় যাইতেন, অন্তরালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পালন করিতেছে কি না। কোন বালক ভক্তকে দেখিবার জন্য একদিন এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ভক্তটীকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া প্রত্যাগমন করেন। অপর একটী ভক্ত সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—

> "যদুমল্লিকের বাগানে কাঁদতাম, ওকে দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের * হাত ধরে কান্না! ভোলানাথ বল্লে,—একটা কায়েতের ছেলের জন্য মশয় আপনার এরূপ করা উচিত নয়! মোটা বামুন † একদিন হাত জোড় করে বল্লে,—মশায় ওর সামান্য পড়াশুনা, ওর জন্য আপনি এত অধীর ক্যান হন?" (ক)

তিনি আরও বলিতেন,—

> "ছোকরাদের ভালবাসি ক্যান? ওদের ভিতরে কামিনী-কাঞ্চন বিষয়বুদ্ধি অ্যাথনও ঢুকে নাই, তাই অন্তর অতো শুদ্ধ। আমি ওদের নিত্য সিদ্ধ দেখি। ওদের জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। ছোকরাদের দেখে আমার

* ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালী বাড়ীর মুহুরী ছিলেন।

† একজন বেদান্তবাদী ভক্ত তাঁহার নিকট প্রায় আসিতেন স্থূলকায় বলিয়া তিনি মোটা বামুন বলিতেন।

প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে কোরেছে, মাম্‌লা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে, কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে, তাদের দেখ্‌লে কেমন কোরে আনন্দ হবে? শুদ্ধআত্মা না দেখ্‌লে কেমন কোরে থাকি? রামলালার উপর যা যা ভাব হতো—রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম শোয়া-তাম, সঙ্গে সঙ্গে কোরে বেড়াতাম, রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদ্‌তাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! আমি যে এদের ভালবাসি সে কি কোন নিজের লাভের জন্য? না, তবু চাকরী কোরে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি—সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি— কথায় নয়!"

"ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। ওদের জ্ঞান উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। ছেলেদের ধর্ম্ম সাধনের অবস্থা। আপন কেবল ত্যাগ। আমি ওদের মেয়েদের কাছে বেশী থাক্‌তে বা আনাগোনা কর্ত্তে বারণ কোরে দিই। আমি ওদের বলি,—মেয়ে মানুষ ভক্ত হলে ও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না, দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ কর্ত্তে হয়—নিজের সাবধানের জন্য, আর লোক শিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে, একটু পরে বলি,—তোমরা ঠাকুর দ্যাখোগে। তাতে যদি না ওঠে, নিজে উঠে পড়ি—আমায় দেখে আবার সবাই শিখ্‌বে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আপনার জীবনকে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে, কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিমিত্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি ভাবে স্ত্রীলোকের সহিত আচরণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তি অনুসারে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। কোন ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না—মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্‌বে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে। আর মা ছাড়া, সকলের সঙ্গে সর্ব্বদা অন্ততঃ এক হাত তফাতে থাক্‌বে। সাধনার অবস্থায় কামিনীকাঞ্চন দাবানল স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ দর্শনের পর,—তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটী রূপ বলে দেখ্‌বে!"

তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম যে, সাধনাবস্থায় স্ত্রীলোকের নিকটে সাবধানে থাকিতে হয়। ঈশ্বরের পথের বিঘ্ন বলিয়া তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়। কোন ভক্তের সিদ্ধাবস্থা বলিয়া তিনি কখন কখন বলিতেন। কোন ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকের বাটীতে ভক্তটী মধ্যে মধ্যে গমন করেন শুনিয়া তিনি একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে সাধু সাবধান! কামিনীকাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়ে মানুষের মায়াতে অ্যাকবার ডুব্‌লে আর ওঠ্‌বার যো নাই! বিশলক্ষীর দ! যে অ্যাকবার পড়েছে, সে আর উঠ্‌তে পারে না!"

ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনা করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন,—শ্রদ্ধা,—ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁহার মাহাত্ম্যে

বিশ্বাস, আর তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান এইটী দৃঢ় ধারণা। ভগবান্ আমাদের পিতা মাতা পরম সুহৃদ্, আর আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে সাধন ভজন সব বৃথা হইয়া যায়। সাধকের পক্ষে শ্রদ্ধাহীন হইয়া, আপনাকে দুর্ব্বল অধম পাপী মনে করাকে তিনি ঘোর অবিশ্বাসের ভাব বলিতেন। সাধকের এরূপ দীন হীন মনের ভাব হইলে ভগবানের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়, এবং ভগবান্ লাভ দূরে থাক মন অধোগামী হইতে থাকে। ঈশ্বর পথের পথিকের পক্ষে এরূপ বিশ্বাসহীনতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। তিনি বলিতেন,—

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, কেঁদে কোকিয়ে বলে,—হে কৃষ্ণ! দয়া করো—আমি অধম আমি পাপী! এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! রাত দিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ! যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি অধম' করে সে তাই হয়ে যায়! কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম অ্যাত কচ্চে, আবার বলে পাপ! পাপ!"

"খ্রীষ্টানদের অ্যাকখানা বই অ্যাকজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বল্লাম। তাতে কেবল—পাপ! আর পাপ!"

"আমি মুক্ত এ অভিমান খুব ভাল। আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে আমায়

আবার বাঁধে কে ? আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি ? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই, জোর করে বল্লে, বিষ ছেড়ে যায় ! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই,' 'আমি মুক্ত,' এই কথাটী রোক্ করে বল্‌তে বল্‌তে, তাই হয়ে যায় !—মুক্তই হয়ে যায়। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালাই বদ্ধ হয়ে যায় ! যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায় !"

"ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস হওয়া চাই। কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিছিল। অ্যাকদিন ভ্রমণ কর্ত্তে কর্ত্তে তার জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। অ্যাকটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, অ্যাকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে,—ওরে তুই অ্যাক ঘটী আমায় জল দিতে পারিস্ ? তুই কি জাত ? সে বল্লে—ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত—মুচি। কৃষ্ণ কিশোর বল্লে,—তুই শিব বল,—নে, এখন জল তুলে দে ! ভগবানের নাম করে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায় ! কেবল পাপ আর নরক ক্যান ? অ্যাকবার বলো যে অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি আর কর্ব্বো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস করো।"

বালক ভক্তদিগের মনে এই মহতী শ্রদ্ধার বিকাশ যাহাতে হয়, যাহাতে তাহারা বৃথা দীন হীন ভাব পরিত্যাগ করিয়া জীবনের মহান্ লক্ষ্যের অভিমুখে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে পারে,

উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেইরূপ পথে চালাইতেন। শ্রদ্ধার উদয় হইলে মনের দুর্ব্বলতা কিরূপ অপসৃত হয়, ভীত অবসন্ন মন, স্থিরপ্রযত্ন হইয়া কিরূপ নির্ভীকতা লাভ করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন ভক্তের কথিত একটী সামান্য ঘটনা এস্থানে উল্লিখিত হইতেছে।

কোন যুবক তাঁহার নিকট বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিজ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মাতৃ স্নেহের মোহে পড়িয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকমুখে ডাকিয়া পাঠাইলেও, যুবক সেই অবধি আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া লজ্জায় কালীবাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত পদে সম্মুখে আসিলেন এবং যুবকের হস্ত নিজ মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া বলিলেন —"এখানে আসিস্ না ক্যান? বিবাহ করেছিস্ তাতে হয়েছে কি? তুই সাতটা বিবাহ কর্না—তোর ভয় কি?" ভক্তটী বলিয়াছিলেন,—'তাঁহার ভয় কি—এই তেজ পূর্ণ কথায় আমার সাহস বুক যেন দশহাত হল, লজ্জা ভয় দুর্ব্বলতা মন হতে অ্যাকেবারে দূর হয়ে গ্যাল।' শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অভয়বাণীতে উৎসাহিত হইয়া, ভক্তটী আপনার বালব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ অস্খলিত রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ত্যাগী পুরুষ দুর্লভ। গুরুরূপে ভক্তগণের অন্তরে নিজশক্তির উপর বিশ্বাসের উন্মেষ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

"কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না,

আমি বুঝি বদ্ধ জীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। অ্যাকটা ছাগলের পালে অ্যাকটা বাঘিনী পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘিনী প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গ্যাল। বাঘিনী মরে গ্যাল, ছানাটী ছাগলের সঙ্গে বড় হতে লাগ্‌লো। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা ভ্যা করে, সেও ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো। অ্যাকদিন ঐ ছাগলের পালে, আর অ্যাকটা বাঘ এসে পড়লো। সে ঘাস খেগো বাঘটাকে দেখে অবাক! দৌড়ে এসে তাকে ধল্লে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কর্ত্তে লাগ্‌লো। তাকে টেনে হিচ্‌ড়ে জলের কাছে নিয়ে গ্যাল, আর বল্লে—দ্যাখ্ জলের ভিতর তোর মুখ দ্যাখ্—ঠিক আমার মত দ্যাখ্। আর এই নে খানিকটা মাংস—এইটে খা। এই বোলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগ্‌লো। সে কোন মতে খাবেনা—ভ্যা ভ্যা কচ্ছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ কল্লে। নূতন বাঘটা বল্লে—অ্যাখন বুঝিছিস্ আমিও যা তুই ও তা। অ্যাখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

"তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি। একটু সাধন কল্লেই গুরু বুঝিয়ে দ্যান—এই, এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে—কোন্‌টা সৎ, কোনটা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ সংসার অনিত্য।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, তাঁহাকে গুরুরূপে পাইয়া

শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন,—তিনি কে ও তাঁহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি!

১২৮৬ সালের শেষ সময় হইতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রায় একবৎসর পরে ১২৮৭ সালে, মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণের বিরাগ ভাজন হওয়াতে, হৃদয় মুখোপাধ্যায় কালীবাড়ীর কার্য্য হইতে অপসারিত হন, এবং তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। হৃদয় একাদি ক্রমে প্রায় ২৫ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া ছিলেন। ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও, সানুরাগে তাঁহার দীর্ঘ কাল পরিচর্য্য করিয়া ও, হৃদয় আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"আমার সেবা ও যত করেছে, যন্ত্রণা ও তেম্‌নি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যায়রামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পার্‌তাম না, তখন আমায় বল্লে,—"এই দ্যাখো আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পাওনা।" আবার বল্‌তো,—"বোকা, আমি না থাক্‌লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।" একদিন এরকম কোরে আাত যন্ত্রণা দিলে যে, পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ কর্ত্তে গিয়েছিলাম। শেষা শেষী বড় বাড়িয়ে ছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁক ডাক কর্ত্তো। আচ্ছা, অত সেবা কর্ত্তো, তবে ক্যান ওর এসব হলো? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হয়ে থাক্‌তাম, তার উপর

আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম কোরে আমায় রাখ্‌তো, সেই রকমই আমি থাক্‌তাম। হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল, অনেক সেবা করেছিল,—হাতে করে গু পরিষ্কার কর্ত্তো। আবার তেম্‌নি শেষে শাস্তি ও দিয়েছিল।" (ক)

ইদানীং লোভ পরবশ হইয়া হৃদয় তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"হৃদে অ্যাথনও জমি জমি কচ্চে। যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিল, ওদের (কর্ত্তৃপক্ষদিগকে) বলেছিল—শাল দাও, না হলে নালিশ কোর্কো। মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন এলে কেবল টাকা টাকা কর্ত্তো। সে যদি থাক্‌তো তা হলে এসব লোক ভক্তগণ যেতো না। তাই মা সরিয়ে দিলেন।" (ক)

১২৮৮ সাল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচবৎসর কাল তিনি কিরূপ ভাবে ভক্ত সঙ্গে বিলাস করিয়াছিলেন, শ্রীম, "কথামৃতে" তাহার যথাযথ সজীব চিত্র দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত যাহা লিখিত হইল, তাহাও 'কথামৃত' অবলম্বন করিয়া। 'কথামৃতে' তাঁহার উক্তি যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে লেখকের মনোভাবের ছাপ একটু মাত্র নাই। কোন দেশের কোন ভাষায় কোন জীবন কাহিনী এরূপ অনমুরঞ্জিত রূপে বর্ণিত হয় নাই। "কথামৃতের' ইহাই বিশেষত্ব। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের এই কালের জীবন-চিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে তাঁহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ

চরিত-ব্যাখ্যাতার চক্ষুর সম্মুখে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহাই লিখিত হইতেছে।

বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধু সন্ন্যাসী বা কোন পন্থী বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন। সাধারণ লোকে চিরকাল যাহা সাধুদিগের বাহ্যচিহ্ন মনে করিয়া থাকে, তাঁহাতে কিছুমাত্র দেখা যাইত না। গাত্রে ভস্ম লেপন ও মস্তকে দীর্ঘ জটা ভার ছিল না এবং গাছ-তলায় ধুনী জ্বালাইয়া ও বসিতেন না মালা তিলকাদি ভূষিত হইয়া কোন বৈষ্ণব পন্থার বেশ ধারণ করিতেন না। কিম্বা মুণ্ডিত কেশ, গৈরিক পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডী পরমহংসরূপে ও থাকিতেন না। তিনি শয়নোপবেসনের জন্য শয্যা ব্যবহার করিতেন, লাল পাড় কাপড় পরিতেন, শীতকালে কানে ঢাকা টুপি, গায়ে জামা ও গরম গাত্রবস্ত্রে আবৃত থাকিতেন; পায়ে চটিজুতা এবং কখন কখন (পীড়িতাবস্থায়) মোজা পরিতে ও দেখা গিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সাধু সন্ন্যাসী মনে করিয়া তাঁহার নিকট কে আসিবে? দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইয়া অনেকে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"হাঁগা, এখানে পরমহংস কোথায় থাকেন?" সাধুর কোন রূপ বাহ্যচিহ্ন না দেখিতে পাইয়া কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,— "আপনি কি আমার প্রণম্য?"

মানুষ স্বভাবতঃই বাহ্য চাকচিক্যে আকৃষ্ট। কবীরের উক্তি,— "সাচ্ কহে তো মারে লাট্‌ঠা, ঝুটা জগৎ ভুলায়; গো রস গলি গলি ফিরে, সুরা বইঠ্ বিকায়"—চিরদিনই সত্য হইয়া আসিতেছে। চিরদিনই মানব সাধারণ ঝুটা দেখিয়া ভুলিয়া যায়। যাঁহারা

বাহ্যাবরণে আকৃষ্ট হন, কোন বস্তুর অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ পাগ্‌লা বামুন বলিয়াই পরিচিত। সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ আমরা বুঝিতে পারি না, কারণ প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ চিনিতে পারি না বলিয়া। সিদ্ধাবস্থায় সকল প্রকার বাহ্যচিহ্ন যে আপনা আপনিই লুপ্ত হয় ইহা আমাদিগের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার বাহ্যনিদর্শন, "নারকেলের বোল্লোর" ন্যায় যে আপনি খসিয়া গিয়াছে, সাধারণে কি করিয়া ধারণা করিবে? সাধনা শেষ হইলে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। একথা শুধু রূপক ভাবে নয়, কিন্তু ইহার প্রতিবর্ণ সত্য। গলার পৈতা, কোমড়ের কাপড় আপনিই পড়িয়া যাইত। নিজে গেরো বাঁধিলে, যতক্ষণ না আবার সেই গেরো খোলা হয়, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া থাকিত। টাকা হাতে করিলে হাত বাঁকিয়া যাইত। একটী ফল কি একটী পান সঙ্গে আনিবার যো নাই। যথার্থ ত্যাগী পুরুষ, অন্তরেন্দ্রিয় মন হইতে যাহা নির্ম্মূল করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, হস্তাদি বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাও যে সেই সকল কর্ম্ম করিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম হইয়া থাকেন, ইহার সত্যতা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণে প্রমাণিত হইয়াছে।

সিদ্ধাবস্থায় সিদ্ধপুরুষ, সকল বিধিনিষেধের পার হইয়া যান। এ সত্যটীও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। স্মৃতিশাস্ত্রের খাদ্যাখাদ্যের বিচার, শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার, শুচি অশুচির বিচার সিদ্ধাবস্থার জন্য নহে। যতদিন সাধনাবস্থা ততদিন আচার বিচারের প্রয়োজন। আচার বিচার চিরকাল করিতে হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কোন ভক্তকে একাকী বেড়াইতে দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে কালীঘরে যাইবার জন্য আহ্বান করাতে, ভক্তটী সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি এইমাত্র পাইখানায় গিয়াছিলাম, অশুচি রহিয়াছি।" তিনি হাসিয়া রামপ্রসাদের গানটী তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন,—"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি; যখন তুই সতীনে পিরীত হবে তবে শ্যামা মাকে পাবি।" খাদ্যাখাদ্যের বিচার ধর্ম্ম লাভ ও ভক্তি লাভ করিবার জন্য। কেবল আচার লইয়া থাকিলে, ধর্ম্ম লাভ না হইয়া ক্রমে তাহা 'শুচিবাই' বা এক প্রকার উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে আমাদের এই দশাই ঘটিয়াছে—খাদ্যাখাদ্যের বিচার, ধর্ম্ম লাভের উপায় না হইয়া উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার ফল—ধর্ম্ম লোপ! তিনি এরূপ আচার পালন সম্বন্ধে কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—"বেশী খেওনা, আর 'শুচিবাই' ছেড়ে দাও। যাদের 'শুচিবাই' তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু কোরবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।"

খাদ্যাখাদ্য বিচার সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে, কিরূপ অবস্থা বিশেষে আহার বিষয়ে রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈতবাদ সাধনে সিদ্ধ হইবার পর, তাঁহার জাতি বিচার ও আহারের বিচার একেবারেই ছিল না। স্বদেশে যাইয়া সকল জাতির ঘরে অন্নাদি আহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় আহার সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ ভিন্নভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি আচারী ব্রাহ্মণের প্রস্তুত এবং ঠাকুরের ভোগ দেওয়া ভিন্ন অন্ন গ্রহণ করিতেন না;

এবং ব্রাহ্মণ ভক্তের গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও অন্ন আহার করেন নাই। তিনি কেবল একটী কায়স্থ ভবনে এই নিয়মের অন্যথা করেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন,—"ইহারা পুরুষানুক্রমে পরম বৈষ্ণব বংশ আর গৃহদেবতা ৺ জগন্নাথ দেবকে অন্ন ভোগ দিয়া থাকে—ইহাদের শুদ্ধ অন্ন।" তিনি বলিতেন,—

> "আমার অবস্থা অ্যাখন—মাছের ছোল, মার প্রসাদী হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদী মাংস অ্যাখন পারি না—তবে আঙ্গুলে কোরে একটু চাকি—পাছে মা রাগ করেন।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের এখন ভক্তের অবস্থা, জ্ঞানীর অবস্থা নয়, এই শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন করিতেন। মহাসমাধির কিছু পূর্ব্বে শয্যায় বসিয়া শেষ অন্ন (ভাতের মণ্ড) গ্রহণ করিবার সময় তিনি কোন কোন সেবাকারী শূদ্র ভক্তকে শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিতে ইঙ্গিত করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন,—"এ যে ভাত, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ শরীরের সংস্কার আছে, ততক্ষণ এসব মানতে হয়।" সামাজিক সংস্থানে তিনি ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ মান্যস্থান প্রদান করিতেন। কারণ সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণ বৈদিক সমাজে ধর্ম্ম ও সদাচারের শিক্ষক। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন আগন্তুক গোস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "আপনারা অদ্বৈত গোস্বামীর বংশ?—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশ, আকরের গুণ আছেই। নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়,—খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে

একটু ছোট বড় হয়। ব্রাহ্মণ হাজার দোষ থাকুক, তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়। বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন, তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক।' যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দি কল্লে, যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কল্লেন। যে দুর্য্যোধন অ্যাত শত্রুতা করেছে, যাদের জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে, তাকেই গিয়ে মুক্ত কল্লেন। বল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক। তা ছাড়া ভেকের আদর কর্ত্তে হয়। শঙ্খচিল দেখে প্রণাম করে ক্যান? কংশ মার্ত্তে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিছলেন। তা এখন ও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।" (ক)

তাঁহার সকল কার্য্যই লোক শিক্ষার্থ। ভক্তগণের যথেচ্ছাচার নিবারণের জন্যই এইরূপে শাস্ত্রীয় বর্ণাচার নিয়ম পালন করিয়া তিনি তাহাদিগকে আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"আমার দেখে তবে সবাই শিখবে। আমি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি।"

যতদিন মানুষের মধ্যে, বিদ্যা ধন মান আভিজাত্য প্রভৃতির অভিমান ও সেই জন্য পরস্পর ভেদ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত ও অসত্য সাম্যের ভ্রমে পড়িয়া সর্ব্ব জাতির ও সর্ব্ব বর্ণের সমতা প্রচার বৃথা। জগতে কোথাও সাম্য নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণই নানা বোধ। পূর্ণ জ্ঞান হলে

তবে অ্যাক চৈতন্য বোধ হয়। আবার পূর্ণ জ্ঞানে দ্যাখে যে, সেই অ্যাক চৈতন্য, এই জীব জগৎ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তবে শক্তি বিশেষ। তিনি সবই হয়েছেন বটে, কিন্তু কোন খানে বেশী শক্তির প্রকাশ কোন খানে কম শক্তির প্রকাশ। মানুষের মধ্যে ভাল আছে মন্দ ও আছে, সাধু আছে অসাধু ও আছে, সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত ও আছে। বিদ্যাসাগর বলেছিল,—"তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?" আমি বল্লাম,—"তা যদি না হতো তা হলে অ্যাকজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দ্যায়, আর কেউ অ্যাকজনের কাছ থেকে পালায়! আর তা না হলে, তোমাকেই বা সবাই মানে ক্যান? তোমার কি সিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া আছে, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখ্‌তে আসে।" (ক)

হঠকারিতা পূর্ব্বক, বিদেশীয় রীতির অনুকরণে সর্ব্ব বর্ণের একাকার রূপ সমাজসংস্কার করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজের শান্তিময় গুণ ও কর্ম্ম গত জাতিভেদের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় সমাজের ভীষণ বৈরীভাব উৎপাদক অশান্তিকর ধনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে মাত্র। অদ্বৈতজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণ অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যে পর্য্যন্ত মানুষ সেরূপ সমদর্শীতা লাভ না করে, ততদিন শাস্ত্রীয় নিয়ম যতদূর সম্ভব দেশ কালানুযায়ী সংস্কার পূর্ব্বক পালন করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন,—

"ঘা শুকুলে মাম্‌ড়ি আপনি পড়ে যায়। কাঁচা বেলায় টানাটানি কল্লে যন্ত্রণাই হয় আর রক্ত পড়ে!"

তাঁহার নিজের জীবনই তাঁহার উক্তির সাক্ষী স্বরূপ। যে সময় তাঁহার অদ্বৈতমতে সিদ্ধিলাভ হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শীতা আসিয়াছিল, তখন তাঁহার জাতি অভিমান, আহার নিষ্ঠা আপনিই বিলুপ্ত হইল, দ্বিজাতির বিশিষ্ট চিহ্ন উপবীত ও ধারণ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। কিন্তু যখন আবার ভক্তের অবস্থায় ব্যবহারিক ভেদজ্ঞানের উদয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ পালন করিবার জন্য আচার নিষ্ঠার উৎপত্তি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভক্তের অবস্থায় যেমন সব রকম খাওয়া চলে না, তেমনি সকলের সঙ্গে খাওয়া চলে না, আর সকলের হাতে খাওয়া চলে না। অনেক সাবধানে থাক্‌লে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ * রাখাল + এরা সব একদিন আপনারা রান্না কল্লে। ওরা সব খেতে বসেছে, অ্যামন সময় অ্যাকজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে বোসে বল্লে খাবো। আমি বল্লাম,—আঁট্‌বে না, আচ্ছা, যদি থাকে তোমার জন্য রাখ্‌বে। তা সে রেগে উঠে গ্যাল। বিজয়ার দিন যে সে মুখে খাইয়ে দ্যায় সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত এদের হাতে খাওয়া যায়।" (ক)

কেবল অন্ন ব্যতীত, তিনি মিষ্টান্ন, লুচি ব্যঞ্জন প্রভৃতি সকল

---

* বরাহনগর নিবাসী একটী যুবক ভক্ত।

+ স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ভক্তের গৃহে ভক্ষণ করিয়াছেন এবং শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত আনিত দ্রব্য বিজাতীয় লোকের প্রস্তুত হইলেও, সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কথা,—"ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়", ইহা কেবল মুখে বলিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

"অ্যাখন সব্বাইয়ের খেতে পারি না। পারি না বটে, আবার অ্যাক অ্যাকবার হয় ও। কেশব সেনের ওখানে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল। লুচি ছক্কা আন্‌লে, তা ধোপা কি নাপিত আন্‌লে জানি না—বেশ খেলাম। রাখাল বল্লে—একটু খাও।" (ক)

একদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মিলিত হইয়া এক সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসিয়াছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শালারা ম্যাল ঘণ্ট কল্লে দেখ্‌ছি। তা হোক্—ভক্তের জাত বিচার নাই।"

কিন্তু যেখানে অসৎ কামনা বা পাপের লেশ মাত্র সংশ্রব, সেখানে ব্রাহ্মণই হউন বা ভক্তই হউন, তিনি তাহার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করা দূরে থাক্, এরূপ ব্যক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার দেহ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় দগ্ধ হইত। শ্রীম, 'কথামৃতে' এরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। পাপ পথে ও গর্হিত কর্ম্মে উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহার মনে হইত, 'যেন রক্ত পুঁজ।' তাঁহার সেবার জন্য সে অর্থ বৃথা ব্যয় হইত মাত্র—সে সেবাগ্রহণ করিতে তিনি স্বতঃই অক্ষম হইতেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে আর একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা গিয়াছে। তাঁহার সেবার জন্য শুদ্ধভাবে যে খাদ্য দ্রব্য আনিত না হইত, কিম্বা তাহা কোন পাতকীর স্পর্শদোষ দুষ্ট, তিনি না জানিতে পারিলেও, সে দ্রব্য

ভক্ষণ করিতে যাইয়া তিনি তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে অক্ষম হইতেন। তিনি অসৎ লোকের স্পৃষ্ট আসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না, তাহার নিকট হইতে খাদ্য বা পানীয় লইতে গিয়া তাঁহার হস্ত অবশের ন্যায় হইয়া যাইত। আরও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার জন্য ক্রীত খাদ্যের অগ্রভাগ অন্য কাহাকে প্রদান করিলে তিনি তাহা হস্তে তুলিয়া খাইতে গিয়া গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য ভক্তগণকে পূর্ব্বাহ্ণে বলিয়া দিতেন, যেন তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্য কাহাকেও প্রদান না করে এবং অপরের ভোগ্য দ্রব্য ও যেন তাঁহাকে না দেওয়া হয়। দেবপূজার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি কি নিমিত্ত সদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে ও শুদ্ধাচারে সংগ্রহ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধান করিয়াছে, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত আচরণে বুঝিতে পারা যায়।

শাস্ত্রে সংসর্গ দোষের কথায় উক্ত আছে, "পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সহিত অজ্ঞান বশতঃ ও যদি এক বৎসর সংসর্গ করা হয়, তাহা হইলে সংসর্গকারীর পাতিত্য জন্মে। পাতকীর সহিত এক শয্যায় শয়ন, এক যানে গমন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তি বা একত্র ভোজন, তাহার যাজন ও অধ্যাপন এবং পতিত স্ত্রী-লোকের সঙ্গ করিলে, সংসর্গ দোষে মানুষ পতিত হইয়া থাকে।"* "বিশেষতঃ মানবদিগের পাপ তাহাদের অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে; অতএব পাপীর অন্ন ভোজন করিলে সেই পাপ, ভোজন-কারীতে সংক্রমিত হয়।" + এইজন্য প্রকৃতি বশতঃ যাহারা

* মনুসংহিতা একাদশ অধ্যায়, ১৮১ শ্লোক।

\+ অঙ্গিরঃ সংহিতা।

জীব হিংসা ও ব্যভিচারাদি মহাপাতক নিরত, তাহাদের স্পৃষ্ট অন্ন জল গ্রহণ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছে এবং তাহাদের তামসিক প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য সাধুসঙ্গ ও সেবাধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সকল নীচ ও পতিতকে উপলক্ষ করিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ অপূর্ব্ব সাধনার প্রবর্ত্তন আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সংসর্গের গুণ দোষ সম্বন্ধে বলিতেন,—

> "যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাক্‌বে সেইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দ্যায়—কাছে আস্‌তে দ্যায়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলের ভিতর থাক্‌তে ভালবাসে। ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ মনে, পাপের সংস্পর্শ অজ্ঞাতসারে ঘটিলেও, তাঁহার উপরোক্ত শারীরিক যন্ত্রণা ও দেহ বিকার দেখিয়া, শাস্ত্রের ঐ সকল উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি ছিল, যাহা স্ত্রী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই আকৃষ্ট করিত। সংসার তাপে দগ্ধ হইয়া শান্তির আশায় ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যে কেহ সরল মনে তাঁহার কাছে গিয়াছে, সেই তাঁহার অহংভাব শূন্য সস্নেহ সম্ভাষণে ও সুমধুর কথায় মুগ্ধ হইয়াছে। নগণ্য ও বকধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া যাঁহারা প্রথমে বিদ্রূপ ও উপেক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই ভক্তাগ্রণী। আগন্তুক দর্শক সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতে, তিনি

করযোড়ে নতশির হইয়া প্রণাম করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রতি-প্রণাম করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিদান করিতেন। শিষ্টাচারে সকলেই তাঁহার নিকট বাধিত, তিনি কাহারও কাছে ঋণী হন নাই। সাধারণতঃ তিনি জামা বা উড়নী বা কোন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতেন না; কেবল পরিধান বস্ত্রের কোঁচার এক ভাগ কাঁধে ফেলিয়া রাখিতেন (তাঁহার সমাধির চিত্রে যেরূপ আছে)। কথা কহিবার সময় মুখে এক অপূর্ব্ব হাসি লাগিয়া থাকিত। মজুমদারের কথা,—"সেরূপ হাসি আর কারো মুখে দেখিয়াছি কি না মনে হয় না," ইহার এক বর্ণও অত্যুক্তি নয়। কথা কহিতে একটু তোত্‌লা হইতেন,—কিন্তু বোধ হইত তাহাতে কথার মিষ্টতা যেন আরও বাড়িয়াছে। লোকের সহিত ভগবৎ কথার অবিরাম প্রসঙ্গের মধ্যেও তাঁহার চক্ষু দেখিলে বোধ হইত, যেন তাঁহার অন্তরাত্মা সর্ব্বক্ষণই আর কি অপরূপ দর্শন করিতেছে, যেন নিজ ইষ্ট ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

তাঁহার নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। নানা মতের লোক নানা ভাবের লোক সর্ব্বদাই আসিতেছে; সকলকেই সহাস্যে অভিবাদন করিতেছেন ও পরিচয় লইতেছেন। দিবারাত্র ঈশ্বরের কথা ভিন্ন অন্যকোন কথা নাই। কি বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম, কি যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব, কি নানা সাধন ভজনের গুপ্ত রহস্য, সকল বিষয়েই মানব মনে যত কিছু প্রশ্ন উঠিতে পারে, সকল সমস্যারই অপূর্ব্ব মীমাংসা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অমৃত ধারার ন্যায় বিগলিত হইতে থাকে। আবার তাহা এমন শ্রুতি মধুর সরল কথায় ব্যক্ত করেন যে, বালকেও তাহা

ধারণা করিতে পারে। কখন দেখা যায়, তিনি বালকের সঙ্গে মিশিয়া বালোচিত রঙ্গ পরিহাসে মত্ত রহিয়াছেন। কখন,বা জ্ঞানহীন সরল শিশুর ন্যায় ভগ্নহস্তের যন্ত্রণায় * মাকে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"মা! কেন এমন কল্লি, আমার যে বড় লাগ্‌ছে?" সকলকেই ভাঙ্গা হাত দেখাইতেছেন, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হ্যাঁগা, হাত ভাঙ্গা কি আরাম হয়?"—যেন পাঁচ বৎসরের বালক, ভাল মন্দ কোন জ্ঞান নাই! আপনার এরূপ বালকভাব সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—

> "আমায় এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে, ঢাকাঢাকি করবার যো নাই,—বালক অবস্থা! রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখ্‌তে পায়, নিন্দে করে,—গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দ্যায়। আমি এইটার জন্যে এক এক বার অধৈর্য্য হই। একে দেখাই, ওকে দেখাই আর বলি,—হ্যাঁগা, ভাল হবে কি? আমার বালক স্বভাব। হৃদে বল্লে,—মামা! মাকে কিছু শক্তির কথা বলো। আমি অম্‌নি মাকে বল্‌তে চল্লাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্‌বে তার কথা শুন্‌তে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্‌লে অন্ধকার দ্যাখে, আমারও সেইরূপ হতো। হৃদে কাছে না থাক্‌লে, প্রাণ যায় যায় হতো।" ক

তাঁহার এই সরল বালকের মত অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন,—

---

* একবার ভাবাবস্থায় পড়িয়া গিয়া তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়াছিল।

"আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাস বনে কি কাম্‌ড়েছে। তা ভয় হলো যদি সাপে কাম্‌ড়ে থাকে? তখন কি করি, শুনেছিলাম আবার যদি কাম্‌ড়ায় তা হলে বিষ তুলে লয়। অমনি সেইখানে বসে গর্ত্ত খুঁজতে লাগ্‌লাম—যাতে আবার কাম্‌ড়ায়! ঐ রকম কচ্ছি, অ্যাকজন বল্লে,—কি কচ্ছেন? সব শুনে সে বল্লে,—ঠিক ঐখানে কাম্‌ড়ান চাই, যেখানটীতে আগে কাম্‌ড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয় বিছে টিছে কাম্‌ড়েছিল।"

"আর একদিন রামলালের * কাছে শুনেছিলাম শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে রামলাল বলেছিল। আমি কলকাতায় থেকে গাড়ীকরে আস্‌বার সময় গলা বাড়িয়ে এলাম, যাতে সব হিম টুকু লাগে! তারপর অসুখ!" (ক)

কিন্তু আবার যখন লোকশিক্ষায় তন্ময় প্রায়, জ্ঞানপথের সাধক সবিস্ময়ে দেখিতেন, যেন সাক্ষাৎ বেদ বেদান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' ব্রহ্মজ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব মূর্খের ও বোধগম্য করিতেছেন। অথবা অকস্মাৎ সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেন,—দুষ্কর তপস্যার ও অপ্রাপ্য যোগিগণের আকাঙ্ক্ষিত অদ্ভুত নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা,—নিস্পন্দ দেহ, নিমেষ শূন্য, সংজ্ঞাহীন চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন!

কখন হরিগুণ গান শ্রবণ করিতে না করিতে, প্রেমোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাণমনোমোহন

* তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেছেন. কখন বা প্রেমসুধা পানে গর্গর মাতোয়ারা, অথবা মহাভাবে মগ্ন হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য !

আর তাঁহার মধুর কণ্ঠের অমৃতবর্ষী মার নাম গান ও প্রাণ মুগ্ধকারী সঙ্কীর্ত্তন!—যে একবার শুনিয়াছে সে কখন কি ভুলিতে পারে ! শ্রীম বলিতেছেন,—"রাত হইয়াছে, মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে ; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখের গান শুনিতে পান : মাষ্টার, ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন—যেন মন্ত্র মুগ্ধ সর্প! এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আজ আর কি গান হবে ?" কি বালক কি বৃদ্ধ যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আবার কি গান হবে ? গৃহ পূর্ণ লোক অনেকের অল্প মাত্র ও সময় ব্যয় করিবার অবসর নাই. কিন্তু সর্ব্বকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসিয়া আছে—'যেন মন্ত্র মুগ্ধ সর্প'—উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না !

আবার তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী বা কে ? মার নামগুণ কীর্ত্তন করিতে তিলমাত্র আলস্য নাই। তাঁহার নিদ্রা, কাক নিদ্রাবৎ। শয়নের অল্প পরেই উঠিয়া ঘরের মধ্যে মার নাম করিতে করিতে বেড়াইতেছেন, বা বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র ঘরে ধূপ ধূনা দেওয়া হইলে মার নাম গানে ও মার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তিনি করযোড়ে মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—"ওঁ কালী, ব্রহ্মময়ী, জ্ঞানময়ী, আনন্দময়ী ; মা ! তুমি তুমি, তুমি, তুই তুই তুই ; আমি তোমাতে, তুমি

আমাতে : জগৎ তুমি, জগৎ তোমাতে ; তুমি আধার তুমি আধেয় ; তুমি ক্ষেত্র তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ ; তুমি খাপ, তুমি তরোয়াল ; জীবাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মাত্মা ভগবান্, ভাগবৎ ভক্ত ভগবান ; গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব ; জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম অসাধুর চরণে প্রণাম, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম।"

সন্ধ্যার সময় কি ভাবে তিনি মার নাম কীর্ত্তন ও মার কাছে প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'কথামৃত' হতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাত তালি দিয়া হরি ধ্বনি করিতেছেন। কক্ষ মধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরের ছবি,—ধ্রুব প্রহ্লাদের ছবি, রামরাজার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্মশক্তি, শক্তি ব্রহ্ম ; বেদপুরাণ তন্ত্র ; গীতা গায়ত্রী ; শরণাগত শরণাগত ; নাহং নাহং ; তুঁহু তুঁহু ; তুমিই পুরুষ তুমিই প্রকৃতি ; তুমিই বিরাট তুমিই সরাট : তুমিই নিত্য তুমিই লীলাময়ী ; তুমিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী ; হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন ; হরি বোল, হরি বোল, হরি ময়, হরি বোল, হরি হরি হরি বোল।" নামের পর করযোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। নামগুণ কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন,— "মা! আমি তোমার শরণাগত শরণাগত! দেহসুখ চাই না মা ; লোকমান্য চাই না ; অষ্টসিদ্ধি চাই না ; শতসিদ্ধি চাই না ; কেবল

এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিষ্কাম, অমলা, অহেতুকী ভক্তি! আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী, মায়ায় মুগ্ধ না হই! তোমার মায়ার সংসারে কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা তোমা বই আমার আর কেউ নাই! আমি ভজন হীন, সাধন হীন, জ্ঞান হীন, ভক্তি হীন, ক্রিয়া হীন,—কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তি দাও!" ক)

সংসারী লোক কিরূপে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি নিত্য এরূপ আচার পালন করিতেন।

কি দক্ষিণেশ্বরে কি কলিকাতায় প্রত্যহ ভক্ত সঙ্গে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার লোকশিক্ষার বিরাম থাকিত না। তিনি যখন যাহা করিবেন বলিতেন, ঠিক সেই ভাবে তাহা নিষ্পন্ন করিতেন; কারণ অন্যথা করিলে মিথ্যা কথা হইবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস। যে সময় যেখানে যাইবেন বলিয়াছেন, শত বিঘ্ন সত্ত্বেও ঠিক্ সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতেন; একদিন তাঁহার কলিকাতা বেনেটোলায় অধরচন্দ্র সেনের বাড়ী আসিবার কথা ছিল। প্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য কিছু পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত হন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া ও তাঁহার উপস্থিতির সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধর চন্দ্র নিঃসঙ্কোচে বলিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন। তিনি যখন আসিবেন বলিয়াছেন, কখনই সে কথার অন্যথা হইবে না, তিনি নিশ্চিত আসিবেন।" যদি চ তাঁহাকে তিনক্রোশ দূর

দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কথিত সময়ের মধ্যেই পৌঁছিয়া ছিলেন।

তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব্ব! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দেখা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয়না ক্যান? আস্‌বো বোলে আসিলেন না—এ কিরকম কথা?" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে একদিন বলিলেন,—

"শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়,—যেন ভক্তি রসে ডুবে আছে! আর অনেকে যাকে গণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল, অ্যাকবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবে কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবর ও পাঠায় নাই ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। সংসারে থাক্‌তে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যকে আঁটকরে ধরে থাক্‌লে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাবো, যদি বাহ্যে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই, পাছে সত্যের আঁট যায়! আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমেছে; আগে ভারি

আঁটছিল। যদি বল্লাম 'নাইবো' গঙ্গায় নামা হলো, মন্ত্রোচ্চারণ হলো, মাথায় একটু জল ও দিলাম, তবু সন্দেহ হলো বুঝি পুরো নাওয়া হলো না! যদি হঠাৎ বোলে ফেলি খাবনা, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি অমুক লোকের ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে যেতে হবে,—আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। আমার এই অবস্থার পরে মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার শুচি এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য এই নাও তোমার পাপ আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! যখন এই সব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নাই-মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য! সব মাকে দিতে পারলাম, সত্য মাকে দিতে পারলাম না।" (ক)

সর্ব্বত্যাগী ও সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ও কোন ভক্তকে সাংসারিক কার্য্যে আলস্য পর, অমনোযোগী, অমিতব্যয়ী দেখিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ঘরের ঘটিটী বাটিটী কে ভক্ত কোথায় ভুলিয়া রাখিয়াছে, তিনি স্মরণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেন। কলিকাতায় আসিবার সময় তাঁহার ব্যবহারের গামছাখানি, কোন ভক্ত তাড়া তাড়িতে ফেলিয়া

আসিলে, তিনি তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গামছা আনাইয়াছেন। এরূপ সামান্য বিষয়ে ও অষ্টপ্রহর ঈশ্বরচিন্তা মগ্ন ব্যক্তির মনোযোগীতা অপরূপ বলিয়া বোধ হয়! কেহ তামাক সাজিবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়াছে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"রান্নাবাড়ী হতে আগুন নিয়ে আয়, একটু হাঁটতে হবে বোলে দেশলাইয়ের কাটী নষ্ট কচ্চিস্ ক্যান? কুড়ের কোন কালে ধর্ম্ম হয় না।" একদিন কোন ভক্ত বাজার হইতে অধিক দরে তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"সাধু হবি তা বলে বোকা হবি ক্যান? দান করবার সময় একটা পয়সার জায়গায় দুটো পয়সা দিস্, কিন্তু যখন জিনিষ কিন্‌বি তখন ঠক্‌বি ক্যান? তখন খুব দর করবি, ফাউ লবার সময় একটার জায়গায় দুটো জোর করে নিবি।" রন্ধনাদি সংসারের সকল কার্য্যেই তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল নিম্নের উদ্ধৃত কথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণকে সঙ্কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহাদের বলিলেন,—"আমি মনে কোরেছিলাম তোমাদের সঙ্গে নাচ্‌বো। গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন্ টোড়ন্ সব পড়েছে—মেথি পর্য্যন্ত। আমি কি দিয়ে সম্বরা কোরবো?" (ক)

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে মানবভাব ও দেবভাব গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় কিরূপ মিশামিশি ভাবে বর্ত্তমান আমরা তাহা দেখিলাম। বাল্যকালেই তাঁহার দেবভাবের স্ফূর্ত্তি। সাধনার শেষে সেই দেবভাবের পূর্ণতা। ভক্ত সমাগমের আরম্ভে তাঁহাতে আর এক স্বতন্ত্র ভাবের বিকাশ—ইহা তাঁহার লোকশিক্ষার ভাব—

আচার্য্যত্ব। তিনি আচার্য্যরূপে তাঁহার সাধনালব্ধ অনুভূতি, মার আদেশে কিরূপ জগতে প্রচার করিলেন, তাহা উক্ত হইয়াছে। এ সময় আমরা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত অপর এক অপূর্ব্বভাবে মিলিত দেখিতে পাই। এখন ভক্তগণের সমক্ষে তিনি তাহাদিগের সদ্‌গুরুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভগবান্ লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুর নিকট সাধন পথ জানিয়া লইয়া সাধনা করিলে গুরুর কৃপায় শিষ্য মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং ঈশ্বর লাভ করেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করিবার প্রকৃত সামর্থ্য কাহার আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন,—

> "মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত কর্ত্তে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গুরু নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে! আমি অ্যাকদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুন্‌তে পেলাম যে একটা কোলা ব্যাঙ্ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি, তখন ও দেখি ব্যাঙ্‌টা খুব ডাক্‌ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লাম কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙ্‌টাকে ধরেছে—ছাড়্‌তেও পাচ্ছে না গিল্‌তেও পাচ্ছে না, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা ঘুচ্ছে না। তখন ভাবলাম, ওরে!

যদি জাত সাপে ধর্‌তো তিন ডাকের পর ব্যাঙ্‌টা চুপ্‌ হয়ে যেতো। একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপ্‌টারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা। যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে, গুরুর ও যন্ত্রণা শিষ্যের ও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘোচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।" (ক)

সুতরাং যে সকল সাধু পুরুষ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্‌ তাঁহারাই গুরু হইবার অধিকারী। কেবল শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিত, যাঁহার বিবেক বৈরাগ্য নাই, সাধন ভজন নাই, লোকাচার ও কুলাচার নিয়মানুযায়ী গুরুপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষায় গুরু ও শিষ্য উভয়ের অনিষ্ট। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ভগবানের জন্য যে আন্তরিক ব্যাকুল, তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য যে সরল মনে চেষ্টা করে, তিনিই তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দ্যান। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই। গুরু অ্যাক হ'লে ও উপগুরু অনেক হতে পারে। যার কাছে কিছু শিখি তিনিই উপগুরু। অবধূত চব্বিশ জন উপগুরু করেছিলেন।"

"গুরুকে মানুষ জ্ঞান কল্লে কোন ফল হয় না। গুরুই জগদ্‌গুরু এইরূপ বিশ্বাস রাখা উচিত।"

"সচ্চিদানন্দই গুরু। তিনি বিনা কোন উপায় নাই।

তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। গুরু রূপ হয়ে ঈশ্বর সব মায়াপাশ ছেদন করেন। শব সাধন করে, ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সাম্‌নে এসে পড়েন, আর বলেন,—ঐ তোর ইষ্ট! তার পর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যান! শিষ্য আর গুরুকে দেখ্‌তে পায় না! যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট! যখন পূর্ণ-জ্ঞান হয়, তখন কেবা গুরু কেবা ইষ্ট! সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দ্যাখা নাই!" (ক)

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোক্‌রায় না। সময় হলেই পাখী ডিম্ ফুটোয়। তবে একটু সাধনার দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন।" (ক)

সাধনা করিতে করিতে সাধকের যখন ইষ্ট লাভের সময় উপস্থিত হয়, তখন ঈশ্বর কৃপায় তাহার সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহার উক্তির মর্ম্ম। প্রশ্ন হইতে পারে,—"এরূপ সাধু বা সদ্‌গুরু চিন্‌বো কেমন কোরে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অজানা দেশে যেতে গেলে, যে লোক সে দেশ দেখেছে, সে দেশের পথ ঘাট সব খবর জানে, তার সঙ্গে যেতে হয়, তার কথা শুন্‌তে হয়। ভগবান্ লাভ কর্ত্তে গেলে, সদ্‌গুরু যিনি ঈশ্বর দর্শন কোরেছেন, তাঁর কথা বিশ্বাস কোরে সাধন কর্ত্তে হয়। সদ্‌গুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে তার কাছেই কাশীর কথা শুন্‌তে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য

বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য থাক্‌লে উপদেশ দিতে পারে।"

"তিনিই সাধু—যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দ্যাখেন না; সর্ব্বদাই তাদের থেকে অন্তরে থাকেন। যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন তাঁকে মাতৃবৎ দ্যাখেন ও পূজা করেন; ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন্ না। আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।" (ক)

ভগবান্ লাভের জন্য বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কতদূর এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা কে হইতে পারেন, তিনি তাহাই বলিতেছেন,—

"বই শাস্ত্র, এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে স্থায়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ কর্ত্তে হয়। একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল,—কুটুম্ বাড়ী তত্ব কর্ত্তে হবে, কি কি জিনিষ লেখা ছিল। জিনিষ কিন্‌তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটী তখন খুব ব্যস্ত হয়ে, চিঠি খোঁজা আরম্ভ কল্লেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজ্‌লে—শেষে পাওয়া গ্যাল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন, আর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন কি লেখা

আছে। লেখা এই,—পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখান কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিষের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।"

"শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম্ম আরম্ভ কর্ত্তে হয়—তবে তো বস্তু লাভ! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না।"

শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দ্যাখা ভাল। গুরু মুখে বা সাধু মুখে শুন্‌লে ধারণা বেশী হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা কর্ত্তে হয় না। শোনার চেয়ে দ্যাখা আরও ভাল। দেখ্‌লে সব সন্দেহ চলে যায়। শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে।"

"শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ 'অস্তি' মাত্র বোধ হয় - আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দ্যাখা দ্যান্ না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়ো মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্‌তে পার্‌বে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পার্‌বে কিন্তু তাঁকে পার্‌বে না।"

"সাধনা না কল্লে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু লতে হয়—যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠির কথা আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিল্লে কিছুই লই না। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না—অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র সব খড় কুটো বোধ হয়।"

অদ্বৈত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বভৌমিক ভাব সম্যক অবধারণ পূর্ব্বক, জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্যই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু রূপে শিক্ষাদান। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার ভাব ধারণা করিয়া, ভক্তগণ নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে পারে, শীঘ্রই সেই ঘটনার সূচনা হইয়াছিল।

১২৯২ সালের বৈশাখ মাস হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণের গল রোগের সূত্রপাত হয়। নিদ্রাকালে মস্তকে ও বক্ষে ঘাম হয়, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা, গলায় বিচি ও বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কথা কহিতে আহার করিতে কষ্ট অনুভব করিতে

লাগিলেন। গলার ভিতর বিচি ক্রমে বিস্তারিত ও পাকিয়া উঠিয়া পূজ ও রক্ত বাহির হইল। মাঝে মাঝে এইরূপ রক্ত বাহির হইতে ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিয়া প্রকৃত রোগ নিরূপণ করিবার জন্য ভক্তগণ কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইলেন। কেহ গলগণ্ড, কেহ গলার ভিতর ক্ষত রোগ হইয়াছে ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপশম না হওয়াতে, আশ্বিন মাসের প্রথমে চিকিৎসার উদ্দেশে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া প্রথমে বাবু বলরাম বসুর বাটীতে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দেখাইতে তিনি রোগ অসাধ্য বলিয়া ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। আশ্বিন মাসেই কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লিতে বাটীভাড়া করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। শুদ্ধভাবে পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীসারদা-দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিলেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্য তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কয়েকজন যুবক ভক্ত আপনাদিগের গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভুক্তি মুক্তি প্রদাতা সদ্‌গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে একজন সাধু, মহাপুরুষ বা ধর্ম্মশিক্ষক আচার্য্য। কিন্তু এই সকল ভক্তগণের চক্ষে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে গুরুরূপে অবতীর্ণ! ভক্তগণের বিশ্বাস তিনি পাতকীর পরিত্রাতা, শোকদগ্ধের সন্তাপ হর্ত্তা, সংসার ভীতের অভয় দাতা স্বয়ং ভগবান্ নরদেহে লীলা করিতেছেন। তাঁহার কোন ভক্ত নিজের অন্তরের কথা এইরূপে প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন,—"আমি একজন অবিশ্বাসী, নাস্তিক, চিরকাল কুকর্ম্মে কাল কাটাইয়াছি। আমি যেখানে বসিতাম সে মাটি পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হইত। পাপের আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতে পাই নাই। কুস্থান হইতে মদ্যপানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গভীর রাত্রে তাঁহার কাছে গিয়াছি, তিনি আলিঙ্গন দিয়া আনন্দে মাতিয়া আমাকে মার নাম শুনাইতে লাগিলেন! আমার মনে উঠিল,—আমার এখন যে অবস্থা, পিতা মাতার নিকটে যাইলে তাঁহারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতেন,—স্ত্রী ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিত, কিন্তু কে ইনি,—এ পতিতকে আদর কোরে কোলে নিয়েছেন? প্রাণের ভিতর কে যেন বলিল,— পতিত পাবন আর কে, এইত পতিত পাবন। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু! আমার নিজের কোন গুণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাই নাই। তাঁকে চিন্তা কোরে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আমার এখন যমের ভয় নাই! মুক্তি তাঁর কাছে ছড়াছড়ি! একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে যেন থাকতে পারি! আমার সাধন ভজন মন্ত্র তন্ত্র সবই ঐ একটী শ্লোকে আছে,—সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীম "কথামৃতে" আর একটী শোকাতুরা স্ত্রীলোক ভক্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক দরিদ্রা বিধবা ব্রাহ্মণীর একটী মাত্র কন্যা। দরিদ্রার অনুপম রূপবতী সেই কন্যা রাজরাণী হইয়াছিল। কন্যাটীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। দরিদ্রা জননী শোকে পাগলিনী প্রায় হইলেন। দারুণ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের কোন উপায়ই দেখিতে পান না। প্রতিবেশিনী কোন স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়া অন্তরের জ্বালা জানাইলেন।

তাঁহার সান্তনা বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণীর মনে হইল কে যেন তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছে! শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ব্রাহ্মণীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত। ব্রাহ্মণী প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচিনা গো! তোমরা সব বলো, আমি কেমন কোরে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী (বিধবার মৃতা কন্যা) যখন এসেছিল সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে কোরে, আর তারা রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিল—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটু ও আমার নাই! যাই সকলকে বলি,—আমার সুখ দেখে যা! যাই যোগিন্‌কে বলিগে—আমার ভাগ্যি দেখে যা! ওগো, খ্যালাতে একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাক টাকা পেয়েছিল। সে যাই শুন্‌লে এক লাক টাকা পেয়েছি, অম্‌নি আহ্লাদে মরে গিছিলো,—সত্য সত্য মরে গিছিলো! ওগো, আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ করো, না হলে সত্য সত্য মরে যাবো!" (ক)

ভীষণ সংসার অরণ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা পথিক, কৃপাময়ের কৃপায় পথ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই। সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই! ......তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গর মঞ্জুর করেন নাই। আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতা মাতা কখন ও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য, এবং তাঁহার

শিষ্য মাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে ভগবান্ রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহ উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্ব গুণে, আমার সকল বেদনা জানিয়া, নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।" *

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটই কেবল নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "কথামৃতে" সে সকল কথা লিখিত আছে। তাঁহার অলৌকিক জীবনের ব্যাখ্যার জন্য তাঁহার শ্রীমুখের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত হইল।

বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ মানুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির প্রকাশই ঈশ্বরের অবতারত্ব। অবতারের স্বরূপ ও তাঁহার আবির্ভাবের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, পূর্ব্বে পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় লিখিত হইয়াছে। যখনই নাস্তিকতা প্রবল হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সে সময় শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি মানুষে প্রকাশিত হইয়া প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে। জড় জগতের কার্য্য সকল যেরূপ অখণ্ডনীয় ভৌতিক নিয়মে পরিচালিত হয়, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির আবির্ভাব ও সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ-রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ উভয় বিধ নিয়মেরই কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না।

একদিন কোন ভক্ত বলিলেন,—অনন্ত শক্তির প্রকাশ ক্ষুদ্র

---

* স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৪৮।

মানুষে হয় না, হইতে পারে না। এরূপ সংশয়ের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

> "অনন্ত ঢুকুতে চাও ক্যান? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ছুঁয়ে যেতে হবে? সচ্চিদানন্দ সাগর, তাঁর ভিতর 'আমি ঘট' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, যেমন দুভাগ জল। 'আমি' গেলে কি রইলো তা কেউ মুখে বলতে পারে না—যা আছে তাই আছে। তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে, আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে—এ সব মুখে বলা যায় না।"

তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই, যেমন 'গঙ্গাস্নান করেছি' বলিলে সমস্ত গঙ্গা স্রোত স্পর্শ হইয়াছে বুঝায় না, সেইরূপ 'ঈশ্বরের আবির্ভাব' বলিলে, অনন্ত ঈশ্বরের মানুষ দেহে প্রবেশ এরূপ অর্থ ও বুঝায় না। মানুষের 'অহংবুদ্ধি' ঈশ্বর ও জীবে ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছে। বাস্তবিক স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যতক্ষণ 'অহংবুদ্ধি' থাকে ততক্ষণ আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। অবতারে এই 'আমি' জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হইয়া, অনন্ত ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে কোন দিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন,—"অবতার আবার কি? যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর,—

অবতার ভক্তের জন্য জ্ঞানীর জন্য নয়।

"ঐটুকু বোঝা শক্ত,—তিনিই বিরাট তিনিই সরাট, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁদের কথা বিশ্বাস কর্ত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকীলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা ওঁর সাএন্সে (Science) নাই! তবে কেমন কোরে বিশ্বাস হয়?

"জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে, তারা অবতার মানে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি আমাকে অবতার অবতার বল্‌ছো, তোমাকে একটা জিনিস দ্যাখাই দেখবে এস! খানিক দূরে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্লেন—কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? অর্জ্জুন বল্লেন,—একটী বৃহৎ গাছ, তাতে থোলো থোলো কাল জাম হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন ও কাল জাম নয়, আরও একটু এগিয়ে দ্যাখো ও থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে রয়েছে—আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্ম রূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্চে যাচ্চে!"

"ঋষিরা রামচন্দ্রকে বল্লেন,—হে রাম! আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার

জেনে পূজা করুন, আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই। ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। যার যেমন মন ঈশ্বরকে সেইরূপ ছাখে। যার যেমন রুচি, আবার যার যেমন পেটে সয়।"

"অবতার ভক্তের জন্যই, জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়। তারা তো সোহহং হয়ে বসে আছে! ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন কর্‌বার জন্য। তাঁকে দর্শন কল্লে মনের অন্ধকার দূরে যায়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধর্ত্তে পারে? ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন,—"হে রাম। তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! তুমি আমাদের কাছে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।"

"সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধর্ত্তে পারে? মন থেকে কামিনীকাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিন্তে পারা কঠিন! অবতার যখন আসেন সাধারণ লোক জান্তে পারে না—গোপনে আসেন। দুই চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জান্তে পারে। রামচন্দ্রকে ভরদ্বাজাদি বারজন ঋষি কেবল পূর্ণ অবতার বলে চিনেছিলেন। সকলে ধর্ত্তে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে, কেউ সাধু ভাবে, দু চার জন অবতার বলে ধর্ত্তে পারে। যার যেমন পুঁজি, জিনিষের দাম সেই রকম ছ্যায়। বেগুন ওলাকে হীরের

দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বল্লে—আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি—এর একটাও বেশী দিতে পারি না!"

"দেখেছি বিচার কোরে এক রকম জানা যায়। তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দ্যান, সে অ্যাক্। তিনি যখন দেখিয়ে দ্যান—এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দ্যান, তা হলে আর বিচার কর্ত্তে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।"

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ কর্ত্তে হয়। তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ—সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুত পিঁড়ে মাথায় কোরে বয়ে নিয়ে গিছ্‌লেন। যেমন থিয়েটারে সাজা—যা সেজেছে তাই অভিনয় কোর্ব্বে। থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার কর্ব্বে, যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার কর্ব্বে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় কর্ব্বে। ঈশ্বর যখন মানুষ হন, তখন ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।"

কি লক্ষণ দ্বারা অবতার কে চিনা যায়?

"আধ্যাত্মে আছে লক্ষণ রামকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক কিরূপে তোমায় চিন্তে পার্‌বো?

রাম বল্লেন, ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা ভক্তি—প্রেম ভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ছে, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্ত্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হয়েছিল। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব—হাঁসে কাঁদে নাচে গায় সেখানে সাক্ষাৎ তিনি বর্ত্তমান!"

উপরোক্ত উক্তিগুলিতে পরোক্ষভাবে আপনার অবতারত্ব ইঙ্গিত করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, (নিজের দেহ দেখাইয়া),—

"এর ভিতর কে আছেন, আমার বাবা জান্তেন। আমার বাবা গয়াতে গিছ্‌লেন। সেখানে স্বপন দেখেছিলেন,—রঘুবীর বল্‌ছেন,—"আমি তোমার ছেলে হব!" বাবা স্বপন দেখে বল্লেন'—ঠাকুর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন কোরে তোমার সেবা কোরবো? রঘুবীর বল্লেন,—"তা হয়ে যাবে।" এর ভিতর তিনিই রয়েছেন!"

"এর ভিতর কে একটা আছে, সেই আমাকে নিয়ে এই সব কচ্চে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হতো। আমি পূজা না কল্লে শান্ত হতাম না। দিদি—হৃদের মা, আমার পা পূজা কর্ত্তো—ফুল চন্দন দিয়ে! একদিন তার মাথায় পা দিয়ে বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে!"

"ঈশ্বর কোটী অবতারাদি না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে

আসেন—যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্য! এর ভিতর একজন আছে—তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন কোরে আছি!"

"এর ভিতর তিনিই আছেন! নিজে থেকে মা, স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা কচ্চেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এ কি আমার কর্ম্ম! স্ত্রী সম্ভোগ স্বপ্নেও হলো না! চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ঐহিক লোক চারিদিকে—এর ভিতর এমন অবস্থা! সমাধি ভাব লেগেই রয়েছে!"

"সেদিন হরিশ * কাছে ছিল,—দেখ্‌লাম খোলটা (শরীর) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এলো! এসে বল্লে—আমি যুগে যুগে অবতার!" তখন ভাবলাম,—বুঝি আমি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বল্‌ছি! তার পর চুপ করে থেকে দেখ্‌লাম্, তখন দেখি আবার বল্‌ছে—শক্তির আরাধনা চৈতন্য ও করেছিল!—দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব—তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য!"

একদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা বলিতে বলিতে আপনার বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—

"আর দেখ্‌লাম—তিনি আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি! তবে একটা রেখা মাত্র আছে সম্ভোগের জন্য!"

"এই ব্যায়রাম হয়েছে ক্যান? এর মানে ঐ—যাদের

* একজন সেবক ভক্ত।

সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থা দেখ্‌লে চলে যাবে!"

"শরীরটা কিছু দিন থাক্‌তো তো লোকদের চৈতন্য হতো, তা রাখ্‌বে না। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফ্যালে! অ্যাকে কলিতে ধ্যান জপ নাই!"

"মনে কচ্চি—চৈতন্য হোক্ সকলকে বল্‌বো না। কলিতে পাপ বেশী—সেই সব পাপ এসে পড়ে!"

"তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ কোরে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ভক্তেরা ও আসে—কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদ্দার।"

"আবার দ্যাখালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে। যাই আরতির শাক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তো, অম্‌নি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয়ে চীৎকার কর্ত্তাম—ওরে, তোরা কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়, ঐহিক লোকদের সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায়। ইংলিশম্যানকে (ইংরাজী পড়া লোক) বল্লাম,—তারা বলে, ও সব মনের ভুল। তখন তাই হবে বোলে শান্ত হলাম। কিন্তু এখন তো সেই সব মিল্‌ছে—এখন সব ভক্ত ক্রমে ক্রমে—জুটছে।"

"আবার দ্যাখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবাবু। তার পর শম্ভুমল্লিক। তাকে আমি কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়্‌লো—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি। আর তিন জন

সেবায়েত এখন ও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবর্ণ। সুরেন্দর, * অনেকটা রসদ্দার বোধ হয়।"

"এর ভিতর দুটী আছেন। একটী তিনি,—আর একটী ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ? কারেই বা বোলবো কেই বা বুঝ্‌বে! তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো নাচ্‌লে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গ্যাল! এলো গ্যালো, কেউ চিন্‌লে না!"

"দেহ ধারণ কল্লেই কষ্ট আছেই। অ্যাক অ্যাকবার বলি, আর যেন আসতে না হয়! তবে কি; একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না। আর যে দেহ ধারণ করা, এটী ভক্তের জন্য!"

"আর একবার আস্‌তে হবে, তাই পার্শ্বদ্‌দের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। যদি সব জ্ঞান দিই তাহলে, আর সহজে আমার কাছে আস্‌বে ক্যান? এখানে সব আস্‌ছে যেন কল্মির দল। এক জায়গায় টান্‌লে সবটা এসে পড়ে। যারা এখানে আসে পরস্পর সব আত্মীয়, যেমন ভাই ভাই। তিনি গুরু রূপে এসে সব জানিয়ে দ্যান।"

"আবার মনে উঠ্‌লো—যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাক্‌বে, তাদের এখানে আস্‌তেই হবে, আস্‌তেই হবে! যারা

* গৃহস্থ ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র।

আন্তরিক জপ ধ্যান করেছে, তাদের এখানে আস্‌তেই হবে!"

"আর আমি এই অবস্থায় বল্‌ছি, কথায় বিশ্বাস করো, দ্যাখো এখানে ঢং ফং নাই! আমি ভাবে বলেছি—মা! এখানে যারা আন্তরিক টানে আস্‌বে তারা যেন সিদ্ধ হয়!"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিগুলি কি উন্মত্তের প্রলাপ, না নিজে ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি আপনাকে প্রতারণা করিতেছেন? অথবা, সত্যই কি কোন মহাকার্য্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি তাঁহার নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছে? সংশয়াত্মা যেরূপ বিচার করুন না কেন, এই অপূর্ব্ব চরিত্র যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া অনুধাবন করিবেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের নির্দ্দেশ ভিন্ন তাঁহার অসাধারণ জীবনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে বিফল প্রযত্ন হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব তাঁহার জীবন ইতিহাসের প্রতি পত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। যে সার্ব্বজনীন জাতি ও সমাজ বিলোপকারী ধর্ম্মগ্লানি অপসারণ করিতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার গভীরতায় অপর সকল যুগের ধর্ম্মহীনতা পরাহত। ঐতিহাসিক যুগের অতীতে, ত্রয়ী বেদের উপাস্য নানা দেববেদীর যে মহাসম্মিলন গীতি—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

এক দেবতাকেই বেদজ্ঞগণ ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি গরুত্মান্ সুপর্ণ প্রভৃতি বহু নামে বলিয়া থাকেন—বৈদিক ঋষিকণ্ঠে সুঘোষিত হইয়াছিল, এখন তাহা পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক কোলাহলে

আর শ্রুতিগোচর হয় না। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের বজ্রনির্ঘোষ স্তব্ধ করিয়া শ্রীভগবানের যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও অনন্যভক্তির সুগম্ভীর উত্তেজনা আর্য্য জাতিকে মোক্ষপথে আহ্বান করিয়াছিল, এখন তাহা অবিশ্বাস, অসত্য ও জড়বুদ্ধির প্রাদুর্ভাবে সাধন ভজনে নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীকে জাগরিত করিতে অসমর্থ। দয়াবতার ভগবান্ বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য ও কঠোর নীতির ছায়ায়, বৌদ্ধ সঙ্ঘের যে মদ্য মাংস ও ব্যভিচারের আচরণ গুপ্ত ভাবে ভারতের ধর্ম্মজীবন বিপথগামী করিয়াছিল, এখনও তাহা নানা সম্প্রদায় মধ্যে প্রকাশ্যে আচরিত হইতেছে। বৌদ্ধ দর্শনের নিরীশ্বর শূন্যবাদ খণ্ডনে, ভগবান্ শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে বেদান্তের জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বিজয়শ্রী লাভ করেন, এখন তাহা ঘোর সম্প্রদায় বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যের যে প্রেমের প্রবাহ আচণ্ডালে উজান বহিয়াছিল, এখন তাহা ক্ষীণকায়া হইয়া সাম্প্রদায়িক ইষ্টবিদ্বেষের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত। হিন্দু ভারতে আজ সাত কোটি মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীর উৎকট স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা, ধ্বংসাবশেষ দেবমন্দির বক্ষে গগনভেদী মিনার উত্তোলিত করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছে। আর যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা অবিশ্বাসীর অনন্ত নরক বিহিত হইয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম-সমাচার ঘোষণা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মবিপ্লবের শেষ হয় নাই। ভারতে ইংরাজ সমাগমের পশ্চাদাগত য়ুরোপীয় সভ্যতা জ্যোতিঃর তীব্র করজালে অপর সকল ধর্ম্মই ম্রিয়মান। পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান বিচারে ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিশ্বাস অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া স্থিরীকৃত। মানবজাতির

উন্নতি ও মঙ্গলবিধান ধর্ম্মের অধিকার হইতে গৃহীত হইয়া বিজ্ঞানের কর্ত্তৃত্বে সমর্পিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিষ্য, শিক্ষিত ভারত, তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া চিন্তার স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, বর্ণাশ্রমাচার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈদিক চিন্তারাশি, য়ুরোপের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগের ধর্ম্মচর্চ্চার ন্যায়, নিষ্ফল কূট তর্ক পূর্ণ আবর্জ্জনা সমষ্টি, কেবল বিজ্ঞানালোচনায় দূরীকৃত করিতে হইবে। সমানাধিকারবাদী * ইঁহাদের তুলাদণ্ডে, কি দয়া সত্য শৌচপরায়ণ ধর্ম্মচারী এবং হিংসা অনৃত ও কদাচারী অধর্ম্মকর্ম্মী, কি বৈরাগ্যবান সাধু ও নরঘাতক দস্যু, কি চঞ্চল দুর্ব্বল ও অসংযত চিত্ত স্ত্রীলোক এবং স্থিরপ্রজ্ঞ ধৃতিমান্ পুরুষ, তুল্যমূল্য। এখন ঈশ্বরোপাসনারূপ মৃতের পূজা বিসর্জ্জন দিয়া দেশভক্তির নামে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই জগৎব্যাপী ঈশ্বরবিমুখতা, ধর্ম্মহীনতা সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি উন্মূলিত করিয়া শান্তি ও সম্মিলন স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আচার্য্যত্ব! এই মহাকার্য্য সাধনোদ্দেশে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে যুগধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, ঈশ্বর দর্শন ও ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে তাঁহার কতিপয় উক্তি, সংক্ষেপে পুনরুল্লিখিত হইল,—

"আমায় সব ধর্ম্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এ সব পথ

* ইংলণ্ডের সোসিয়ালিষ্ট ও রুষের কমিউনিষ্টদিগের সমানাধিকারবাদ, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করিতেছেন।

দিয়ে আস্‌তে হয়েছে। দেখলাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আস্‌ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে !”

“জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ ! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। কামিনীকাঞ্চন, দেহসুখ, লোক মান্য, টাকা এ সব অনিত্য, দুদিনের জন্য। শরীর এই আছে এই নাই ! তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁকে দ্যাখা যায় !”

“ঈশ্বরকে দ্যাখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি ! তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খোঁজে সেই পায় !” (ক)

পাপলেশ পরিশূন্য, সত্যনিষ্ঠার আদর্শ, বৈরাগ্যের অনুপম মূর্ত্তি, দয়া ও প্রেমের প্রস্রবণ অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ, সংসারের দারিদ্র কষ্ট, শোকতাপ, জরাব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, তাঁহার শুদ্ধসত্ব দেহ পাতকীর সংস্পর্শ জনিত তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইয়া, অধর্ম্মকারীর সকল পাপ নিজ হৃদয়ের শোণিতে ধৌত করিয়া, কেবল,—বিবাদমান ধর্ম্ম মত সকলের মধ্যে মহাসমন্বয় সাধনের জন্য, নাস্তিকতা ও ধর্ম্মহীনতা রোধপূর্ব্বক ঈশ্বর দর্শনের সত্যতা স্থাপনের জন্য, আর জগতের দরিদ্র পতিত পাপী তাপী স্ত্রী পুরুষ সকলকে পরম শান্তির পথ দেখাইবার জন্য, নিজের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। এখন মাত্র তাঁহার নিজভাব সংরক্ষার্থ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠারূপ জীবনের শেষকার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে।

কলিকাতা শ্যামপুকুর পল্লিতে প্রায় তিন মাস কাল অবস্থানের পর, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত ও সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ

শ্রীরামকৃষ্ণকে কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর বাগান বাটীতে স্থানান্তরিত করেন। গলদেশের ক্ষত রোগ এখন চিকিৎসকগণ ক্যানসার (cancer) বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চিকিৎসকেরা তাঁহার কথা কহা বারণ করিলেন। লোক সমাগম বন্ধ হইল। সেবকগণ গৃহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরুর সেবা একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করতঃ নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার মন অধিকাংশ কাল, দেহজ্ঞান শূন্য হইয়া অখণ্ডে লীন হইয়া থাকিত। শ্রীম লিখিতেছেন,—"ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যখন এক একবার দেখেন তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ঠাকুর কিন্তু সকলকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বসিয়া আছেন সহাস্য বদন। ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ⋯⋯ ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন, কণ্ঠে হৃদয়ে নাভি দেশে। একটী বালক ফুল লইয়া খেলা করিতেছে! এইবার মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন"—

> "এখন বালকভাব, তাই এই রকম কচ্ছি। কি দেখ্‌ছি জান? শরীরটা যেন বাঁখারি সাজান কাপড় মোড়া, সেইটে নড়্‌ছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে—যেন কুম্‌ড়ো, শাঁস বিচি ফ্যালা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আর,—

"ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে—বড় দুর্ব্বল। মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ করিয়া বলিতেছেন,—আর অন্তরে ভগবান্ দেখ্‌ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—

"অন্তরে বাহিরে—তুই দেখ্‌ছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় কোরে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন—এইটা দেখ্‌ছি! সব দেখ্‌ছি একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়্‌ছে। দেখ্‌ছি, যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কই অ্যাকধারে পড়ে থাকে। এখন কেবল দেখ্‌ছি—অ্যাকটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর অ্যাক পাশে গলার ঘাটা পড়ে রয়েছে!" (ক)

অপর একদিন বলিলেন,—

কি দেখ ছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর আর যা জীব দেখ্‌ছি যেন চামড়ার সব তইরি। তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন এক বার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ী বাগান রাস্তা মানুষ গরু সব মোমের—সব এক জিনিষে তইরি!

"দেখ ছি—সেই কামার, সেই বলি, সেই হাড়িকাট হয়েছে! আহা! আহা!" (ঠাকুর বাহ্যশূন্য!)"

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এখন শ্রীগুরুর উপদেশে নানা বিধ সাধন করিতে প্রবৃত্ত। অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ শিক্ষা করিবার জন্য গুরুর আদেশে কখন নিকটস্থ পল্লিতে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন, কখন বাগানের নিভৃত স্থানে ধ্যান ও জপ করেন, কখন উপবাসাদি কঠোর ব্রত আচরণ করিতে থাকেন। নরেন্দ্র * প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী মূলে ধুনি জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি সাধনে নিযুক্ত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

* স্বামী বিবেকানন্দ।

"তুই কি চাস্?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"আমি সমাধিস্থ হয়ে থাক্‌তে চাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধিতো তুচ্ছ কথা!" তিনি নরেন্দ্রকে লোক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন সুতরাং নরেন্দ্রের এরূপ স্বার্থপূর্ণ উত্তর তিনি আশা করেন নাই। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে সমাধির জন্য প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম। তার পর সন্ধ্যার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে নিজের দেহ খুঁজে পেলাম না। দেহটা একেবারে নাই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য্য দেশ কাল আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে ছিল। দেহ বুদ্ধি প্রায় অভাব হয়েছিল—প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু অহংছিল তাই সে সমাধি থেকে ফিরে ছিলাম। ঐরূপ সমাধি কালেই "আমি" আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়, যেমন মহাসমুদ্র—জল জল আর কিছুই নাই, ভাব ভাষা সব ফুরিয়ে যায়! অবাঙ্‌মনসো গোচর, কথাটী ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। তারপর ঐরূপ অবস্থা লাভের জন্য বারংবার চেষ্টা কোরে ও আর আন্‌তে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বল্লেন—"এখন টের পেলি, চাবি আমার হাতে রইলো। দিবারাত্র ঐ অবস্থায় থাক্‌লে মার কাজ হবে না। সেই জন্য এখন আর ঐ অবস্থা আন্‌তে পারবি না। কাজ শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আস্‌বে।" *

দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদিন

* স্বামীশিষ্য সংবাদ পূর্ব্বকাণ্ড।

ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চারি দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী ডাক্‌লেন। আর সাম্‌নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়্‌লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব কর্ত্তে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্মতেজ—Electric shock—এসে আমার শরীরে ঢুক্‌ছে। ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলুম আমার কিছু মনে পড়েনা। যখন বাহ্যচৈতন্য হলো—দেখি ঠাকুর কাঁদ্‌ছেন। জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর সস্নেহে বল্লেন,—"আজ যথা সর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফতুর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ কোরে তবে ফিরে যাবি।" * নরেন্দ্রের ভিতর লোক শিক্ষার জন্য নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পূর্ণ হইল!

অসাধ্য দারুণ পীড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ দিন দিন ক্ষয় হইতেছে। গলদেশে অসহ্য যন্ত্রণা; কথা কহিবার শক্তি নাই; আহার সামান্য একটু দুগ্ধ বা সুজি, তাহাও কখন গলাধঃকরণ হয়, কখন হয় না। মাঝে মাঝে ক্ষত হইতে বাটী বাটী রক্তস্রাব হওয়াতে শরীরের কৃশতা আরও বৃদ্ধি হইয়া দেহ কঙ্কালসার করিয়াছে। কিন্তু এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা তিনি ভক্তদিগকে জানিতে দেন না—প্রশান্ত চিত্তে সহাস্যবদনে সকল কষ্টই সহ্য করিতেছেন। ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হাসিয়া উত্তর করেন,—

* স্বামীশিষ্য সংবাদ উত্তর কাণ্ড

"দেহ জানে তার রোগ জানে, তুমি মন আনন্দে থাক!"

কোন ভক্ত একদিন বলিলেন,—"আপনি মাকে বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে। তিনি উত্তর করিলেন,—

"সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আর বল্লেই কই হয়? এখন দেখ্‌ছি আক্ হয়ে গ্যাছে। শ্রীমতী ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে বল্লেন,—"তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো।" যখন আবার ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে দর্শন কর্ত্তে চাইলেন,—এম্‌নি ব্যাকুলতা, যেমন বেড়াল আঁচড় পাঁচড় করে, তখন কিন্তু আর বেরোয় না!" (ক)

অপর একদিন ভক্তগণ বিশেষ কাতর ভাবে তাঁহাকে বলি-লেন,—"এত যন্ত্রণা আপনি মাকে একবার বলুন যাতে রোগ ভাল হয়।" তিনি বলিয়াছিলেন,—

"মা, আমায় বলেছিলেন, এর পর পায়েস খেয়ে থাকতে হবে। তাই মাকে বলেছিলাম,—মা! এর নাম পায়েস খাওয়া, এত কষ্ট! তা মা, বল্লে—কেন? আত মুখে তো খাচ্ছিস্?— আমি লজ্জায় আর কথাটী কইতে পার-লাম না!"

একদিন পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি, রাত্রে নিদ্রা নাই, সেবকগণ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। তিনি শ্রীম'কে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—

"তোমরা কাঁদ্‌বে তাই এত ভোগ কচ্ছি! সব্বাই যদি বলো যে, এত কষ্ট, তবে দেহ যাক্—তা হলে দেহ যায়!" (ক)

ভক্তের উপর কি অদ্ভুত ভালবাসা তাঁহার এই কয়টী কথায়

প্রকাশ! এ সময় তিনি কত ভাবে প্রত্যেক ভক্তের সকল সন্দেহ দূর করিয়া, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত সেই ভক্তই তাহা বলিবার অধিকারী। ভক্তগণের সহিত তাঁহার লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে আমরা এ স্থানে ক্ষান্ত রহিলাম।

পীড়ার বৃদ্ধি হইতেই শ্রীসারদাদেবী তাঁহার সেবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় অবিরত ছয় মাস ধরিয়া তিনি কোন রূপ বিশ্রাম লইয়াছিলেন কি না সন্দেহ! ভক্তগণও পালা করিয়া দিবারাত্র নিকটে থাকেন। চিকিৎসারও ত্রুটি নাই। কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। শ্রাবণমাস শেষ হইবার কয়েকদিন বাকি থাকিতে কোন ভক্তকে তাঁহার তিরোধানের কাল ইঙ্গিতে বলিয়াদিলেন। ভক্তগণের মন সন্দেহে দোলায়মান। সত্য সত্যই কি সাধারণ মানুষের ন্যায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন, না ইহা তাঁহার ভক্তের সঙ্গে রহস্য? নরেন্দ্র বলিতেছেন,—"যখন শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে। একদিন মনে মনে ভাবছি—এই সময় যদি বলতে পারো—আমি ভগবান, তবে বিশ্বাস কোরবো তুমি সত্য সত্যই ভগবান! তখন শরীর যাবার দুইদিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—"যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ,—তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!!"

১২৯৩ সাল ৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি রবিবার পূর্ণিমা—চিকিৎসকগণ তাঁহার নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় নিজের শ্বাস প্রশ্বাস দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—ইহার নাম

নাভিশ্বাস! ক্ষুধা বোধ করাতে একটু সুজি খাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রায় সমস্তই মুখ বাহিয়া পড়িয়া গেল—ক্ষুধার শান্তি হইল না। ভক্তদিগকে বলিলেন,—দ্যাখ, হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে!" * শয্যায় অতি কষ্টে শয়ন করিবা মাত্র তাঁহাকে সমাধি মগ্নের ন্যায় স্থির দেখিয়া সকলেই ভীত ও মুহ্যমান্। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। ভাত খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ভাতের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখাছিল। শয্যায় বসিয়া ক্ষুধা শান্তির জন্য অন্নের মণ্ড এরূপ সহজে আহার করিলেন যেন কোন কালে তাঁহার গলরোগ ছিল না। অন্ন খাইয়া বলিলেন,—আঃ শান্তি হলো! এখন আর কোন রোগ নাই!" তাঁহাব প্রসন্ন ভাব দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে কিছুক্ষণ নিদ্রার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহজ সুমিষ্ট কণ্ঠে—কালী! কালী! কালী! তিন বার মার নাম উচ্চারণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। একটা বাজিয়া দুই মিনিটের সময় সেবকগণ স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন—তাঁহার দেহ কণ্টকিত, দৃষ্টি নাসাগ্রে, নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মিলিত, মুখে সুমধুর হাসি গভীর সমাধি মগ্ন! সকলে রুদ্ধশ্বাসে নিরবে সমাধি ভঙ্গের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাত্রি শেষ হইল, সমাধি ভঙ্গ হইল না! শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি যোগে আপনার পরমধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন! তিরোভাবের দিন তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর পাঁচ মাস পঁচিশ দিন হইয়াছিল।

---

* তাঁহার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তগণ তাঁহার জন্ম তিথি দিবসে হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত ভোগ দিয়া তাঁহার জন্মোৎসব পালন করেন।

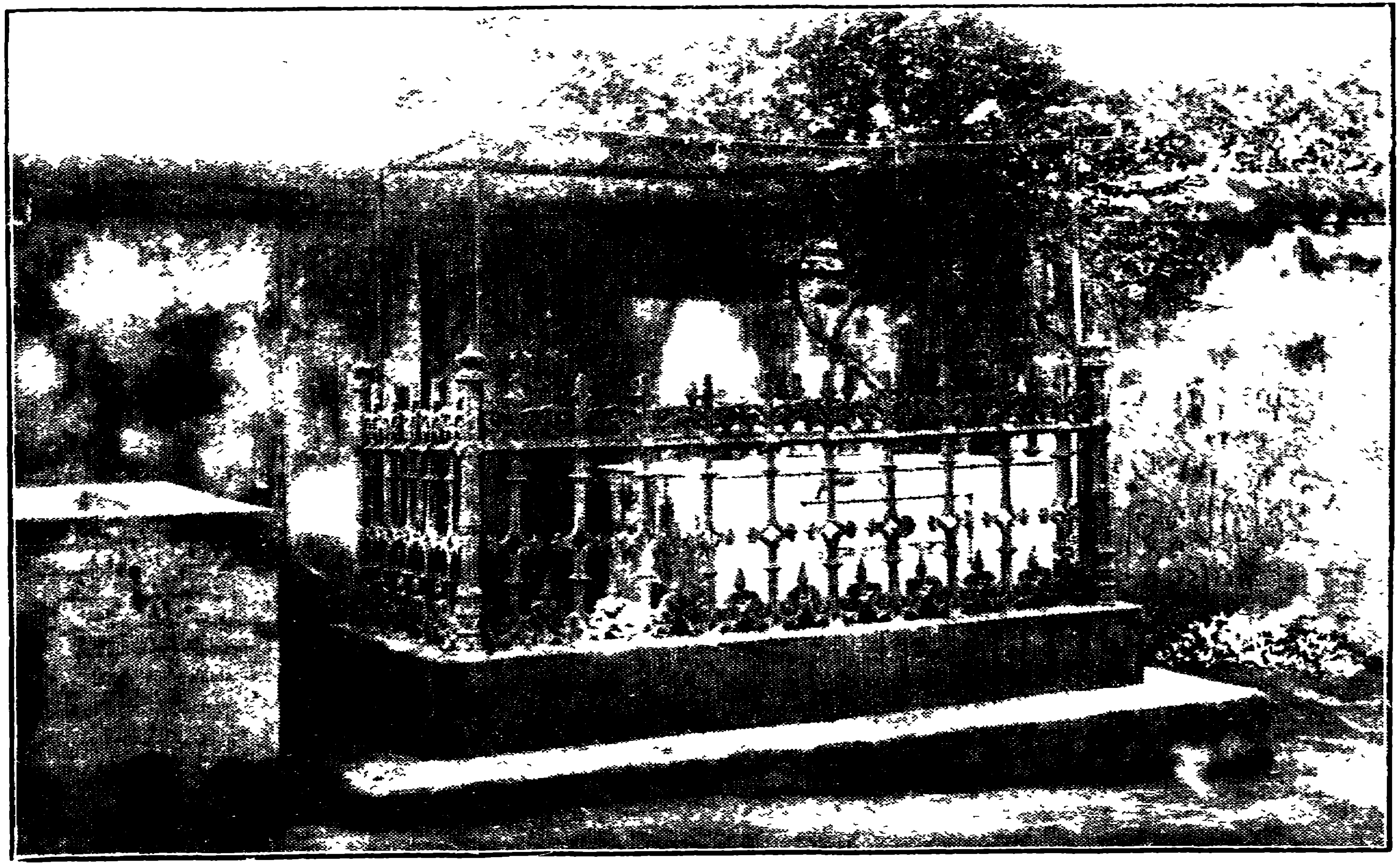

কাশীপুর মহাশ্মশানের বেদী ও বিল্ববৃক্ষ

পরদিন বেলা একটার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে জীবনীশক্তি অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। ১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় একখানি নূতন পালঙ্ক, শয্যা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত করিয়া, নূতন পীত বর্ণে রঞ্জিত বসন পরিধান করাইয়া, দেহ শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত, পুষ্পমালায় ও পুষ্পাভরণে সুশোভিত করিয়া, (জন্মোৎসবের দিন ভক্তগণ তাঁহাকে যেমন করিয়া সাজাইতেন) ভক্তগণ ভক্তিভরে পাদধারণ ও প্রণাম পূর্ব্বক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ কাশীপুর শ্মশানঘাটে লইয়া গেলেন। শৈবের ত্রিশূল, অদ্বৈতের ওঁকার, বৈষ্ণবের খুন্তি, মহম্মদীয় অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টেয় ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত পতাকা সর্ব্বাগ্রে বাহিত হইল। শ্মশানে পালঙ্ক প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইবার পর, ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ, সুমধুর কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সুললিত কণ্ঠের গান বড়ই আদর করিতেন। চিতা শয্যায় স্থাপন করিবার সময় শ্রীগুরুর পদধারণ পূর্ব্বক পুত্রবৎ ভক্তবৃন্দ একে একে শেষ প্রণাম করিয়া সেই অপাপবিদ্ধ দেহে অগ্নি প্রদান করিলেন। ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ সমুৎপন্ন পবিত্র অগ্নি অল্পক্ষণেই সেই পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিল। ভক্তগণ অবশিষ্ট ভস্মাস্থি পূর্ণ তাম্র ঘট মস্তকে ধারণ ও শ্রীগুরুর পুণ্য মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক উদ্যান বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ভাব প্রচার।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্ব দেহ শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। কিন্তু যে পবিত্র স্মৃতি তিনি ভক্তহৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিলীন হইবার নয়। যুবক ভক্তগণ প্রায় বৎসরাধিক কাল পিতা মাতা গৃহ পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া, শ্রীগুরুদেবের সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শশী * ও যোগেনের † শ্রীগুরুসেবা অতুলনীয়। উভয়ের দেহ অনাহারে অনিদ্রায় ও দুর্ভাবনায় শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছিল। উভয়েরই মর্ম্মান্তিক আক্ষেপোক্তি,—"বোধ হয়, সেবায় কোনরূপ ত্রুটি হইল, তাই প্রভু আর সেবা গ্রহণ করিলেন না!" ভক্তগণের সকলেরই প্রাণ সমবেদনায় কাতর। শ্রীগুরুর অদর্শন সকলকেই শোকে ও সন্তাপে দগ্ধ ও অস্থির করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগের একাধারে পিতা মাতা সুহৃদ্ গুরু ও ইষ্ট। ভক্তগণের মনে হইল, তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা অস্তমিত, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জীবনের গতি কি হইবে কিছুই স্থিরতা নাই। তিরোধানের কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট তাঁহাদিগের উপস্থিত এগার জন ভক্ত সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। বাহ্যচিহ্নে সন্ন্যাসী

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

† স্বামী যোগানন্দ।

না হইলেও তাঁহারা অন্তরে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবান্। কিন্তু এ সময় তাঁহাদের জীবনতরী, কাণ্ডারী হীন নৌকার ন্যায় সংসার সাগরে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান বোধ করিতে লাগিলেন।

শ্মশান হইতে ভক্তগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গুরু-মাতা শোকে অধীরা, শ্রীমুখে কেবল একমাত্র কাতরোক্তি—কালী, কালী, কালী বলিয়া অবিরল অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন! শ্রীমাতাদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সন্তানেরা সম্মুখে সরোদনে দাঁড়াইলেন, সন্তানগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গুরু মাতা ও চক্ষের জল সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমাতা-দেবী শ্রীঅঙ্গের আভরণ মোচন পূর্ব্বক বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহার বৈধব্যের আচরণ প্রভুর নিষেধ। আদেশ বুঝিয়া শ্রীমা হস্তাভরণ খুলিতে পারিলেন না, এবং বৈধব্য বেশ ও ধারণ করিলেন না। সেবক ভক্তগণ ও শয্যার উপর শ্রীগুরুদেবের চিত্রপট স্থাপন পূর্ব্বক সেইদিন হইতেই বিধি মত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নিত্য পূজা আরম্ভ করিলেন। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্র প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য পরামর্শ স্থির করেন। এবং সপ্তম দিবসে রবিবার জন্মাষ্টমী তিথিতে রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছির উদ্যানে উৎসব সহকারে অস্থি সমাহিত হয়। সন্ন্যাসী ভক্তগণ, শ্রীগুরু-দেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ স্বতন্ত্র অস্থি যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বেলুড় মঠে এখনও তাহার পূজা হইয়া থাকে।

ভাদ্র মাসের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কাশীপুর বাগান

ভাড়ার সময় উত্তীর্ণ প্রায়, আর এক সপ্তাহ পরে বাগান বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভক্ত সুরেশচন্দ্র নিজ নামে ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় বাগান লইয়াছিলেন। বাগান ভাড়া ছাড়া তাঁহাকে সেবার খরচ ও অধিকাংশ বহন করিতে হইত। শ্রীগুরুদেবের তিরোধানে এখন তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে হইল। ভক্ত বলরাম শ্রীমাতাদেবীকে সযত্নে সবিশেষ ভক্তি পূর্ব্বক কলিকাতার নিজ বাস ভবনে লইয়া গেলেন। চারি পাঁচ জন সেবকভক্ত শ্রীগুরুদেবের অদর্শন যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অপর কয়েক জনের স্ব স্ব গৃহ গমনের সঙ্কল্প স্থির হইল। সুতরাং সুরেশচন্দ্রের বাগান বাটী পরিত্যাগ করিবার আর কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু এক অচিন্তিত বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীকালীমাতার একখানি তৈল চিত্র নিজ গৃহে স্থাপন করিবার জন্য মনোমত করিয়া চিত্রিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি উগ্রভাবে চিত্রিত দেখিয়া বাটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গৃহে রাখিতে নিষেধ করেন। সুরেশচন্দ্র সেই চিত্রপট কাশীপুরের বাগানে শ্রীগুরুদেবের কক্ষে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবন স্বরূপ সেই চিত্রপট এখন কোথায় লইয়া যাইবেন ? গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং তিনি চিত্রপট রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁহার মনে হইল, কেবল বাটী ভাড়া করিলে চলিবে না। তথায় চিত্রপটের রক্ষক স্বরূপ লোকের আবশ্যক।

দুই তিন জন ভক্তের থাকিবার স্থান নাই। তাঁহারা এই কার্য্যের ভার লইলে তিনি নিশ্চিত হইতে পারেন। বিশেষতঃ সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার পূজাকার্য্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবে না। বরাহনগরে গঙ্গার সন্নিকটে জমীদার মুন্সী বাবুদের পুরাতন ভগ্নবাটি ১০৲ টাকা ভাড়া স্থির করিয়া শ্রীসুরেশচন্দ্র শ্রীগুরুদেবের শয্যাদি সমস্ত দ্রব্য ও শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্রপট জনৈক ভক্তের দ্বারা ভাড়া বাটীতে স্থানান্তরিত করিলেন। এই-রূপে নিঃশব্দে, নিভৃতে লোকদৃষ্টির অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আদ্যাশক্তির লীলাভূমি। বাল্যকালে মঙ্গলচণ্ডিকা বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনপথে তাঁহার মানসচক্ষে যে মহাশক্তি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সাধনে সিদ্ধ করেন. এখন চিত্রপটে বিরাজিতা সেই সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনীকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একত্র মিলন। মঠস্থাপন সংবাদ পাইবামাত্র দুই তিন জন ভক্ত অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বরাহনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ঠাকুরের সেবা ও পূজাদি কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। যাঁহারা গৃহে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে বাটী হইতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পরে পৌষ মাসের মধ্য-ভাগে খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে অবকাশ পাইয়া, ভক্ত বাবুরামের * জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে সকল ভক্ত একত্র মিলিত হন এবং তিন

* স্বামী প্রেমানন্দ

চারি দিবস দিবারাত্র শ্রীগুরুদেবের জীবনালোচনা ও নানাবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গে ক্ষেপণ করিয়া সঙ্কল্প স্থির হইল যে, কেহ আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। ১২৯৩ সালের মাঘ মাসের প্রথমে সন্ন্যাসী ভক্তগণ বরাহনগর মঠে একত্র সম্মিলিত হইয়া অচিরাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্বকৃত্য মস্তকমুণ্ডন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। সুরেশচন্দ্র ও সানন্দচিত্তে সন্ন্যাসী ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"তুই এদের দেখ্‌বি।" স্বামিজী মঠের ভাইদের লইয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত। সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য, দেহসুখ ও কামিনাকাঞ্চন কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কখন অনশন, কখন বা অর্দ্ধাশন, কেহবা একটী মাত্র ফলাহার করিয়া দিবারাত্র ধ্যান জপে মগ্ন থাকেন। মঠে সকলেই নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সাধন ভজনে সময় অতিবাহিত করেন। কখন মঠের নির্জ্জন স্থানে, কখন নিকটস্থ শ্মশানভূমে কখন গঙ্গাতীরে সাধন করিতে থাকেন। কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাধন ভজন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের পূজা ও সেবা! যুবক সন্ন্যাসীগণ প্রত্যেকেই এক লক্ষ্য। তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা কি করিয়া ঈশ্বরলাভ হইবে। শ্রীগুরুর কথা ছাড়া অন্য কথা নাই, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই। সময়ে সময়ে কেহ বা উপনিষৎ ও বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্তপর, কেহ বা যোগ-বাশিষ্ঠাদি পাঠে, কেহবা সঙ্গীত শিক্ষায় নিবিষ্ট। মঠে এসময় কিরূপ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইত, স্বামিজীর নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বরাহনগর মঠ,

১৯শে নবেম্বর ১৮৮৮,

পূজ্যপাদ মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার হৃদয়ের পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছি। মহাশয়, আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতি বশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা, মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদয় সন্ন্যাসী মণ্ডলিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনত মস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছে। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদ শাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব পাণিনিকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। লঘু অপেক্ষা আমাদের ব্যাল্যাধীত মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঐ বিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা। আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ বিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট

হয় তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদ শাস্ত্র পুনরুজ্জীবিত করিবেন ভরসা করি। কিমধিকমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

কিন্তু এইরূপে ভগবান লাভের জন্য নানাবিধ সাধনে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়াও কোন রূপ আলোক দেখিতে না পাওয়াতে সংশয়ে ও নিরাশায় কেহ কেহ অবসাদগ্রস্ত হইয়া দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। তীর্থ পর্য্যটনকালে তাঁহারা কিরূপ ত্যাগ ক্লেশসহিষ্ণুতা দেহাভিমান শূন্যতা ও বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় দিতেন, তাহা লিখিত হইলে তাঁহাদের সাধক জীবনের অত্যুজ্জ্বল পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ভক্তগণের ঈদৃশ ভগবৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ সময় মঠে সাধন ভজন সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান কত্তুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ স্নান কোরে কেহ না কোরে, ঠাকুর ঘরে গিয়ে বোসে জপ ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভিতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নাই তার হুঁসই ছিল না। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্‌তো, ও বাড়ীর গিন্নীর

মত ছিল। ভিক্ষা শিক্ষা কোরে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো দাওয়ানোর যোগাড় ঐ সব কর্ত্তো। এমন দিন ও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা চারটা পর্য্যন্ত জপ ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোন রূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপ ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি! ······আমরা সাধু সন্ন্যাসী লোক, ভিক্ষা শিক্ষা কোরে যা আস্তো তাতেই মঠের খরচ পত্র চলে যেতো। সুরেশবাবুই এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগরের মঠের সব খরচ পত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবতো। তার ভক্তি বিশ্বাসের তুলনা হয় না!

"খরচ পত্রের অনাটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি কর্তুম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজি করাতে পার্তুম না। শশী আমাদের মঠের কেন্দ্র স্বরূপ বলে জান্‌বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে কিছু নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো নুন নাই। এক একদিন শুধু নুন ভাত চলেছে, তবু কারো ভ্রুক্ষেপ নাই। জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাস্‌ছি। তেলাকুচপাতা সেদ্ধ, নুন ভাত, এই মাসাবধি চলেছে। আহা! সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখ্‌লে ভূত পালিয়ে যেতো—মানুষের কথা কি! ·········সৎকার্য্য কোরে যাবো কারুদিকে দৃক্‌পাত কোরবো না, —যার ঐরূপ বোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়। তবে কারু কারু বা একটু দেরীতে হয় এই যা তফাৎ। কিন্তু হবেই হবে।

আমাদের ঐরূপ রোক্ ছিল, তাই একটু আধ্‌টু যা হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময় না খেতে পেযে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলুম, মাথার উপর দিয়ে এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেলে তবে হুঁস হয়েছিল! অন্য এক সময় সারাদিন না খেয়ে, কলকাতায় এ কাজ সেকাজ কোরে বেড়িয়ে রাত্রি ১০টা ১১টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন একদিন নয়!"

স্বামিজী তীর্থ ভ্রমণের সময় কিরূপ তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন তাহা একদিন বলিলেন,

"ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নাই। একটু বেচালে পা পড়্‌লো তো একেবারে পাহাড় থেকে খড়ে পড়লো—হাত পা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গ্যালো। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কাণা কড়ি ও সম্বল নাই! বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে, দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছা হলো। লোক্‌টাকে বল্লুম, ওরে! ছিলিমটে দিবি? সে যেন জড়সড় হয়ে বল্লে—"মহারাজ! হাম ভাঙ্গী হ্যায়।" সংস্কার কি না?—শুনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এলো,—তাই ত সন্ন্যাস নিয়েছি, জাত কুল মান সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা ম্যাথর বল্‌তে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো। তখন প্রায় এক পো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই ম্যাথরের কাছে

এলুম—দেখি তখনও লোক্‌টা সেখানে বোসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম—ওরে বাপ্ এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়। তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। বল্লুম, ঐ ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তখন আনন্দে ধূমপান কোরে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিয়ে জাতি বর্ণের পারে চলে গিছি কি না পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে হয়। ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা এত কঠিন। কথায় ও কাজে একচুল্ এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। *

১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ, সন্ন্যাসী ভক্তগণের পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী ভক্ত বলরাম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইষ্টপদ লাভ করেন। এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে মঠের জীবন স্বরূপ সুরেশচন্দ্র তাঁহার শ্রীগুরুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। সুরেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহে ও ব্যয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন সুরেশচন্দ্র গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করেন যে, অবতার পুরুষগণের জন্মতিথি তাঁহাদের ভক্তগণকে পালন করিতে হয়। সুরেশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়া জানিতে পারিয়া ১২৮৭ সালে প্রথম উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই দিন সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হইবামাত্র, ভক্তগণ তাঁহাকে পীতবর্ণে রঞ্জিত নূতন বস্ত্র এবং পুষ্পমালা ও চন্দনে দেহ সুশোভিত করিয়া দিলেন, এবং নানাবিধ মিষ্টান্নাদি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, আপনারা মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার

---

* স্বামী শিষ্য সংবাদ—উত্তর কাণ্ড।

জন্মতিথিতে ভক্তগণ প্রতিবৎসর উৎসব করিতেন এবং তাঁহার পীড়ার সময় ও উহা বন্ধ হয় নাই। মঠ স্থাপনের পর হইতেই জন্মতিথি দিবসে বিশেষ পূজাদির প্রবর্ত্তন হইল। দশাবতার, দশ মহাবিদ্যা এবং সর্ব্বদেব দেবীর পূজা সমাপন ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হইয়া, জন্মতিথির বিধিমত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুরেশচন্দ্র এতদিন প্রায় একাকী উৎসবের সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন এবং মঠ স্থাপনের পর হইতে প্রায় একশত টাকা করিয়া প্রতি মাসে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এ সময় মঠের কিরূপ সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, স্বামিজীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ঈশ্বরো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা।

২৬শে মে ১৮৯০,

পূজ্যপাদেষু—

বহু বিপদ ঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তি যুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম,—"তাহাকে সেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিণু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্য পবিত্রতা এবং কঠোর তম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান ভক্তি প্রেম ও

বিভূতিবান্ হইয়া ও অকৃতার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমাদের আর কি ভরসা ? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্ত বাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক্ লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবক যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভার প্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিকে ওদিকে বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা, কিন্তু সে বেড়ান মাত্র। তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ, তাহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নিদেশ ক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসী মণ্ডলী, বরাহনগরে একটী জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন এবং সুরেশ-চন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটী গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ এবং বাড়ী ভাড়াদি দিতেন।

৫। নানা কারণে ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। একার্য্য যে অতি গর্হিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে,

উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদি এবং প্রতিকৃতি যথানিয়মে আমাদের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। এবং এক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজার ব্যয় ও উক্ত দুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গ ভূমি পবিত্র হইয়াছে; যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সেই জন্য অধিকাংশ ত্যাগী মণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণ চিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

৭। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটা জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয়, এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায় কিছুই স্থিরতা নাই। বঙ্গদেশের লোকের

কথা অনেক—কাজে এগোয় না, আপনি জানেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। এক হাজার টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণ শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার নাম এবং সম্ভ্রম এবং আলাপ ও যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার যদি অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপি ধার্ম্মিক ধনবান্ দিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎ সকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জন্য আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসীগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের আদর্শ-ভাব লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশে 'আহোত্বুর্দ্দৈবম্।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্ন্যাসী আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি,—আমি রামকৃষ্ণের দাস, তাঁহার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাধন ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ও ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতে ও রাজি। আপনাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।'

১২। যদি বলেন, ৺কাশী আদিস্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়। আপনাকে বলিয়াছি যে তাঁহার জন্মভূমে ও তাঁহার সাধনভূমে সমাধি হইবে না—কি পরিতাপ। বঙ্গ ভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্বপ্নে ও ভাবেনা—কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা এদেশের অস্থি মজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগ্য ও অসাংসারিকতা প্রেরণ করুণ। এদেশের লোকের কিছুই নাই। পশ্চিম দেশের লোকের বিশেষ ধনীদিগের এসকল কার্য্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনা হয় উত্তর দিবেন ইতি। পুঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

পত্রের উত্তরে স্বামিজী কোন বিশেষ উৎসাহ জনক সংবাদ পাইলেন না। ভগবৎ কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণ কোন গৃহস্থ ভক্ত এ সময় মঠের খরচ চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই

সাময়িক সাহায্যে ঠাকুরের পূজা ও সেবা এক প্রকার চলিতে লাগিল। ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য অনেক ভক্ত তীর্থ ভ্রমণে গমন করিলেন। স্বামিজী ও কয়েকমাস পরে আল্‌মোড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। আল্‌মোড়ায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে একাকী সাধন ভজনে নিরত হন। এবং পরে রাজপুতানার,—অল্‌বার, জয়পুর, খেত্‌ড়ী আজমীড়, আবুপাহাড় প্রভৃতিস্থানে গুপ্তভাবে বাস করিয়া, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বেদসংহিতা, বিবিধ দর্শন ও সূত্রগ্রন্থ এবং বৌদ্ধশাস্ত্র গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে থাকেন। অল্‌বারও কাঠিয়াবাড়ের পুরবন্দরের রাজপুস্তকালয়ে তিনি অনেক সময় যাপন করেন। এরূপে প্রায় দুই বৎসর একাকী দেশ ভ্রমণ ও শাস্ত্রালোচনায় নিবদ্ধ থাকিয়া, আপনার গতিবিধি ও কার্য্য-কলাপের কোনরূপ সংবাদ কাহাকেও দিতেন না। এমন কি মঠেও তাঁহার কোনরূপ সংবাদ আসিত না। অবশেষে তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলে, তথাকার কতকগুলি উৎসাহী যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে আমেরিকার চিকাগো নগরে সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশনে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্ম্মের অধিনায়ক মহীশূর ও রামনাদের মহারাজা এবং অপর কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি সমুদ্রযাত্রার আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। স্বামিজী প্রথমে অনিমন্ত্রিত ভাবে মহাসভায় উপস্থিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশনে

শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মসমন্বয় প্রচারের অভাবনীয় সুযোগ। যে মহাকার্য্য সাধনের জন্য শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এতদিন প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। স্বামিজী শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল। তিনি শ্রীগুরুমাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন,—"তাঁহাদের চিরদাস হনুমান জয়রাম বলিয়া মহাসাগর পারে যাইতেছে!"

১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসের প্রথমে চিকাগো নগরে উপনীত হইয়া স্বামিজী বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মমণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক তিনি নিয়মিতভাবে আহুত হয়েন নাই বলিয়া, মহাসভার অধিবেশন দিবসে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার প্রবেশ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এখন আর নূতন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার উপায় নাই। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী ভগ্ন মনোরথ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণের আমেরিকা যাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহের নিঃস্বার্থ প্রাণপণ চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ; জীবনের প্রদীপ্ত আশাও নির্ব্বাপিত! আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহাও নিঃশেষ প্রায়। এখন কি এই সুদূর প্রবাসে অসহায় ও অনাশ্রয় অবস্থায় অনাহারে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে হইবে? শ্রীগুরুদেবের আদেশ, যাহা সম্বল করিয়া এই অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইবে? স্বামিজীর অটল বিশ্বাসেও সংশয়ের ছায়া পড়িল!

চিকাগো নগরে থাকিতে হইলে ব্যয় বাহুল্যে শীঘ্রই অর্থাভাব ঘটিবে ভাবিয়া তিনি বোষ্টন নগরে উপস্থিত হন। বোষ্টনে পৌঁছিয়াই তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য কি ভাবে পরিচালিত করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যগণকে মান্দ্রাজে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় আ…

…এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্বপন দেখিতাম তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয় আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে! মরি আর বাঁচি আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

আমি এক্ষণে বোষ্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর অতিথি-রূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেল গাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইতেছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে, আর তাঁর লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কহিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতে-ছেন! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুণ রাস্তায় লোকের বিদ্রূপ, এই গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয়

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বৎস! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ব্যতীত হয় নাই! এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহা-, দিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাস সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস! রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব, তারপর ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।...যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব।

তোমাদের—বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই শুভযোগ উপস্থিত হইল। এক অভাবনীয় ঘটনাসূত্রে বোষ্টনের পার্শ্বস্থ এক গ্রামে, একদিন স্বামিজীর সহিত, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট মহোদয়ের সাক্ষাৎ হয়। আলাপ মাত্রেই অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজীতে অদ্ভুত মনীষা ও প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন অধ্যাপক স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কেন চিকাগো মহাধর্ম্ম সভায় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন করিতেছেন না?" স্বামিজী তাঁহার অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অর্থও নাই আর উক্ত মহাসভা সংশ্লিষ্ট কোন পদস্থ ব্যক্তির নামে পরিচয় পত্রও নাই। অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—শ্রীযুত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থানেই পত্র লিখিলেন এবং পত্র মধ্যে এই কয়টী কথা লিখিয়া দিলেন,—"দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদিগের সকল পণ্ডিত গুলিকে একত্র করিলে যাহা হয়, ইনি তদপেক্ষাও প্রভূত মনীষাসম্পন্ন।" অধ্যাপক রাইট স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনার নিকট হইতে ধর্ম্মের প্রতিনিধি-ত্বের নিদর্শন চাওয়া যেরূপ, সূর্য্যের নিকট তাহার আলোক দানের অধিকার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ!" রাইট মহোদয় ধর্ম্মমণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে স্বামিজীর জন্য হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের সাদর নিমন্ত্রণ আনাইলেন। অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য স্বামিজী পুনরায় চিকাগো সহরে আসিয়া প্রতিনিধিগণের আবাস স্থানে সমাদরে গৃহীত হন। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে অধিবেশন আরম্ভ হইল। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের

প্রতিনিধিগণের এরূপ অপূর্ব্ব একত্র সম্মিলন ইতিহাসে এই প্রথম। রোমান কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ ও প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মনীষীগণ, এবং বৌদ্ধ, টেও, কনফুচ, সিণ্টো, ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, পারসিক, মহম্মদীয়, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মহামান্য প্রতিনিধিবর্গ মঞ্চোপরি স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। সেই বিরাট ব্যাপার বর্ণনা করিয়া স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

চিকাগো, ২রা নবেম্বর ১৮৯৩।

প্রিয়—

বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে রাইট্ মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন। ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইয়া বলিলেন, যে উহাতে সমুদায় আমেরিকাবাসীর সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারও আলাপ ছিল না, ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদায় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয়, আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্প প্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধি-

বেশনের জন্ত একটী বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল (hall) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইখানে সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নগরকার; বীর চাঁদ গাঁন্ধি জৈন সমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসাণ্ট ও ও চক্রবর্ত্তী থিওসফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল, আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শিল্পপ্রাসাদ পর্য্যন্ত খুব ধুম ধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই মঞ্চের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটী হল, তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট, আর মঞ্চের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় মনস্বীগণের সমাবেশ! আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীত বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়ম মত ধুমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক্ দুড় দুড়্ করিতে ছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্ব্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন। চক্রবর্ত্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত

করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃ বৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দুই এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি, "আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল যে কান যেন কালা করিয়া দ্যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল যে, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, —মুকং করোতি বাচালং, হে ভগবন্! তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল! তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক!

সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। আর যে দিন 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে আমাব বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটী সংবাদ পত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—কেবল মহিলা —সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই। বিবেকা-

নন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদায় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়াছিল।” ইত্যাদি আমি যদি সংবাদ পত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি জান আমি নাম যশকে অতিশয় ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি মঞ্চে দাঁড়াই তখনই আমার জন্য কর্ণ বধিরকারী হাততালি পড়িয়া যায়। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদেরও পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে— “এই সুন্দর মুখ, বৈদ্যুতিক শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভার শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন, ইত্যাদি।” ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্য দেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকা সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আশীর্ব্বাদক, বিবেকানন্দ।

ধর্ম্মমহাসভায় স্বামিজী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে মহান্ বার্ত্তা প্রচার করেন এবং যাহা তাঁহাকে সমগ্র আমেরিকাবাসীর পরিচিত করিয়াছিল তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ,

“আপনাদিগের সহৃদয় ও প্রীতিপূর্ণ অভিবাদনের প্রত্যভিনন্দন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে আমার অন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যিনি সকল ধর্ম্মের মাতৃস্বরূপা

সেই সনাতন ধর্ম্মের নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নামে আমি, আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই মঞ্চস্থ সেই সকল মহোদয়-দিগকে ও ধন্যবাদ দিতেছি, যাঁহারা প্রাচ্য দেশাগত প্রতিনিধি বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সুদূরাগত ইঁহারা বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মের উদার ভাব প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মহিমান্বিত হইতে পারেন।" আমি সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করি যে ধর্ম্ম,—ধর্ম্মের উদারতা ও সার্ব্বজনীন সত্যতা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে। আমরা যে কেবল ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক সহানুভূতিতে বিশ্বাস করি তাহা নয়; আমরা সকল ধর্ম্মমতই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরব যুক্ত মনে করি যে আমার ধর্ম্মের পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে exclusion কথাটী অনুবাদিত হইতে পারে না। আমি সেই জাতির অন্তর্গত বলিয়া সম্মানার্হ মনে করি, যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির আশ্রয়হীন ও উৎপীড়িত দিগকে আশ্রয় দিয়াছে। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরবান্বিত মনে করি যে, য়াহুদী জাতির এক বিশুদ্ধ অবশিষ্ট শাখা আমরা বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই শাখা দক্ষিণ ভারতে সেই বৎসর আগমন করে, যে বৎসর তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মমন্দির রোমান অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আমি সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মর্য্যাদা সম্পন্ন, যাহা অবশিষ্ট মহিমান্বিত জরথুষ্ট্র জাতিকে আশ্রয় দিয়াছে ও এখন ও দিতেছে।

আমি আপনাদিগকে একটী স্তোত্রের কয়েক ছত্র বলিতেছি,

যাহা আমি শৈশব হইতে পাঠ করিতেছি, এবং যাহা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠ করিয়া থাকে,—"যেরূপ নানা নদী নানা স্থানে উৎপন্ন হইয়া মহাসাগরে তাহাদের জলরাশি মিশ্রিত করে, সেইরূপ হে ভগবান! মানুষ নানাবিধ সংস্কার লইয়া, সরল বা বক্র নানা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া তোমার দিকেই আসিতেছে।"

বর্ত্তমান মহাধর্ম্ম সঙ্ঘ, যাহার ন্যায় মহতী মহাসভার অধিবেশন অদ্যাপি কোথাও আহূত হয় নাই, জগতে সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রমাণিত ও বিঘোষিত করিতেছে যাহা শ্রীগীতায় প্রচারিত হইয়াছিল—"যে সকল ব্যক্তি, যে ফল লাভ করিবার জন্য আমাকে আশ্রয় করে, তাহাদিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করি; মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি এবং ইহাদের ভয়ঙ্কর বংশধর ধর্ম্ম বিদ্বেষ বহুকাল ধরিয়া এই সৌন্দর্য্যময়ী ধরাতল অধিকার করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা জগৎ অত্যাচারে পূর্ণ, বারংবার নর শোণিতে প্লাবিত, সভ্যতার ধ্বংস সাধিত, ও জাতি সকল নিরাশয় নিমজ্জিত! এই বীভৎস দানবকুল যদি না থাকিত, মনুষ্য সমাজ এতদিন মহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু ইহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, এই মহা সঙ্ঘের গৌরবার্থ অদ্য প্রাতে যে ঘণ্টা নিনাদ ধ্বনিত হইল তাহা ধর্ম্ম বিদ্বেষ, তরবারি ও লেখনীর উৎপীড়ন, এবং একই লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষ ও মানুষের মধ্যে বৈরীভাব সমূলে উচ্ছেদ করিবে।"

স্বামিজী ইহার পর ১৯শে সেপ্টেম্বরে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব গুলি ব্যাখ্যা করিয়া মহাসভায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহাসভা, ভঙ্গ হইলে, দুই বৎসর কাল আমেরিকার বিভিন্ন নগরে তিনি হিন্দুধর্ম্মের উদারতা, বেদান্তের সার্ব্বজনীনতা, সাংখ্যের বৈজ্ঞানিকতা এবং জ্ঞান ভক্তি ও যোগ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে আসিয়া পাশ্চাত্য জড় দর্শনের মীমাংসা খণ্ডন পূর্ব্বক, অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তি-- মায়াবাদ ও অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা হয়। স্বামিজীর য়ুরোপে অদ্বৈতবাদ প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য —অদ্বৈত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা পাশ্চাত্য নাস্তিকতারূপ ম্লেচ্ছ নিবহ ধ্বংস পূর্ব্বক বেদান্তের এই মহাবাণীর ঘোষণা—

"সমুদয় বেদ যে প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্যা যাহাকে বলিয়া দেয়, এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সেই বস্তু তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি—ইহা ওম্। এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরম এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহার তাহাই হয়। যেমন এক বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর ভেদ অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের রূপবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিরূপ হন ও স্বীয় অধিকৃতরূপে বাহিরে ও বর্ত্তমান থাকেন। এই আত্মা না প্রবচন দ্বারা, না মেধাদ্বারা, না বহুশ্রুত দ্বারা লভ্য হন, কিন্তু যাহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তাহার দ্বারাই ইনি লভ্য হইয়া থাকেন ; এই আত্মা তাঁহারই নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশিত করেন।"

শাস্ত্র ও মহাপুরুষ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, বুদ্ধি ও বিচার বলে সেই ভূমা মহানের বিফল অন্বেষণে য়ুরোপ আজ অজ্ঞেয়বাদী, অনাত্মবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক, এবং এই নাস্তিকতার ফল— য়ুরোপ বক্ষে অনীতি ও অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য! য়ুরোপ আজ শান্তিহীন! পরস্পরের ধ্বংস কামনায়, তথাকথিত সভ্যজাতি সকল, যুদ্ধাভিলাষে সশস্ত্রে সজ্জিত। অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার দ্বারা এই ভীষণ জাতি ধ্বংশকর নাস্তিকতা দুর করিয়া, মহাধর্ম্মসমন্বয় বীজ রোপণই স্বামিজীর জীবনের মহাব্রত! স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"ওরা,—(য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ) বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান গরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারিলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" তিন মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সভায়, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। মদীয় আচার্য্যদেব নামক শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শ্রীগুরুদেবের জীবনাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ সকলই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রীগুরুদেবের ভাব প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে স্বামিজীর দেহ রোগগ্রস্ত ও ভগ্ন হইল। ধর্ম্মপ্রচারের ভার স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের

তাব প্রচার সঙ্ক্ষেপে উক্ত হইল। মাতৃভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাঁহার, "হিন্দুধর্ম্ম কি?" প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত আছে। আমরা সেই প্রবন্ধের উত্তরাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচরিতামৃত সমাপ্ত করিলাম।

"এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ, নিজ জীবনে নিহিত করিয়া লোক সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে, লোক হিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"অনাদি-বর্ত্তমান, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষি হৃদয়ে অবিভূর্ত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকার শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্য, বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃ শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

"বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়। পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্য্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্য্যবান্ হইতেছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

"প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্ব্বভূতান্তর্যামী

প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

"বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায়, কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতনসমস্ত গোষ্পদের তুল্য। এবং সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায়, অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় (ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইবে)। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃ পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলা প্রায় হইয়া যাইবে।

"পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোত্থানে, নববলে বলীয়ান্ মানব সন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে, এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ সর্ব্ব যুগাপেক্ষা, সমধিক সম্পূর্ণ সর্ব্বভাব সমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যা সহায়, যুগাবতার রূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে

নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এ নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবযুগ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ শ্রীযুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব! ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণ কর।

"মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুই-বার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব! মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথাশক্তি ক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও!

"যে শক্তির উন্মেষ মাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতি সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া, এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

"আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

সংশোধন।

পাঠকগণ, নিম্নলিখিত অশুদ্ধগুলি সংশোধন করিয়া পুস্তক পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৭	যোগ	যোগ
৫	৬	তাঁহার	তাঁহার
১৪	৭	দোষ	দোষ
১৮	৮	বায়ূ	বায়ু
২২	১২	পূর্ত্তকার্য্য	পূর্ত্তকার্য্য
২৫	২১	মনসাদেবীয়	মনসাদেবীর
৩১	১০,১১,১৩	কোষ্টী	কোষ্ঠী
৪৭	৮	ত্তেজনার	উত্তেজনার
৬১	১০	ভাগিনের	ভাগিনেয়
৭০	৭	অলোচিত	আলোচিত
৭০	২৩	লয়া	ভুলিয়া
৭৯	৭	ব য়া	বলিয়া
৭৯	১০	তন্দ্রোক্ত	তন্ত্রোক্ত
১১৯	১৪	জিনিষ	জিনিষ
১২৭	১	ঐশ্বর্য্য	ঐশ্বর্য্য
১২৭	১৪	অহেতুক	অহেতুক
১৩০	১৯	তর্খন	তখন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৫	১৪	হুতেন	হতেন
১৩৬	১	দাস্যভাস	দাস্যভাব
১৪৮	২১	১৮৬৬	১২৬৬
১৫৯	১৭	মানষ	মানস
১৬৯	১২	আসৎ	অসৎ
১৭৬	৩	অমিই	আমিই
১৮৯	৩	যেতা	জেতা
১৯৩	২১	চাউনিনে	চাউনিতে
২৪৮	২	উদ	উদয়ে
২৬৪	২২	রজুতে	রজ্জুতে
২৭৭	৮	নিনে	দিনে
২৭৭,২৯৩	২০,২৬	ন্যংটা	ন্যাংটা
৩৬২	৭	কমন	কেমন
৪৫৬	১	য়োগ	রোগ
৪৭০	২০	তাহাকে	তাঁহাকে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

১১শ সংস্করণ। পকেট এডিসন। স্বামী-ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ডবল ক্রাউন ৩২ পেজি, ১৪৭ পৃষ্ঠা। পাইকা টাইপে ছাপা। কাপড়ে বাঁধান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১ খানি অতি সুন্দর হাফ্-টোন ছবিযুক্ত মূল্য ।৵০ আনা।

এই সংস্করণে প্রায় একশত নূতন উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে এবং দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ৩য় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶০ আনা, ঐ—উত্তরার্দ্ধ ৩য় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৩২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶০।

ঐ—সাধকভাব—৩য় সংস্করণ। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ৪০২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ টাকা, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶০।

ঐ—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন। ৩য় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৵০ আনা, উদ্বোধনগ্রাহক পক্ষে ১৲ টাকা।

ঐ—ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—২য় সংস্করণ। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥৵০ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ১॥০ আনা।

ঠাকুরের দিব্যভাব এবং নরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম ভক্তগণের

সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক শ্যামপুকুরে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী হইতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঠাকুর এই কালে নিরন্তর দিব্যভাবারূঢ় থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আবার এখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দ) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধুর সম্বন্ধে চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল যে উহার কথা আলোচনা করিতে যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের জীবন-কথা উপস্থিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থখানির 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' নামে অভিহিত হওয়াই আমাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, যোগানন্দ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের (ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য) পৃথক পৃথক চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিস্তৃত মার্জ্জিন্যাল নোট ও বিস্তৃত সূচি সম্বলিত।

পূর্ব্বার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের, শ্রীশ্রীমাকালীর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং ভক্ত ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিকের, উত্তরার্দ্ধে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির সম্বলিত সুন্দর ছবি, এবং মথুরবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, বলরামবাবু ও গোপালের মা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ছবি, এবং 'সাধকভাবে' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একখানি অভিনব তিন রঙ্গের ছবি ও অপর দুইখানি ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। শুধু ঘটনাসংগ্রহ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যে ম[illegible]